

বিজ্ঞান চেতনা





বিজ্ঞান চেতনা ১

সম্পাদক

কুঞ্জবিহারী পাল

আকাশের কথা

শঙ্কর চক্রবর্তী

●

পৃথিবীর কথা

শঙ্কর চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭২
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

ছেপেছেন
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

'পৃথিবীর কথা'র ছবি এঁকেছেন
সুভাষ দে

৪'০০

সৃষ্টির সেই আদিম যুগের অবস্থাটা ভাবলে আজও অবাক হতে হয়। তখন মানুষ ছিল, যাকে বলে একেবারেই অসহায়, সহায়সম্বলহীন। তার দেহে না ছিল কোন আচ্ছাদন, ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হাতের কাছে না ছিল কোন খাদ্য, আর নিজেকে রক্ষার জন্যে না ছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, মানুষ যতই অসহায় হোক না কেন, প্রকৃতির ভয়াল ভীষণ ভ্রূকুটিতে সে ভয় পায় নি। প্রকৃতির সেই বুক-কাঁপানো অবস্থার মধ্যেও মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেছে আপ্রাণ। প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে হার স্বীকার করেনি সে।

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের এই যে জয়, এ সম্ভব হয়েছিল মানুষের ধারালো বুদ্ধি, অন্তরের জ্ঞান আর আশ্চর্য সৃজন-প্রতিভার জন্যেই।

সুতরাং প্রকৃতি-মানুষের সংগ্রামে মানুষের হাতেই আজ জয়-পতাকা। এই জয়-পতাকা বড় সহজে আসেনি। পদে পদে বাধা, ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ তার বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো দেবে।

এমনিভাবেই মানুষ নিজে জেনেছে প্রকৃতির রহস্যের কথা, সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দিয়েছে সকল মানুষের মধ্যে। বিজ্ঞানের নবজন্ম তো এইভাবেই সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে প্রয়োজনের তাগিদ থাকলেও, মানুষ শুধু যে প্রয়োজনের দাস —এ কথা ভাবলে ভুল হবে। প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে সে এগিয়েছে অপ্রয়োজনের সীমাহীন উদার ক্ষেত্রে। জানার আনন্দে, জানার কৌতূহলে তার অভিযানের বিরাম নেই। তাই বিজ্ঞানের যাত্রা অশ্রান্ত, বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্দ্র। নতুন নতুন আবিষ্কারে, নব-নব উদ্ভাবনে বিজ্ঞান-সাধকের দল আজও অনলস। আজও শ্রান্তিক্লান্তিহীন।

এবং সেই কারণেই জলে-স্থলে-নভোদেশে বিজ্ঞান আজ এঁকে দিয়েছে তার পদ-চিহ্ন। দূরকে সে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে দৃশ্যমান। মানুষ আজ আর তাই অসহায় নয়, ভীত নয়। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার দীপ্তিমান উদাহরণ। এক কথায়, মানুষ এগিয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, সৃষ্টি থেকে নতুন সৃষ্টিতে।

এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান তাই এ যুগে অপরিহার্য। স্কুলে বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য বিষয় হিসেবে আজ স্বীকৃত।

আজ ব্যক্তি এবং সমাজ-জীবনের পদে পদে বিজ্ঞানের এত বেশি প্রয়োগ রয়েছে যে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকার দরুন নিজেকে বড়ই অসহায় মনে হয়। যাঁরা বয়স্ক অথচ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না তাদেরও যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানা চলবে না এমন কোন কথা নেই। বরং আমরা মনে করি, বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলক জ্ঞান একান্তই আবশ্যিক ও সর্বজনীন হওয়া দরকার।

এ সব উদ্দেশ্য নিয়েই 'বিজ্ঞান চেতনা'র প্রকাশ। 'বিজ্ঞান চেতনা'র ভাষা যতটা সম্ভব সহজ এবং সরল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ একেই তো বিজ্ঞানের তথ্যগুলো কঠিন বলে সাধারণের ধারণা, তার উপরে যদি ভাষা হয় কঠিন এবং আলঙ্কারিক তবে এ বিষয়ে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণের সম্ভাবনাই বেশি। অনেক জায়গায় বোঝবার সুবিধের জন্যে ছবির প্রয়োজন হয়েছে ; সে ব্যাপারেও কোন কার্পণ্য করা হয় নি।

পরিভাষা সম্বন্ধে এইটুকু আমাদের বক্তব্য যে, পুস্তকগুলিতে যেমন কষ্টকল্পিত বাংলা পরিভাষার উপর জোর দেওয়া হয়নি, তেমনি যে-সব বৈজ্ঞানিক শব্দের সহজ সুন্দর এবং সর্বজনস্বীকৃত বাংলা পরিভাষা চালু আছে তাও কোনক্রমে এড়িয়ে যাওয়া হয় নি।

এ পুস্তকগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে বহু সুযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। বিভিন্ন খণ্ডগুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া লেখক হিসেবেও এঁদের পাঠক মহলে বিশেষ সুনাম আছে। এঁদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে এ পুস্তকগুলির প্রকাশই সম্ভব হত না। এঁদের সকলকেই বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে 'বিজ্ঞান চেতনা'র বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে লাভবান হয়েছি। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। বিশেষ করে উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক পলাশ মিত্রের নাম উল্লেখ করছি।

পরিশেষে এই বলে শেষ করি যে, 'বিজ্ঞান চেতনা' গল্পের বইয়ের মতই পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সিরিজ পাঠে যদি পাঠকের বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ জাগে তবেই এ আয়োজন সার্থক।

'বিজ্ঞান চেতনা'র বর্তমান খণ্ডটির প্রথম অংশে 'আকাশের কথা' এবং দ্বিতীয় অংশে 'পৃথিবীর কথা' স্থান পেয়েছে। এ দুটি অংশ লিখেছেন শঙ্কর চক্রবর্তী, বি.এস-সি, এ. আই. আই. এস-সি।

মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর বুকে। আকাশের পানে তাকালে সে দেখে অগণিত তারা, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র এবং আরও অনেক নভোচারী বস্তু। বিস্মিত হয় সে। এই যে আমাদের পৃথিবী, এর জন্ম হয়েছে কবে, কিভাবে, কোথা থেকে? এই যে বিরাট মহাকাশ, এর শেষ কোথায়? সকালবেলা ঘুম ভাঙলেই পুবের আকাশে চোখে পড়ে সূর্য। এই যে সূর্য, এ নানাভাবে জীবজগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রাচীন কালের ভারতীয় ঋষি সূর্যের এ-হেন ক্ষমতার কথা জানতেন। তাই সূর্যকে স্তুতি জানিয়েছেন তাঁরা মন্ত্রের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সূর্য জিনিসটা আসলে কী? কেনই বা সে দিনের পর দিন উদিত হয় পুব আকাশে, অস্ত যায় পশ্চিম দিগন্তে? ক্রমে সন্ধ্যা নামে, আকাশের বুকে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার মানিক। ওরা কারা? জ্যোৎস্না-রাতে দেখি চাঁদ। কোত্থেকে হাজির হয় চাঁদ? এত আলো সে পায়ই বা কোথায়?

পৃথিবীর বুকেও কি কম বৈচিত্র্য! কোথাও দেখি বিরাট পাহাড় খাড়া হয়ে আছে আকাশে মাথা তুলে। আবার কোথাও দেখি দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। কী করে সৃষ্টি হল এত বড় পাহাড়, এত বড় সমুদ্র? কেন হয় ভূমিকম্প? কেন কখনো-কখনো পাহাড়ের বুক চিরে বের হয় আগুনের স্রোত?

এমনি ধরনের হাজার হাজার প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। 'আকাশের কথা' এবং 'পৃথিবীর কথা'য় তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করবার শুরুতেই তাই আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করেছি।

'বিজ্ঞান চেতনা'র দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা 'গাছপালার কথা' ও 'জীবজন্তুর কথা' নিয়ে আলোচনা করব।

মহালয়া ১৩৭২
কলকাতা

কুঞ্জবিহারী পাল

এই সিরিজে

প্রথম খণ্ড : আকাশের কথা
পৃথিবীর কথা

দ্বিতীয় খণ্ড : গাছপালার কথা
জীবজন্তুর কথা

তৃতীয় খণ্ড : পদার্থ-বিজ্ঞানের কথা
রসায়নের কথা

চতুর্থ খণ্ড : শিল্প ও বিজ্ঞান

পঞ্চম খণ্ড : মানবদেহের কথা
রোগজয়ের কথা

ষষ্ঠ খণ্ড : মানুষের কথা
মানব-সভ্যতার কথা

সূচীপত্র

আকাশের কথা

পৃথিবীর কথা

আকাশের কথা

শঙ্কর চক্রবর্তী

সংশোধন করে নাও

আকাশের কথা

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২৩	১	প্রতিফলক	প্রতিসরক
৩০	২৪	ভার	ভর
৩৮	৭	বাষ্পে	গ্যাসে
৪০	১০	চাপের	তাপের
৬০	১৩	আলোর	আলোটার
১০২	১২	১৮০০	১৮,০০০
১০৯	১০	৪০	-৪০

রাতের কালো আকাশের বুকে নক্ষত্রের দীপাবলী জ্বলে ওঠে। মানুষের দৃষ্টির সামনে এক নতুন জগতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তার মন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। সে জানতে চায়, এই বিরাট মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হল? কোথা থেকে এল এই অগণিত নক্ষত্র? যে সৌর জগতে আমরা বাস করি, তার সৃষ্টিই বা হল কিভাবে? পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব মহাবিশ্বের আর কোথাও কি নেই? এই মহাবিশ্ব কি অসীম, অনন্ত? এর পরিণতিই বা কী?

এই ধরনের বহু প্রশ্ন ধীরে ধীরে মানুষের মনে জমে উঠেছে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে, এই আকাশের রহস্য কবে প্রথম মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল। ইতিহাসে তার সন, তারিখ কিছুই লেখা নেই। আজ থেকে চার পাঁচ হাজার বছর আগে একটা সময়ে আমরা ফিরে যাব। আরব বেদুইনদের দেশ। পশু-পাল নিয়ে তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি ছিল জল। উত্তরদিকে এগিয়ে গেলে জলের সন্ধান পাওয়া যাবে, এটা জানা আছে তাদের। কিন্তু কোনদিকটা উত্তর, সেটা বোঝবার উপায় কি?

সেই প্রাচীন মানুষগুলো একটি ঘটনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে-ছিল। আকাশের সব তারাই রাত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুবদিক থেকে ক্রমে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। কিন্তু একটিমাত্র তারা তার স্থান এতটুকুও পরিবর্তন করে না। তার নাম পোলারিস বা ধ্রুবতারা; আকাশের উত্তরদিকে অভ্রান্ত দিকদর্শনের মত সে দাঁড়িয়ে আছে যুগযুগান্তর ধরে। ধ্রুবতারার হাতছানি নিশানা করে ঐ যাযাবর মানুষগুলো উত্তরদিকে পাড়ি জমিয়ে জলের উৎসের কাছে এসে পৌঁছত। কিন্তু প্রায়ই একটি মর্মান্তিক দৃশ্য তাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। জলের ধারা কোথায় হারিয়ে বসে আছে

তার ঠিক-ঠিকানা নেই, চারিদিকে খট্‌খট্‌ করছে শুধু বালুময় মরুভূমি। ফলে তাদের পশুপাল জলের অভাবে মারা পড়ত।

ক্রমে সমস্যাটা আরো বড় ও জটিল হয়ে দাঁড়াল। রুক্ষ মাটির উপর জলের ধারা ঠিক যে সময়ে জেগে উঠবে, তখনই সেখানে এসে পৌঁছতে হবে—তার আগেও নয়, পরেও নয়। আকাশের আর-একটি বস্তুর ওপর ঐ যাযাবর মানুষগুলোর দৃষ্টি পড়ল,—সেটি চাঁদ। চাঁদের কলা পুরো গোল হয়ে সম্পূর্ণ ক্ষয় পেতে সময় নেয় ২৯$\frac{১}{২}$ দিন। তারপর আবার চাঁদের কলার নতুন করে জীবন শুরু হয়। চাঁদের এই ঘটনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি প্রাচীন মানবগোষ্ঠী এক চান্দ্র ক্যালেণ্ডার বা দিনপঞ্জী তৈরি করে নিয়েছিল। আমাদের পূর্বপরিচিত যাযাবর মানুষেরাও ঐ জাতীয় একটি দিনপঞ্জী অনুসরণ করবার চেষ্টা করত। তবুও কিন্তু হিসেবে গরমিল খানিকটা রয়েই যেত। চাঁদ ১২ বার পুরো গোল হতে সময় নিচ্ছে ৩৫৪ (২৯$\frac{১}{২}$ × ১২) দিন। এর নাম দেওয়া হল চান্দ্র বছর। অথচ আমাদের পৃথিবীর হিসেবে পুরো এক বছর হয় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে। তাহলে একটি চান্দ্র বছরে আমাদের বছরের চেয়ে ১১ দিন ঘাটতি পড়ছে। এই ঘাটতি তিন বছরে বেড়ে এক মাস হয়ে দাঁড়াবে। যাযাবর মানুষেরা প্রথম বা দ্বিতীয় বছরের শেষে জলের উৎসের কাছে মোটামুটি ঠিক সময়েই হয়ত এসে পৌঁছত, কিন্তু তৃতীয় বছরের শেষে তারা নির্ধারিত সময়ের এক মাস আগে এসে পৌঁছত। জলের ধারা তখনো হয়ত অনেক দূরে রয়েছে। এই গোলমেলে অবস্থার হাত এড়ানোর জন্যে সেই প্রাচীন মানুষেরা প্রথম বছরে বারোটা চাঁদের হিসেব ধরত, দ্বিতীয় বছরে প্রথম বছরের ঘাটতিটুকু পূরণের জন্যে হিসেবে নিত তেরটি চাঁদকে। বহু বছর ধরে কাজ চালানোর জন্যে এই উপায়টিকেই তারা বেছে নিয়েছিল। চাঁদের কলা এই সময় থেকেই আরব দেশের মানুষদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আধুনিক যুগেও আরব

দেশের রাষ্ট্রীয় পতাকায় এক ফালি চাঁদের চিহ্ন আমরা দেখতে পাই।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বহুদিন পর্যন্ত চাঁদের হিসেবে যে দিনপঞ্জী, সেই চান্দ্র ক্যালেণ্ডারই চালু ছিল। এতে ভারি মজার মজার ব্যাপার ঘটত মাঝে মাঝে। কয়েক বছর পর হঠাৎ দেখা গেল যে, গরমের সময় বর্ষা এসে হাজির হয়েছে। কখনো বা শরতের সময় প্রচণ্ডভাবে বরফ পড়ছে। তাই বছরের হিসেবটা ঠিক রাখার জন্যে মাঝে মাঝে চান্দ্র বছরের সঙ্গে একটা মাস জুড়ে দেওয়া হত। আর এ কাজটা হত রাজা বা সামন্তপ্রভুদের ইচ্ছেমত। এর ফলে, কর আদায়ের পরিমাণটা যেত বেড়ে, সেনাদলে সৈন্যদের একটু বেশি দিনই আটকে রাখা সম্ভব হত। এসব ব্যাপারের জন্যে মাঝে মাঝে মারমুখী জনতা মিছিল করে দাবি জানাত—ফিরিয়ে দাও বছরের এগারোটা দিন। তবে, আজকের দিনে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই যে ক্যালেণ্ডার চালু আছে সে হল সৌর ক্যালেণ্ডার বা সূর্যের হিসেবে যে বছর গণনা করা হয় তাই। এ হিসেবে প্রতি বছরে দিন হয় ৩৬৫$\frac{1}{8}$ টি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এমন একটি যুগের কথা আমরা বলছি, যখন কোন দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নি এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা বা যুক্তিবিচারের কথাও কেউ ভাবত না। সাধারণ বুদ্ধিকেই অবলম্বন করে মানুষ সব ঘটনাকে বুঝতে চেষ্টা করত। আপন মেরুদণ্ডের ওপর পৃথিবীর ঘূর্ণন বা তার আহ্নিক গতির ব্যাপার তাদের জানা ছিল না। তাই মনে হত আকাশ, বা খ-গোলকের সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে। এইসব নক্ষত্রমণ্ডলের উপর মানুষ আপন কল্পনা অনুযায়ী নানারূপ মূর্তি আরোপ করেছিল, যেমন—মেষ, বৃষ, তুলা, বৃশ্চিক, কর্কট, মিথুন ইত্যাদি। রাশিচক্রের উদ্ভব এভাবেই হয়।

প্রতিদিনই রাতের আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে কতকগুলো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, যাদের আকাশ-পরিক্রমার গতি নক্ষত্রের তুলনায় বেশি। প্রাচীন গ্রীস দেশের অধিবাসীরা এদের নাম দিয়েছিল প্ল্যানেট বা ভ্রাম্যমান নক্ষত্র। সংখ্যায় এরা ছিল পাঁচটি—বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। খালি চোখেই এদের দেখা সম্ভব হত। এই পাঁচটি ও আরো দুটি জ্যোতিষ্ক —চন্দ্র ও সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রের মতই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে—এ ধরনের কথা আজ কারো কাছ থেকে শোনা গেলে আমরা বলব—লোকটা নেহাতই কিছু জানে না। তখনকার দিনের সেরা পণ্ডিতেরা কিন্তু এভাবেই ভাবতেন। পৃথিবীর চেহারাটা যে বলের মত গোল একথাও কেউ বিশ্বাস করত না। সেকালে 'থালার মত গোল পৃথিবী'—এই-ই ছিল সকলের ধারণা।

পৃথিবীর প্রথম জ্যোতির্বিদ

আকাশ সম্বন্ধে মানুষের মন ছিল অন্ধ কুসংস্কার ও নানারূপ অদ্ভুত ধারণায় ভরা। ইয়োরোপে সর্বপ্রথম যে দেশটিতে নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনার উদয় হয়েছিল তার নাম গ্রীস। জ্যোতির্বিদ্যাও এই গ্রীসে যেন নতুন প্রাণ পেল।

খ্রীস্ট জন্মাবার ৫৮৫ বছর আগে ২৮শে মে তারিখ। এশিয়া মাইনরের (বর্তমানে তুর্কির অংশ) মিলেশাস শহরের উপর ঐদিন একটি পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল। সে সময় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল মেদে ও লিদিয়া রাজ্যের লোকেদের মধ্যে। সূর্যগ্রহণ ঘটতে দেখে ভয়ে তারা অস্ত্রসংবরণ করল। তাদের ধারণা হল, দেবতা সূর্যকে কেউ বধ করতে চলেছে।

সূর্যগ্রহণ প্রতি বছরেই ঘটে—চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। চাঁদ সূর্যের চেয়ে আকারে অনেক ছোট বলে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর অল্প কয়েকটি জায়গা থেকেই দেখা যায়। কিন্তু

যে সূর্যগ্রহণের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, তার বিশেষত্ব ছিল এই যে, ঘটনাটি ঘটবার আগে একটি মানুষ তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন। মানুষটির নাম থেলিস, গ্রীসের প্রথম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। আজকের দিনে যে কোন জ্যোতির্বিদ সূর্যগ্রহণ কবে ঘটবে এবং পৃথিবীর কোন্ কোন্ জায়গা থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে, তা আগে থেকেই বলে দিতে পারেন। আড়াই হাজার বছর আগে কাজটা যে খুবই শক্ত ছিল, একথা আশা করি তোমাদের বলে দিতে হবে না। তাছাড়া এক বছরে যে ঠিক ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন হয়, এই তথ্যটুকুও থেলিস অঙ্কের হিসেবের সাহায্যে সর্বপ্রথম বার করতে পেরেছিলেন।

পিথাগোরাস

থেলিস মারা যাবার তিন বছর পরে আর একজন মস্ত বড় গ্রীক পণ্ডিত জন্মেছিলেন। তাঁর নাম পিথাগোরাস। স্কুলে জ্যামিতি পড়তে গিয়ে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই পরিচয় ঘটে। পিথাগোরাস তাঁর শিষ্য ও অনুগামীদের নিয়ে একটি গোপন চক্র গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তাঁরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তার কথা বাইরের লোকের জানবার উপায় ছিল না। আকাশের রহস্য নিয়েও মাথা ঘামিয়েছিলেন পিথাগোরাস। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি নির্ভুল সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছিলেন—যেমন (১) পৃথিবী, সূর্য ও অন্য গ্রহগুলো বলের মত গোলাকৃতি, (২) চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে ও (৩) চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোতেই সে আলোকিত হয়। পিথাগোরাসের মতে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলো আকাশপথে ঘোরার সময় এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করছে। সে সঙ্গীত শুধু পিথাগোরাস ও তার গোপন চক্রের সঙ্গীরাই নাকি শুনতে পেতেন। সে সঙ্গীতের আওয়াজও ছিল ভারি মিঠে। এ সব উদ্ভট কথা

আজকের দিনে কেউ বলে বসলে সবাই তাকে উপহাস করবে তাতে সন্দেহ আছে কি!

অ্যারিস্টটল

পিথাগোরাসের দু'শো বছর পরে আর একজন গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল চন্দ্র, শুক্র, মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহাদির গতির ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ধারণা ছিল, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু তারা কিভাবে চলে, এই সমস্যার সমাধান করবার জন্যে অ্যারিস্টটল বললেন, পৃথিবীর ওপর অনেকগুলো স্বচ্ছ মণ্ডল রয়েছে। ঐ মণ্ডলগুলোর মধ্যে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহগুলো যেন সেঁটে বসানো; ওরা আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। সবচেয়ে বাইরের মণ্ডলটির গায়ে তারাগুলো বসানো রয়েছে। সবশুদ্ধ মণ্ডল আছে আটটি। এই মণ্ডলগুলিকে ঘোরানোর জন্যে অ্যারিস্টটল একটি নবম মণ্ডলের অস্তিত্ব কল্পনা করলেন। তিনি তার নাম দিলেন 'প্রাথমিক চালিকা শক্তি'।

সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে, একথা বলার জন্যে তখনকার দিনের মন্দিরের পুরোহিতেরা অ্যারিস্টটলের ওপর খুবই চটেছিল এবং তাদের তাড়নায় তিনি বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। বিভিন্ন বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত অগাধ পাণ্ডিত্য তখনকার দিনে আর কারুর ছিল না এবং কালক্রমে তাঁর ধারণা সবাই মেনে নিল। তখনকার পণ্ডিতেরা বলতেন অ্যারিস্টটল জ্ঞানবিজ্ঞানের সব বিষয় নিয়েই চিন্তা করেছেন। কোন বিষয় নিয়ে কারো মনে সন্দেহ জাগলে অ্যারিস্টটল পড়লেই চলবে। আর অ্যারিস্টটলে যা নেই, তা মাথা ঘামাবার মত উপযুক্ত বিষয়ই নয়।

নতুন যুগ

ইয়োরোপের সংস্কৃতির পীঠস্থান গ্রীসের রাজধানী এথেন্স শহরে এমন একদল পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল, যারা ছিল

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের বিরোধী। অঙ্কের সাহায্যে কোন বস্তুর পরিমাপ করার কাজ তাদের মতে দোকানদার বা ছুতোরদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকা উচিত। ফলে নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ বাধা পাচ্ছিল।

এদিকে এশিয়া ভূখণ্ডে তখন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন হয়েছে। ঐ নগরীর স্থপতি এথেন্সের নতুন চিন্তার ধারক ও বাহকদের কাছে ঐ শহরের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। নতুন একদল মানুষের সঙ্গমতীর্থে পরিণত হল আলেকজান্দ্রিয়া। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় ইরাটস্‌থেনিস ও অ্যারিস্টার্কাসের।

ইরাটস্‌থেনিস সহজ একটি পরীক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর পরিধির যে মাপ পেলেন, তা হল ২৪,০০০ মাইল ; আধুনিক হিসেবে এই মাপ হল ২৪,৮৬০ মাইল।

অ্যারিস্টার্কাসকে প্রাচীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলা যেতে পারে। সূর্যই যে সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলো তার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে, এ কথা তাঁর কাছ থেকেই আমরা সর্বপ্রথম শুনেছিলাম। এ জাতীয় একটি সম্পূর্ণ মৌলিক ও বলিষ্ঠ ধারণার সঙ্গে তখনকার বেশিরভাগ মানুষই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি।

টলেমি

এরপর টলেমি তার বিশ্ব-মত উপস্থিত করলেন। অ্যারিস্টটল, হেরাক্লেডিস ও হিপ্পার্কাস প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতদের ধারণাকে গ্রহণ করে টলেমি বললেন, পৃথিবীই হল বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। তিনি অ্যারিস্টটলের বিভিন্ন মণ্ডলকে বাতিল করে দিয়ে বললেন, গ্রহগুলো, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি মহাশূন্যে বৃত্তাকারে পৃথিবীর

চারদিকে ঘুরছে। টলেমি গ্রহদের পরিক্রমা-সংক্রান্ত কিছু কিছু জটিল সমস্যার একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

গির্জা ও বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে টলেমির বিশ্ব-ধারণার অনেকখানি মিল ছিল, তাই তাঁর মত পরবর্তিকালে বহুলভাবে প্রচারিত হবার সুযোগ পায়। এই মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অধিকার কারো থাকল না। টলেমির নাম আজও আমরা স্মরণ করি, তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন বলে নয়, বরং সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ তিনি তৈরি করে দিয়েছিলেন বলে। টলেমির মৃত্যুর দুশো বছর পরে এক বিশপের নেতৃত্বে একদল খ্রীস্টান আলেকজান্দ্রিয়ার সুবিশাল লাইব্রেরিটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু অমূল্য পুঁথিপত্র থেকে পৃথিবী এভাবে বঞ্চিত হল।

কোপার্নিকাস

সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা সমগ্র ইয়োরোপের মানুষ মেনে নিয়েছিল। পোল্যাণ্ডের একজন পাদরি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ্বজগতের গঠন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন একটি মতবাদ প্রকাশ করলেন। তাঁর নাম নিকোলাস কোপার্নিকাস। ইয়োরোপের চিন্তাজগতে যখন অন্ধকারের রাজত্ব চলছিল, সে সময় সেখানে তিনি দেখা দিলেন নতুন আলোর পথিকৃৎরূপে। টলেমির ভূকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণার পরিবর্তে সৌর-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি সচেষ্ট হলেন।

কোপার্নিকাস ভাবলেন, পৃথিবীর জমিতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে কোন মানুষের মনে হতে পারে সূর্য ও গ্রহগুলো পৃথিবীরই চারদিকে ঘুরে চলেছে। তেমনি সূর্যের বুকে দাঁড়িয়েও (অবশ্য যদি তা সম্ভব হয়) কি সেই মানুষটির মনে হবে না যে, আকাশের গ্রহগুলোও সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে? এরকম একটি

সাধারণ চিন্তার মধ্যেই ভবিষ্যতের বিরাট বৈজ্ঞানিক ধারণার বীজ জন্ম নিয়েছিল। কোপার্নিকাসের পাদরি জীবন শুরু হয়েছিল জার্মানির ফ্রাউয়েনবুর্গ নামে একটি শহরে। ঐ শহরের আকাশ বেশিরভাগ সময়েই কুয়াসায় ঢাকা থাকত। অতএব আকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ কোপার্নিকাস বড় একটা পেতেন না। পরিষ্কারভাবে আকাশটা না দেখেও একজন বড় জ্যোতির্বিদ হয়ে ওঠা—এ যেন একটি অন্ধ মানুষের একখানা মহান তৈলচিত্র এঁকে ফেলার মত।

সৌরকেন্দ্রিক জগতের ধারণা সর্বপ্রথম উপস্থিত করেছিলেন অ্যারিস্টার্কাস আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। কাজেই এ বিষয়ে কোপার্নিকাস মৌলিকত্ব দাবি করতে পারেন না, কিন্তু এ ধারণাটিকে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তাঁর প্রচেষ্টার মূল্য নিশ্চয়ই অনেক বেশি।

কোপার্নিকাস মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীকে সরিয়ে দিলেন, সেখানে স্থাপন করলেন সূর্যকে। তিনি দূরত্ব অনুযায়ী বুধ এবং শুক্রের পর পৃথিবীকে তৃতীয় গ্রহের আসনে বসালেন। তাঁর মত অনুসারে, সূর্য স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি—এই ছটি গ্রহ বৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে অনবরত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। সূর্য পুবদিকে উদয় হয়, পশ্চিমদিকে অস্ত যায়—আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সূর্যই গতিশীল। কিন্তু আসল কথা হল পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরপাক খাচ্ছে, আর তারই ফলে দিন ও রাতের পালাবদল ঘটছে। পৃথিবী যদি খাড়াভাবে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরত, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি দিনের পরিমাণ হত সমান এবং সূর্যকেও আমরা মোটামুটি একই পথ ধরে চলতে দেখতুম। পৃথিবীর এ গতিকে আমরা বলি আহ্নিক গতি। কিন্তু পৃথিবীর দুই মেরুর সংযোগরেখা তার খাড়া অবস্থা থেকে ২৩½ ডিগ্রি হেলে থাকবার জন্যে সূর্য ছয় মাস উত্তর গোলার্ধের উপর ও ছয় মাস দক্ষিণ গোলার্ধের

উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এরই ফলে পৃথিবীতে ঋতুর পালাবদল ঘটে এবং তার দিন ও রাত হয় ছোট ও বড়। মহাবিশ্বের যে ব্যাপ্তির কথা কোপার্নিকাস বললেন, তা ছিল পূর্বের ধারণার তুলনায় অনেক বিশাল।

কোপার্নিকাস একটি বিরাট গ্রন্থে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণাকে লিপিবদ্ধ করে ছোট একটি পুস্তিকায় তার কিছু অংশ প্রকাশ করলেন। ইয়োরোপের পণ্ডিতমহলে গুঞ্জনধ্বনি শুরু হল। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করার ফলে নানা অভিযোগ শোনা গেল। গির্জার নেতারা কোপার্নিকাসকে তাঁর মতামত পুস্তিকাকারে প্রকাশ করার জন্যে বলে পাঠালেন। কিন্তু কোপার্নিকাস তাতে রাজি হলেন না। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। টলেমির বিশ্বমতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধারণার কথা প্রকাশ করে তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার আসন থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নন।

এই সময় রেটিকাস নামে একজন তরুণ জার্মান জ্যোতির্বিদের সঙ্গে কোপার্নিকাসের সাক্ষাৎ হল। রেটিকাস কোপার্নিকাসের বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রায় তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে জার্মানির এক ছাপাখানা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন। দীর্ঘকাল বাদে বইখানা ছাপা হয়ে যেদিন কোপার্নিকাসের কাছে এসে পৌছল, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সেদিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

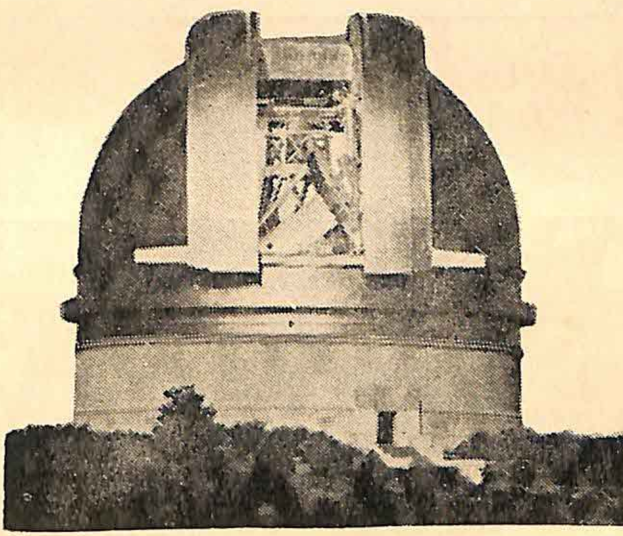
কোপার্নিকাসের গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের ভাবজগতে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হল। একটুখানি অন্যায় কাজ করে ফেলেছিলেন কোপার্নিকাস। যে মানুষটির ভূমিকা তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিল সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেই রেটিকাসের প্রতি তিনি তাঁর গ্রন্থে কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। গ্রন্থের মুখারম্ভে তিনি ছোট বড় অনেক মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু



মেঘনাদ সাহা



কেপলার



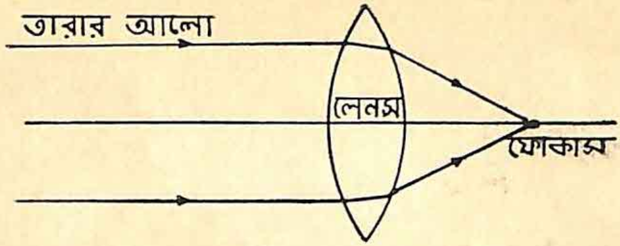
পালোমার আলোক-দূরবীন



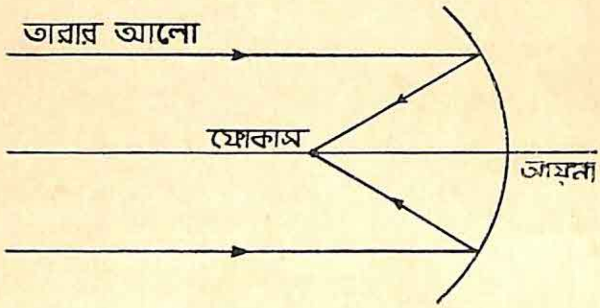
গ্যালিলিও



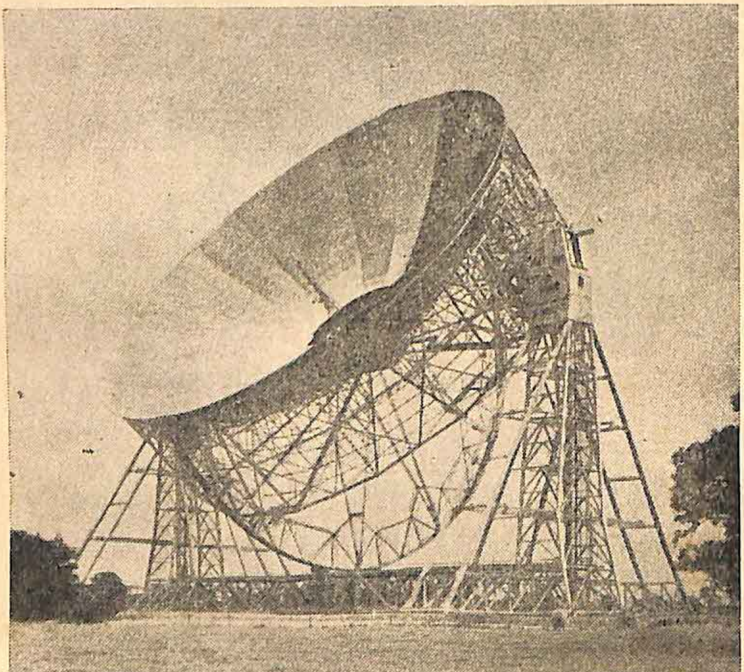
ব্রুনো



প্রতিসরক দূরবীন



প্রতিফলক দূরবীন



'জড্রেল ব্যাঙ্ক' রেডিও দূরবীন যন্ত্র

তাঁর পূর্বসূরী অ্যারিস্টার্কাসের নাম বাদ দিয়েছেন। সৌরকেন্দ্রিক জগতের ধারণার সম্পূর্ণ কৃতিত্বটুকু বোধহয় তিনি দাবি করতে চেয়েছিলেন।

কোপার্নিকাস গ্রহদের সূর্য-পরিক্রমা-পথের চেহারা বৃত্তাকার বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ফলে টলেমির মতই তাঁর বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে কতকগুলো জটিলতা থেকে গিয়েছিল।

কেপলার ও টাইকো

কোপার্নিকাসের মতকে তার অপ্রয়োজনীয় জটিলতার জাল থেকে মুক্ত করলেন একজন জার্মান জ্যোতির্বিদ। তাঁর নাম জোহানেস কেপলার।

কেপলারের প্রথম জীবনটা ছিল উদ্দেশ্যবিহীন। হঠাৎ একদিন কোপার্নিকাসের লেখা একখানা বই তাঁর হাতে এসে পড়ে। বইখানা পড়ে তিনি মুগ্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির করেন, কোপার্নিকাসের তত্ত্বই যে সঠিক এটা তিনি প্রমাণ করবেন। অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যয়নে কেপলার গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদরূপে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোর আয়তনকে কোন জ্যামিতিক ছকের দ্বারা প্রকাশ করা যায় কি না, এ বিষয়ে ভাবতে গিয়ে কেপলার একটি ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। এ সময়ে গ্রহদের আবর্তনসংক্রান্ত কিছু তথ্য হঠাৎ তাঁর হাতে এল। এগুলোর ভিত্তিতে তাঁর ধারণাকে আর সঠিক বলে ধরে নেওয়া যাচ্ছিল না। কেপলার হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তলিয়ে বুঝতে হবে তাঁর ভুলটা কোথায়। কিন্তু তার জন্যে দরকার গ্রহদের আবর্তন বিষয়ে নির্ভুল বেশ কিছু তথ্য। বেশ বড় একটি মানমন্দির ছাড়া যা আর কোথাও পাবার সম্ভাবনা নেই।

সে সময়কার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানমন্দির ছিল ডেনমার্কে ; তখনকার সবচেয়ে সম্মানিত জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে ছিলেন এখানকার পরিচালক। টাইকো তাঁর মানমন্দিরে বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়েছিলেন এবং সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে গ্রহদের আবর্তনের উপর বহু নিখুঁত চার্ট প্রণয়ন করেন। টাইকো ছিলেন ভয়ানক দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। তাঁর ক্রমাগত উদ্ধত আচরণে বিরক্ত হয়ে একদিন ডেনমার্কের রাজা তাঁর মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। টাইকো তাঁর চার্ট ও দলবল-সমেত এসে হাজির হলেন জার্মানিতে, সেখানে বোহেমিয়ার সম্রাটের সাহায্যে এক মানমন্দির তৈরি করে বসলেন। টাইকো টলেমি-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। আবার কোপার্নিকাসের ধারণা অনুযায়ী সূর্যকেও মহাবিশ্বের কেন্দ্ররূপে তিনি মানতে পারছিলেন না। সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁর নিজের একটি অদ্ভুত ধারণা ছিল। সেটা হল এই যে, পৃথিবীকে বাদ দিয়ে অন্য সব গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তারপরে সূর্য এবং ঐ গ্রহগুলো আবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এরকম একটি বিশ্ব-মত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অঙ্কশাস্ত্রে যে অধিকার থাকা দরকার টাইকোর তা ছিল না। তাই তিনি একজন অঙ্ক-জানা লোকের সন্ধানে ছিলেন। কাজেই কেপলার যখন তাঁর কাছে আসেন তিনি সানন্দে তাঁকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করে নিলেন। কেপলার ছিলেন তখন জার্মানির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন, টাইকো তাঁকে সহকারী গবেষকরূপে নিযুক্ত করবেন। কিন্তু তা না করায় তিনি খানিকটা বিস্মিতই হয়েছিলেন।

মঙ্গলগ্রহের সঠিক সূর্যপরিক্রমা-পথ, কক্ষপথ, তার গতিবেগ এবং সূর্য থেকে তার সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করার কাজ দেওয়া হল কেপলারকে। কেপলার গর্ব করে বলেছিলেন, কাজটি শেষ করতে তাঁর সময় লাগবে আটদিন মাত্র ; আসলে সময় লেগেছিল কিন্তু আট বছর।

টাইকোর তৈরি করা তথ্যগুলো তাঁর কাজের জন্যে কেপলারের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু টাইকো সেগুলো যক্ষের ধনের মত আগলে রাখেন, তাঁর এত বছরের পরিশ্রমের ফল তিনি কেপলারকে দেখাতে নারাজ। কেপলার তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে যাবার ভয় দেখালেন। টাইকো তখন তাঁর চার্টের পুঁথি খুলে দু'একটা পাতা কেপলারকে দেখান, আবার সেটা বন্ধ করে রাখেন। এ-ধরনের বিচিত্র একটি ব্যাপার দু-জনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল।

একদিন এক ভোজসভায় প্রচুর খাওয়াদাওয়ার পর ফিরে এসেই টাইকো মারা গেলেন। বোহেমিয়ার রাজা টাইকোর জায়গায় কেপ-লারকে প্রধান জ্যোতির্বিদরূপে নিযুক্ত করলেন। টাইকোর গ্রহদের পর্যবেক্ষণের সমস্ত চার্ট কেপলারের হাতে এল। তিনি মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথ নিরূপণে নতুন উৎসাহে কাজে বসলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, টাইকোর তথ্যের ভিত্তিতে তিনি যতবার মঙ্গলের কক্ষপথ আঁকবার চেষ্টা করেন সেটা কিন্তু আর বৃত্ত থাকে না; তার চেহারাটা হয়ে দাঁড়ায় একটি ডিমের আকারের মত। ইচ্ছে করলেই আঁকার কৌশলে ডিম্বাকৃতিকে বৃত্ত করে ফেলা যায়। কিন্তু তা হবে নিজেকে প্রতারণা করা। অথচ যে সময়ের কথা বলছি সেদিন পর্যন্ত গ্রহদের কক্ষপথকে বৃত্তাকার ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই সম্ভব হয় নি। দীর্ঘ ছ-বছর ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের কাজ ও টাইকোর তথ্যকে পরীক্ষা করে কেপলার এক অসাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। মঙ্গল এবং অন্য সবকটি গ্রহের সূর্যপরিক্রমা-পথ বৃত্তাকার নয়, তা আসলে ডিম্বাকৃতি বা উপবৃত্তাকার। বৃত্তের কেন্দ্র একটি, কিন্তু উপবৃত্তের কেন্দ্র দুটি, যার প্রত্যেকটিকে বলা হয় ফোকস্। গ্রহগুলোর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের একটি ফোকসে রয়েছে সূর্য। পরীক্ষার মাধ্যমে আর একটি বৃহৎ সত্যে পৌঁছলেন কেপলার— গ্রহগুলো যখন সূর্যের কাছে আসে, তখন তাদের চলবার গতি যায় বেড়ে, আবার সূর্য থেকে দূরে গিয়ে পৌঁছোলে সেই গতি

আসে কমে। সূর্য যেন গ্রহগুলোকে এক অদৃশ্য বলের দ্বারা টানছে। এই অদৃশ্য বল বা মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে কেপলার কোন ধারণা করতে পারেন নি, এর জন্যে আরো দুশো বছর যে মানুষটির জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল, তিনি হলেন নিউটন।

গ্রহদের গতিবিধি বিষয়ে কেপলার তিনটি ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যাকে বহু অপ্রয়োজনীয় জটিলতা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিল।

জিওর্দানো ব্রুনো

বিজ্ঞানের সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যে যে মানুষটি সর্বপ্রথম আত্মদান করেছিলেন তিনি হলেন ইতালির জ্যোতির্বিদ জিওর্দানো ব্রুনো। ১৫৪৮ সালে এই মানুষটির জন্ম হয়। কোপার্নিকাসের বিশ্ব-ধারণা যে খাঁটি সত্য, এটা তিনি যে শুধু মনে-মনে বিশ্বাস করতেন তাই নয়, ঐ ধারণার প্রচারের জন্যে তিনি ইয়োরোপের বিভিন্ন শিক্ষানিকেতনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। অবশ্য কেউ তাঁর কথায় কান দিত না। ইতালির গির্জা ব্রুনোকে সাবধান করে দিলেন। ব্রুনো কিন্তু তাঁর প্রচার বন্ধ করলেন না, এবারে তিনি গির্জার অন্ধ কুসংস্কারকেই আক্রমণ করে বসলেন। ব্রুনো আর নিস্তার পেলেন না। তাঁকে ধরে নিয়ে এসে বিচার করা হল এবং দীর্ঘদিন বন্দী করে রাখার পর ১৬০০ সালে আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। শেষ মুহূর্তে ব্রুনোকে বলা হয়েছিল, গির্জার কাছে তাঁর আচরণের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি মুক্তি পেতে পারেন, কিন্তু ব্রুনো সে প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। বিজ্ঞানের সত্যের জন্যে ব্রুনোর আত্মত্যাগ ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

গ্যালিলিও

"কোন কিছু প্রমাণিত হয়েছে বলেই তাকে মেনে নিতে

হবে, এরকম বিধান মানুষের আত্মার পক্ষে ক্ষতিকারক"—একথা বলেছিলেন গ্যালিলিও গ্যালিলাই। ইতালির এই মানুষটি গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যার জন্ম দিয়েছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যাও তাঁর অবদানে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তিনিই পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি নিজের হাতে একটি দূরবীন তৈরি করে ঐ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। সময়টা হল ১৬১০ সাল। তার দৃষ্টির সামনে আকাশের বহু বিস্ময় ধরা দিয়েছিল। চাঁদের জমির উপর উঁচু পাহাড়ের সন্ধান তিনি পেলেন। এর আগে পণ্ডিতেরা বলতেন চাঁদ একটি মসৃণ জায়গা। চাঁদের মত শুক্রগ্রহেরও কলার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে দেখলেন গ্যালিলিও। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, শুক্র সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই তার উজ্জ্বলতাকে সৃষ্টি করছে। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল কিন্তু বলেছিলেন যে গ্রহগুলো নিজেরাই আলো ছড়ায়। সূর্যের বুকে কালো কলঙ্কের অবস্থান দেখা গেল। ঐ কলঙ্কগুলোকে গতিশীল হতে দেখে গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করলেন, সূর্যও আপন অক্ষদণ্ডের উপর লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। গ্যালিলিওর দূরবীনে ধরা পড়ল, চারটি চাঁদ বৃহস্পতি গ্রহের চারপাশে ঘুরে চলেছে। কোপার্নি-কাসের সৌরকেন্দ্রিক জগতে সূর্যের চারদিকে যেমন গ্রহগুলো আবর্তন করে, এখানেও যেন তার একটি ছোট অনুকৃতি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

গ্যালিলিও তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল একটি ছোট বইতে লিখে প্রকাশ করলেন। কোপার্নিকাস-তত্ত্বের প্রতি সমর্থন তাঁর লেখাতে ছিল। ইতিপূর্বে সবাই জ্ঞান বিজ্ঞানের বই লিখতেন ল্যাটিন ভাষায়। গ্যালিলিও লিখলেন তাঁর মাতৃভাষা ইটালীয়তে যাতে সাধারণ মানুষও তাঁর আবিষ্কারের কথা জানবার সুযোগ পায়। গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আকাশের ঘটনাগুলোকে দেখবার জন্যে তৎকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট আমন্ত্রণ পাঠালেন,

তাঁদের বহুদিনের জমানো ভুল ধারণাগুলো তাহলে ভাঙবার সুযোগ পাবে। পণ্ডিতেরা বেশিরভাগই দেখতে রাজি হন না, যে দু-একজন রাজি হন, দেখেও চোখের দেখাকে বিশ্বাস করতে চান না। এমনিই ছিল তাদের অন্ধ গোঁড়ামি।

গ্যালিলিও একখানি বই লিখেছিলেন, তাতে ছিল দু-জন অধ্যাপক ও একজন সাধারণ সরল মানুষের চরিত্র। পরস্পরের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে গ্যালিলিও টলেমির বিশ্ব-মতকে খণ্ডন করেন এবং কোপার্নিকাসের মতকে প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার ইতালির পোপকে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ বোঝাল যে, গোবেচারা মানুষটির মধ্যে গ্যালিলিও নাকি তাঁকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। পোপ যদিও ছিলেন গ্যালিলিওর বন্ধু, অবস্থার চাপে তিনি গ্যালিলিওকে তলব করতে বাধ্য হলেন। গ্যালিলিওর বিচার হল এবং বিচার-কক্ষে নতজানু হয়ে বৃদ্ধ গ্যালিলিওকে স্বীকার করতে হল—কোপার্নিকাসের মতের সপক্ষে তিনি যা কিছু বলেছেন, সবই ভুল। গ্যালিলিওকে পরবর্তী জীবনে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয় এবং অন্ধ অবস্থায় তিনি মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থিতিবিদ্যার ও গতিবিদ্যার উপর একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করে ভ্রান্ত অ্যারিস্টটেলীয় ধ্যানধারণাকে বিজ্ঞান জগৎ থেকে চিরতরে নির্বাসিত করেন।

গ্যালিলিওর সময় গ্রহজগৎ সম্পর্কে কেপলারের নিয়মগুলো প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি কিন্তু সেই নিয়মগুলোকে প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন নি, বরং কোপার্নিকাসের মতকেই তিনি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন।

নিউটন

যে বছর গ্যালিলিওর মৃত্যু হয়, নিউটনের জন্ম হয় সে বছরই। অনেকের মতে নিউটন ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর

মানুষ। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের তিনটি নিয়ম থেকেই পদার্থবিদ্যা ও বলবিদ্যার আরম্ভ। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব সৌরজগতের সূর্য ও গ্রহগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণবলকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করল। তাছাড়া কেপলারের গ্রহজগতের তিনটি নিয়মের অতি সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া গেল নিউটনের তত্ত্ব থেকে। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্র অন্ধকার থেকে আলোর জগতে প্রবেশ করল। নিউটন ছিলেন খুবই বিনয়ী। তিনি বলতেন, "বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারো চেয়ে যদি আমি বেশি দেখে থাকি, তা সম্ভব হয়েছে শুধু এইজন্যে যে, আমি নিজে মহা প্রতিভাধর মানুষদের পিঠের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম।"

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যা

প্রাচীন ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও '০' শূন্যের আবিষ্কার। এই সংখ্যাগণনা-পদ্ধতি আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে শিখেছিল; ইয়োরোপ আবার আরবদের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে। আগে দু-অক্ষরের একটি বড় সংখ্যা লিখতে গেলেই প্রায় পুরো একটি লাইন জুড়ে বসত, কিন্তু এই সংখ্যা আবিষ্কারের পর সূর্য থেকে গ্রহাদির দূরত্বের মত বড় মাপকেও খুব সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হল।

প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার খুব নিকট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মানুষের ভাগ্য যাঁরা গণনা করতেন, তাঁদের সকলকেই গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হত। পাটীগণিত ও বীজগণিত—অঙ্কশাস্ত্রের এই উভয় বিভাগেই প্রাচীন ভারতীয়দের বহু মৌলিক আবিষ্কার রয়েছে এবং বীজগণিতের সূক্ষ্ম গণন-পদ্ধতিকে তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যায় প্রয়োগ করেছিলেন।

বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয়রা জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা শুরু করেন। বৈদিক ঋষিরা জানতেন, আজকের চাঁদ ২৭ থেকে ২৮ দিন পরে

আবার আকাশের একই জায়গায় ফিরে আসবে। এবং সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই চাঁদের জ্যোৎস্নার সৃষ্টি। এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা থেকে আর একটি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পর্যন্ত তিরিশবার সূর্যোদয় ঘটছে লক্ষ্য করে তাঁরা ৩০ দিনে মাস স্থির করেন। পরে অবশ্য তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, চান্দ্র মাস ৩০ দিনের চেয়ে কিছু কম দিনে হয়। তাঁরা আরও দেখলেন, নক্ষত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সূর্য আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। যে-কোন একটি নক্ষত্রের কাছাকাছি জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে সূর্য ৩৬৫ দিনে আবার তার সঙ্গে একত্র হচ্ছে। এ থেকে ৩৬৫ দিনে বছরের হিসেব তাঁরা পেয়েছিলেন। একে বলা হল সৌর বছর। কিন্তু বারোটি চান্দ্র মাসে ঠিক ৩৬৫ দিন হয় না, প্রতি তিন বছরে প্রায় একমাসের মত ঘাটতি পড়ে। চান্দ্র ও সৌর বছরের সামঞ্জস্য করবার জন্যে তাঁরা প্রতি তিন বছর অন্তর একটি 'মল' মাস কল্পনা করে নিতেন।

আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয়রা গ্রহদের সম্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাঁরা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই পাঁচটি গ্রহের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে আর্যভট্টের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আপন অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে যে দিন ও রাত ছোট বড় হয় এ তত্ত্ব তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। আর্যভট্টের প্রায় এক হাজার বছর পরে ইয়োরোপে কোপার্নিকাসের কাছ থেকেই আমরা এই ধারণা লাভ করেছিলাম। কি কারণে সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণ ঘটে, আর্যভট্টের তাও জানা ছিল। চন্দ্র ও গ্রহগুলোর কারোর নিজের আলো নেই এবং সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই যে তারা আলোকিত, এটা তিনি বুঝেছিলেন। গ্রহগুলো পৃথিবীরই মত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং তাদের

কক্ষপথ ঠিক বৃত্তাকার নয়—অনেকটা উপবৃত্তাকার, এই সঠিক ধারণা আজ থেকে দেড় হাজার বছরেরও আগে আর্যভট্টের চিন্তায় কিভাবে এসেছিল, ভেবে আমরা বিস্মিত হই। পৃথিবী যে গোলাকার, বৈদিক ঋষিদের কাছে এ তথ্যও জানা ছিল।

প্রাচীন ভারতের অপর দুজন শ্রেষ্ঠ অঙ্কশাস্ত্রবিদ ছিলেন ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য। তাঁরা পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের গণনা অনুযায়ী পৃথিবীর ব্যাস দাঁড়ায় ৭,১৮২ মাইল; বর্তমান মতে এর পরিমাণ হল ৭,৯২৬ মাইল।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা পাই পৃথিবীর বয়েস নির্ণয়ের বিচারে। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স দুশো থেকে তিনশো কোটি বছর; আধুনিক বিচারে এ সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে চারশো থেকে পাঁচশো কোটি বছর। সেযুগের পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোন পণ্ডিতই এ বিষয়ে এতখানি বৈজ্ঞানিক বিচার-পদ্ধতির পরিচয় দিতে পারেন নি।

জ্যোতির্বিদ্যার আরো নানা ক্ষেত্র প্রাচীন ভারতীয়দের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করছে।

১৭৩৪ সালে খালি চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ কয়েকটি মানমন্দির তৈরি করেছিলেন জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ। এই ভারতীয় নৃপতি-জ্যোতির্বিদ উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি মানমন্দিরের যন্ত্রসজ্জা হবে যত বৃহৎ, তত নিখুঁত হবে তাদের কাজ। জয়সিংহ সবশুদ্ধ পাঁচটি মানমন্দির তৈরি করান ভারতের পাঁচটি শহরে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি রয়েছে রাজস্থানের জয়পুরে।

২
তারা ও দূরবীন

আকাশ-ভরা তারা কার দৃষ্টিকে মুগ্ধ না করে? তোমরা কখনো ভেবে দেখেছ কি, খালি চোখে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কতগুলো তারা নজরে পড়ে? মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার। তবে, তাদের গুণে ওঠা খুবই শক্ত। কিন্তু একটি দূরবীন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যদি আকাশের দিকে তাকানো যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাব কোটি কোটি তারা। জোরালো দূরবীনের কাচের চোখেই তারাদের আলো ধরা পড়ছে, মানুষের দৃষ্টি তাদের নাগাল পায় না।

আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে ঘরের কাছের তারাটি কে? সে এমন এক আশ্চর্য জাতের তারা, যাকে আমরা রাতের আকাশে দেখি না, তার সন্ধান মেলে দিনের আকাশে। সেই তারাটি হল সূর্য। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ৯,৩০,০ ০,০০০ মাইল। দূরত্ব মাপবার আর একটি মাপকাঠি আমরা জানি। তা হল আলোর গতিবেগ। আলো এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল চলে। ঐ গতিবেগ নিয়ে আলোর সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছোতে সময় লাগে ৮ মিনিট। তাহলে, নতুন মাপকাঠিতে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব দাঁড়াল ৮ আলো-মিনিট। তারাজগতের দূরত্ব কষতে এই মাপকাঠি ছাড়া অন্য উপায় নেই।

সূর্যের সবচেয়ে ঘরের কাছের তারাটির নাম প্রক্সিমা সেণ্টরি, দূরত্ব—চার আলো-বছর। মাইলের হিসেবে দাঁড়াবে ২৩, ৫১২,০০০, ০০০,০০০ মাইল। মনে করা যাক, পৃথিবী থেকে একটি মহাশক্তিশালী রকেট-যন্ত্র ঘণ্টায় দশ লক্ষ মাইল গতিবেগ নিয়ে যাত্রা শুরু করল, তাহলে প্রক্সিমা সেণ্টরির দেশে পৌঁছোতে তার সময়

লাগবে তিন হাজার বছর। ভাবতে বসলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় না কি ?

তারাদের দেশে একটি সুন্দর ব্যাপার আমাদের চোখে পড়বে। এক-এক জায়গায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা একঠাঁই হয়ে এক একটি বিশাল তারাজগত গড়ে তুলেছে। ইংরেজিতে তারাজগতকে বলে গ্যাল্যাক্সি। আমরাও এরকম একটি তারাজগতে বাস করি। তার নাম ছায়াপথ বা Milky way। এই ছায়াপথের মধ্যে রয়েছে দশ হাজার কোটি তারা। আকাশে খালি চোখে যত তারা আমরা দেখি, তারা সবাই এই ছায়াপথের বাসিন্দা। একটি তারা থেকে আর একটি তারার দূরত্ব বহু কোটি মাইল। একটি আলোর ঢেউয়ের ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে সময় লাগবে এক লক্ষ বছর। অক্টোপাসের শুঁড়ের মত দুটি বাহু ছায়াপথের দু-প্রান্তে কুণ্ডলীর আকারে জড়িয়ে আছে। আমাদের সূর্যদেব রয়েছেন এই তারাজগতের কেন্দ্র থেকে ত্রিশ হাজার আলো-বছর দূরে, বহু সহস্র কোটি তারার মাঝখানে অতি সাধারণ একটি নক্ষত্ররূপে যাঁর পরিচিতি।

ছায়াপথের কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তারাগুলোকে আলাদা আলাদা করে চেনা খুবই শক্ত। কারণ তারা প্রায় সবাই ঢাকা পড়ে আছে ধুলো ও গ্যাসের বিরাট বড় মেঘের আড়ালে। এই-জাতীয় মেঘের নাম নীহারিকা। একটি তারাজগতের মধ্যে এরকম বহু নীহারিকা থাকতে পারে। এদের ভেতরে রয়েছে যেসব তারা, তাদের আলোর ছটায় এদের দেহ উজ্জ্বল দেখায়।

আমাদের অন্যতম প্রতিবেশী তারা-জগতটির নাম অ্যাণ্ড্রোমিডা। আমাদের ছায়াপথ থেকে এর দূরত্ব কুড়ি লক্ষ আলো-বছর। এর মধ্যেও রয়েছে দশ হাজার কোটি তারা এবং চেহারার ধরনে ও মাপে এ প্রায় আমাদের ছায়াপথেরই মত। ছায়াপথ, অ্যাণ্ড্রোমিডা এবং আরো চব্বিশটি তারাজগত মিলে একটি মহা-

তারাজগত বা সুপার-গ্যালাক্সি গড়ে উঠেছে। হাইড্রা নামে আর-একটি মহা-তারাজগতের সন্ধান আমরা পেয়েছি, যার মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে কয়েক হাজার তারাজগত। একটি তারাজগতের সঙ্গে আর একটি তারাজগতের এভাবে গাঁটছড়া বাঁধবার মূল কারণ হল নিউটনের মহাকর্ষবল। এই বলের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু অপর প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে চলেছে।

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আজ বা বর্তমান বলে কোন কথা নেই। সেখানে সব পুরোনো বা বাসি খবর। যে সূর্যকে এই মুহূর্তে দেখছি, সে আট মিনিট আগের সূর্য ; যে ধ্রুবতারাকে দেখছি বর্তমান সময়ে সে ধ্রুবতারা থেকে কিন্তু আলো যাত্রা শুরু করছিল ১০৮৫ বছর আগে। অর্থাৎ সূর্য বা ধ্রুবতারা যদি এই মুহূর্তে কোন কারণে ধ্বংসও হয়ে যায়, সে খবর আমরা পাব আট মিনিট বা ১০৮৫ বছর বাদে।

আলোক-দূরবীন

আকাশের এত অগণিত তারাজগতের খবর যে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, সে হল দূরবীন-যন্ত্র, আলো নিয়ে যার কারবার। পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো আলোক দূরবীন যন্ত্রটি বসানো আছে আমেরিকার পালোমার মানমন্দিরে। এর চোখের কাচখণ্ডটির ব্যাস হল দুশো ইঞ্চি। কাচখণ্ডটি আসলে একটি আয়না, যার ওজনই হল ১৪½ টন আর সমগ্র দূরবীন যন্ত্রটির ওজন হল ৫৩০ টন।

যে দূরবীনের চোখে আয়না বসানো থাকে তাকে বলে প্রতিফলক বা রিফ্লেকটর। প্রথম প্রতিফলক দূরবীন তৈরি করেছিলেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন। তাঁর দূরবীনের কাচখণ্ডের ব্যাস ছিল এক ইঞ্চি। যে দূরবীনে আয়নার পরিবর্তে একটি লেন্স ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় প্রতিসরক বা রিফ্র্যাকটর। এ জাতীয় একটি দূরবীন তৈরি করে তার সাহায্যে গ্যালিলিও সর্বপ্রথম আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

প্রতিফলক দূরবীনে ব্যবহার করা হয় একটি উত্তল বা কন্‌ভেক্স লেন্স। তারার আলো লেন্সের ভেতর দিয়ে যাবার সময় তাদের পথ যায় বেঁকে এবং লেন্সের ফোকাসে ঐ তারার একটি প্রতিবিম্ব ধরা গড়ে। এই লেন্সটিকে বলা হয় অব্‌জেকটিভ। ফোকাসে যে প্রতিবিম্ব গড়ে উঠল, তার চেহারা হয় মূলবস্তুর ঠিক উল্টো, কিন্তু একটি আই-পিস বা প্রতিবর্ধক কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলেই আবার তা সোজা হয়ে এসে চোখে ধরা দেবে। পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো প্রতিফলক দূরবীন রয়েছে আমেরিকার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কেস মানমন্দিরে, যার লেন্সের ব্যাস হল চল্লিশ ইঞ্চি।

একটি প্রতিফলক দূরবীনে আয়নার কাচখণ্ডের চেহারাটা হয় বক্রাকৃতি বা অর্ধবৃত্তাকার। আয়নার কাচের ওপর অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর অতি সূক্ষ্ম একটি প্রলেপ লাগানো থাকে। তারা থেকে আলোর ঢেউ আসে সমান্তরাল রেখায়, আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় ফোকাসে, একটি আইপিসের মধ্য দিয়ে যাকে আমরা দেখি।

একটি দূরবীনের নক্ষত্রের আলোক-রেখাকে ধরবার ক্ষমতা নির্ভর করে তার আয়না বা লেন্সের আয়তনের উপর। একটি মানুষের চোখের তারার ব্যাস হল এক ইঞ্চির চারভাগের একভাগ। খুব বেশি আলো ধরবার ক্ষমতা এর নেই। যে লেন্সের ব্যাস চল্লিশ ইঞ্চি, তা মানুষের চোখের চেয়ে ২৫,০০০ গুণ বেশি আলোক সংগ্রহ করতে পারে; ফলে বহু আবছা বস্তুও এর নাগালের মধ্যে পৌঁছে যায়। খালি চোখে মানুষ পাঁচ মাত্রার তারার বেশি দেখতে পায় না, কিন্তু চল্লিশ ইঞ্চি একটি দূরবীনের চোখে ষোল মাত্রার তারার আলো ধরা পড়বে। (তারার মাত্রা সম্বন্ধে কিছু কথা আমরা পরে আলোচনা করব।)

পালোমার মানমন্দিরের দূরবীনের আয়নার ব্যাস দুশো ইঞ্চি, কাজেই মানুষের চোখের তুলনায় এর তারার আলোকে ধরবার

ক্ষমতা প্রায় দশলক্ষ গুণ বেশি। এই দূরবীনের সাহায্যে তেইশ মাত্রার তারা আমরা অনায়াসে দেখতে পাব।

বর্তমানে অবশ্য জ্যোতির্বিদরা দূরবীনের সাহায্যে আকাশের তারা-জগতকে বড়-একটা দেখেন না বললেই চলে। একটি বিশেষ নক্ষত্র বা তারাজগতের ছবি তোলার ওপর তাঁরা অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। খালি চোখে একটি তারাকে যতক্ষণ ধরেই দেখা যাক না কেন, তার সাধারণ আলোর তুলনায় বেশি উজ্জ্বল দেখাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু একটি দূরবীন যন্ত্রের সঙ্গে যদি ক্যামেরা যুক্ত থাকে, তাহলে সেই ক্যামেরার প্লেটের ওপর তারার দেহ থেকে আলো যেন চুইয়ে চুইয়ে এসে জমা হতে থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। দু-ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা ধরে ছবি তোলার কাজ যখন চলছে, সে সময়ে পৃথিবী কিন্তু স্থির হয়ে বসে নেই। আকাশে সূর্যপরিক্রমাপথে ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল গতিবেগে সে ছুটে চলেছে। পৃথিবীর স্থান পরিবর্তনের ফলে নক্ষত্রের উপর স্থির লক্ষ্য থেকে দূরবীন-যন্ত্রের দৃষ্টি যাতে সরে না যায়, তার উপযুক্ত অতি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা আধুনিক দূরবীন ক্যামেরাযন্ত্রে রয়েছে।

একটি মস্ত বড় বাধার সঙ্গে জ্যোতির্বিদদের প্রায়ই যুঝতে হয়। সে হল সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলের ঘেরাটোপটা। বায়ু-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে প্রতিনিয়ত নানারূপ আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে চলেছে। আন্দোলিত বায়ুস্তরের ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করতে গিয়ে তারার আলোর গতিপথ হয়ে পড়ে আঁকাবাঁকা, তাই রাতের আকাশে বেশিরভাগ তারাকে আমরা মিটমিট করে জ্বলতে দেখি। পৃথিবীর সব মানমন্দিরই তাই তৈরি হয়েছে পাহাড়ের উঁচু চুড়োয়, যাতে ঘন বায়ুমণ্ডলের সামান্য কিছু অংশকে নিচে ফেলে আসা যায়। দীর্ঘসময় ধরে তোলার পর তারার ছবি ঝাপসা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা এতে খানিকটা কমে।

আকাশ পর্যবেক্ষণের আর একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হল

লোকালয়ের বৈদ্যুতিক আলোর ছটা। মানমন্দির তাই লোকালয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে তৈরি করতে হয় এবং জ্যোতির্বিদের কাজ শুরু হয় গভীর রাতে, যখন আর সবাই নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নিশাচর প্রাণীর মত এই মানুষটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে উপেক্ষা করে চলেন।

মহাবিশ্ব

পালোমার মানমন্দিরের মহাশক্তিমান দূরবীনটির চোখে ধরা দিয়েছে কত লক্ষ কোটি তারাজগত। সবচেয়ে দূরের যে তারাজগতটির আলোর সন্ধান এই দূরবীনে অল্প কিছুকাল আগে পাওয়া গেছে, আমাদের কাছ থেকে তার দূরত্ব হল পাঁচশো কোটি আলো-বছর। তারাজগতটির নাম 'তিন সি ২৯৫' এবং তার আলো-যাত্রা শুরু করেছিল এমন একটা সময়ে যখন সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলোর জন্মের পালা হয়ত সবে শুরু হয়েছে। সেই পাঁচশো কোটি আলো-বছর পূর্বের পথযাত্রী প্রাচীন আলোর স্পর্শে সমগ্র পৃথিবী যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বিজ্ঞানের এক মস্ত বড় বিস্ময় ঐ আলোর মধ্যে রয়েছে। যদি তার পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, তাহলে পৃথিবী ও গ্রহগুলোর জন্মরহস্যের কিছু নতুন তথ্য হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

তোমরা প্রশ্ন করতে পার, লক্ষ কোটি তারাজগত নিয়ে গড়ে উঠেছে যে মহাবিশ্ব, তা কি ঐ পাঁচশো কোটি আলো-বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ? জ্যোতির্বিদ বলবেন, পালোমার দূরবীনের চূড়ান্ত ক্ষমতায় এক দূরতম প্রদেশের তারাজগতের সন্ধান আমরা পেয়েছি ঠিক, তাহলেও মহাবিশ্বের মোট আয়তনের এ এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। মহাবিশ্বের বড় অংশটাই যে আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বোধহয় তাই থেকে যেত, যদি না আর-একটি সংবাদবাহকের সন্ধান আমরা পেতুম—রেডিও-তরঙ্গ নামে যার পরিচিতি।

রেডিও-দূরবীন

কালো আকাশের দিকে তাকালে নানা জায়গায় তারার জটলা যেমন চোখে পড়ে, তেমনি কালো কালো ছোপ-ছোপ অনেকগুলো জায়গাও নজর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তোমরা মনে করতে পার, ওখানে কোন তারা নিশ্চয়ই নেই, তাই কালো দেখাচ্ছে। আসলে, সেখানে তারা রয়েছে অনেক, কিন্তু তাদের আলো পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে পারছে না। মাঝপথে জমাট-বাঁধা ধুলো ও গ্যাসের মেঘ তাকে বন্দী করে ফেলেছে। ঐ তারা ও তারাজগতগুলোর অবস্থান নির্ণয় করবার উপায় তাহলে কী?

অনেকদিনের পরীক্ষার পর জ্যোতির্বিদ আজ জানতে পেরেছেন, আকাশের বহু তারা আলোর ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছড়ায় বেতার-ঢেউ। এ তারাগুলোর আমরা নাম দিতে পারি রেডিও-তারা। এ জাতীয় বেতার-ঢেউকে ধরবার জন্যে বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন রেডিও-দূরবীন যন্ত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো রেডিও-দূরবীনটি তৈরি হয়েছে ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জড্রেল ব্যাঙ্ক গবেষণাগারে। শক্ত ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি ২৫০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার বিরাট একটি ডিশের মত দেখতে এই যন্ত্রটি, রেলের মত চাকার উপর বসিয়ে যাকে চারিদিকে ঘোরানো যায়। যন্ত্রের সাহায্যে মুখটাকে এপাশ থেকে ওপাশ যেকোন দিকে ফেরানোও যেতে পারে। ডিশটার কেন্দ্রে ৬২½ ফুট উঁচু একটি এরিয়াল দণ্ড বসানো আছে। ডিশের গা থেকে বেতার-ঢেউ প্রতিফলিত হয়ে এরিয়ালে এসে আঘাত করে। সেখান থেকে চলে যায় ডিশটার ঠিক নিচে বসানো গবেষণা-ঘরে। যত ঝড়ঝঞ্ঝা ও দামাল হাওয়া উঠুক না কেন, দূরবীনের বিরাট ডিশটাকে এতটুকুও নড়াতে পারে না; আটশো টন ওজনের ইস্পাতের বিরাট বাঁধুনি রয়েছে তাকে সামাল দেবার জন্যে।

এই রেডিও-দূরবীন আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত

পর্যন্ত রেডিও-নক্ষত্র ও তারাজগতের সন্ধান করে চলেছে। আকাশের কালো জায়গাগুলোর আড়াল থেকে বহু নক্ষত্র ইতিমধ্যে ধরা দিয়েছে এ যন্ত্রে।

এই যন্ত্রটি হাতে নিয়ে এক মস্ত অভিযানে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। পাঁচশো কোটি আলো-বছর দূরের তারাজগতের আলোর সন্ধান পেয়েছে পালোমার দূরবীন। ওর নাগালের বাইরে বহু তারাজগত থেকে ছুটে আসছে বেতার-ঢেউ, রেডিও-দূরবীনের সাহায্যে যাদের ধরতে পারলে আলোর মহাবিশ্বের সীমানাকে আরো অনেকটা দূরে ঠেলে দেওয়া যায়। মহাবিশ্বের সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত একটি অঞ্চল বিজ্ঞানীদের কাছে এভাবে উন্মুক্ত হতে চলেছে।

আমাদের তারাজগতের মধ্যে বেতার-ঢেউ কিভাবে তৈরি হয়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানারকম মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন, বেতার-ঢেউ পৃথিবীতে আসছে মহাকাশের অনেকখানি ছড়ানো একটি জায়গা থেকে। আমাদের পৃথিবীর মত এই সুবিশাল ছায়াপথেরও নাকি একটি চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। সেই চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ছুটে যাবার সময় একটি ইলেকট্রন কণিকা চক্রাকার গতি লাভ করে বসে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই অবস্থায় ওই ইলেকট্রনটির দেহ থেকে বেতার-ঢেউ নির্গত হতে পারে।

ইলেকট্রন হল নেগেটিভ বস্তুকণিকা, আর প্রোটন হল পজিটিভ বস্তুকণিকা। এরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। ইলেকট্রন একটি প্রোটনের কাছে যত এগিয়ে আসবে, প্রোটনের আকর্ষণ-বলের প্রভাবে তার গতি তত বেড়ে চলবে এবং ইলেকট্রনটি শেষ পর্যন্ত প্রোটনের চারপাশে একটি অর্ধবৃত্তাকার কক্ষপথ রচনা করে বসবে। গতি-বৃদ্ধির সময় ঠিক আগের মতই ইলেকট্রনটির দেহ থেকে ছোট মাপের বেতার-ঢেউয়ের আকারে বিকিরণ ঘটতে থাকবে।

ছায়াপথে বিভিন্ন তারার মধ্যবর্তী প্রদেশ বায়ুশূন্য অঞ্চলের

মতই প্রায় ফাঁকা, কিন্তু তার বিশাল বিস্তৃতির জন্যে বেতার-ঢেউ তৈরির বিভিন্ন ঘটনাগুলো বিপুল পরিমাণে তৈরি হতে থাকবে। এই বেতার-ঢেউগুলো গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে বিপুল শক্তি। তা না হলে এরা লক্ষ কোটি মাইল পথ পাড়ি জমিয়ে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত এসে পেঁাছোতে পারত না। যে দুর্বল চেহারা নিয়ে তারা পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়, তার শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে হয়। বেতার-ঢেউগুলোর সঙ্গী হয়ে আসে আরো কত রকমের ছোট বড় ঢেউ ; চারপাশের যানবাহন, কলকারখানা ও অন্যান্য গোলমেলে আওয়াজ থেকে যাদের জন্ম। এই পাঁচমিশেলি জটলা থেকে প্রয়োজনীয় বেতার-ঢেউটিকে বেছে নেওয়ার কাজটি কি রকম জান ? এ অনেকটা হাজার লোকের জনতার চিৎকারধ্বনির মধ্য থেকে একটি মানুষের কণ্ঠস্বরকে বেছে নেওয়ার মত।

জড্রেল ব্যাঙ্ক রেডিও-দূরবীনের বেতার-ঢেউ ধরবার ক্ষমতা কতখানি সূক্ষ্ম মাপের, একটি উদাহরণ দিলেই তা বুঝতে পারবে। যদি দূরবীনের চার মাইল দূর দিয়েও হেঁটে যাও, তাহলে তোমার পাকস্থলীর চর্বির দেয়াল থেকে সব সময়ে খুব দুর্বল মাপের যে লাল-উজানী (Infra-red) আলোর বিকিরণ ঘটছে (বেতার-ঢেউয়ের কাছা-কাছি যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য), তা-ও যন্ত্রটির এরিয়ালে ধরা পড়বেই।

আলোক-দূরবীনের কাজের সময় রাতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বেতার-ঢেউ কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা জুড়ে আকাশের সব প্রান্ত থেকে এসে পেঁাছোচ্ছে, রেডিও-দূরবীনের তাই কোন বিশ্রাম নেই।

নক্ষত্রের অন্তঃপুরে

এবারে এস খোদ তারাদের খানিকটা ঘরোয়া পরিচয় গ্রহণ করা যাক। চকচক করলেই সোনা হয় না এই কথাটি তারাদের সম্বন্ধে যতখানি খাটে, এমনটি বোধহয় আর কোথাও নয়। আকাশে পাশাপাশি দুটি তারার মধ্যে একটিকে দেখাচ্ছে হয়ত খুব উজ্জ্বল,

আর একটিকে দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে। আলোর মাপে দ্বিতীয় তারাটি হয়ত প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। সিরিয়াস্ বা লুব্ধক হল আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। পৃথিবী থেকে এই তারার দূরত্ব হল প্রায় নয় আলো-বছর। সূর্যকে যদি সিরিয়াসের মত দূরে নিয়ে গিয়ে বসানো যেত তাহলে সে জাত মান খুইয়ে একটি পঞ্চম মাত্রার তারায় পরিণত হয়ে বসবে। খালি চোখে আবছা মিট-মিট করো আকাশের এক প্রান্তে আমরা জ্বলতে দেখব তাকে।

আলোর জোর অনুযায়ী তারাগুলোকে কতগুলো মাত্রায় ভাগ করা হয়েছে। এক মাত্রার একটি তারা ছুই মাত্রার একটি তারার চেয়ে ঠিক আড়াই গুণ বেশি উজ্জ্বল। মাত্রার মাপ যত বাড়বে, উজ্জ্বলতা তত কমবে। এই হিসেবে এক মাত্রার একটি তারা পাঁচ মাত্রার একটি তারার চেয়ে একশোগুণ বেশি উজ্জ্বল হবে। মাত্রার মাপ একের চেয়ে কম হলে উজ্জ্বলতার পরিমাণ হবে আরো বেশি, যেমন সিরিয়াসের উজ্জ্বলতার মাত্রা হল -১'৭ অর্থাৎ পাঁচ মাত্রার তারা যে সূর্য তার একশোগুণের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল। অবশ্য উজ্জ্বলতার এ পরিমাপ সবটাই আনুমানিক। উজ্জ্বলতার প্রকৃত মাত্রা নিরূপণের জন্যে জ্যোতির্বিদরা সব তারাকেই কাল্পনিকভাবে ৩৩ আলো-বছর দূরে বসিয়ে নেন। তারপর সেখান থেকে তাদের উজ্জ্বলতার মাপ কি দাঁড়াবে, সেটা অঙ্কের সাহায্যে নিরূপণ করেন।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, একটি ত্রিকোণ কাচ বা প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সূর্যের আলো রামধনুর সাত রঙে বিভক্ত হয়ে যায়। সূর্যের সাদা আলো যে সাতটি রঙের সংমিশ্রণ তারা হল বেগুনি, নীল, আশমানী, সবুজ, হল্‌দে, কমলা এবং লাল। সাদা আলোকে বিশ্লেষণ করে যে আলোর স্তর পাওয়া যায়, তাকে বলে বর্ণালী। স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে তারাদের দেহের আলোর বর্ণালীর বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা তাদের পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রার পরিমাণ জানতে পারছেন।

মানুষের সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অপরের চেয়ে কত রকমভাবেই না আলাদা! তারাদের রাজ্যেও যদি এ জাতীয় ব্যাপার ঘটত তাহলে বিজ্ঞানীরা ভয়ানক চিন্তায় পড়তেন। পৃষ্ঠভাগের তাপ অনুযায়ী দেখা গেল, তারাগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা যাচ্ছে, যেমন—O, B, A, F, G, K, M ও N। O শ্রেণীর নক্ষত্রদের পৃষ্ঠতাপ সবচেয়ে বেশি, ২৮,০০০ থেকে ৩৫,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। N শ্রেণীতে পড়ে যে নক্ষত্রেরা, তাদের পৃষ্ঠতাপ সবচেয়ে কম, মাত্র ২,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমাদের সূর্য G শ্রেণীতে পড়ে। এর পৃষ্ঠতাপ ৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

নক্ষত্রদের প্রকৃতির মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। আমাদের সূর্যের মত কেউ একক জীবন যাপন করে চলেছে। কেউ আবার লুব্ধক বা প্রক্সিমা সেণ্টরির মত আর একটি সঙ্গীর সঙ্গে যুগ্মতারার জীবন যাপন করছে। আবার কোথাও বেশ কিছু তারা একঠাঁই হয়ে একটি নক্ষত্রমণ্ডলীর আকারে আকাশে অবস্থান করছে। কোন তারার চেহারা দৈত্যের মত বিরাট, যেমন কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের বেটেলগুজে নামে তারাটি। এর মোট আয়তন হবে কয়েক লক্ষ সূর্যের সমান, অথচ এর ঘনত্ব এত কম যে পৃথিবীর গবেষণাগারে তৈরি সবচেয়ে নিখুঁত বায়ুশূন্য স্থানকেও হার মানায়। লুব্ধকের সঙ্গী তারাটির গঠন-প্রকৃতি আবার এত ঘন ও জমাট বাঁধা যে, এক দেশলাই বাক্সভর্তি নক্ষত্রবস্তুর ওজন দাঁড়াবে কয়েক টন। কিছু তারা আবার আমাদের সূর্যের চেয়েও কয়েক লক্ষ গুণ বেশি আলো এবং তাপ ছড়ায়। কারো দেহে মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি, কারো দেহে হিলিয়ামের। তবে একটি বিষয়ে তারাদের মধ্যে খানিকটা মিল দেখা যায়। সে তাদের ভার বা বস্তুর পরিমাণের বেলায়। বস্তুর মাপে সবচেয়ে ভারি তারার ওজন যেমন সূর্যের চেয়ে ত্রিশগুণের বেশি হবে না, তেমনি সবচেয়ে হালকাটির ওজন সাধারণত সূর্যের পাঁচ ভাগের একভাগের চেয়ে কম হতে দেখা যায় না।

৩

সূর্য

আমাদের ঘরের কাছের তারা হল সূর্য। এ-ই আমাদের অন্য তারাদের চিনতে শিখিয়েছে। প্রচণ্ড তাপে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে তারাগুলোর সর্বাঙ্গ। সূর্যের কেন্দ্রের তাপ ৩ থেকে ৪ কোটি ডিগ্রি ফারেনহিট। অন্য বহু তারার কেন্দ্রে এই তাপের পরিমাণ আরো বেশি। সূর্যে যেসব রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেমন ক্যালসিয়াম, লোহা, সোডিয়াম, নিকেল, ম্যাগনেসিয়াম, কোবাল্ট, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম প্রভৃতি—এরা সবাই রয়েছে জ্বলন্ত গ্যাসের রূপে।

কথা হল, সূর্যে এই পদার্থগুলো যে আদৌ গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে, সে কথা বিজ্ঞানীরা টের পেলেন কী করে? যে যন্ত্রটি এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেছিল, সে হল স্পেকট্রোস্কোপ। যন্ত্রটি তৈরি হয়েছে একটি প্রিজম ও একটি ছোট দূরবীনের সাহায্যে। প্রিজমের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সূর্যের আলোর বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। ফ্রাউনহোফের নামে জার্মানির এক বিজ্ঞানী বর্ণালী নিয়ে একটি পরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন। তিনি একটি ঘরকে অন্ধকার করে নিয়ে ছোট একটি ছিদ্রপথে একটুকরো আলোর রশ্মি প্রবেশ করালেন। রশ্মি-পথে বসালেন কাচের একটি প্রিজম। বর্ণালী তৈরি হল। দূরবীন চোখে লাগিয়ে ফ্রাউনহোফের বিস্মিত হলেন—সারা বর্ণালীটি জুড়ে বিরাজ করছে বহুশত কালো কালো রেখা। মাপ ও উজ্জ্বলতা কারো বেশি, কারো কম। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, বর্ণালীর মধ্যে এই কালো রেখাগুলো এল কোথা থেকে?

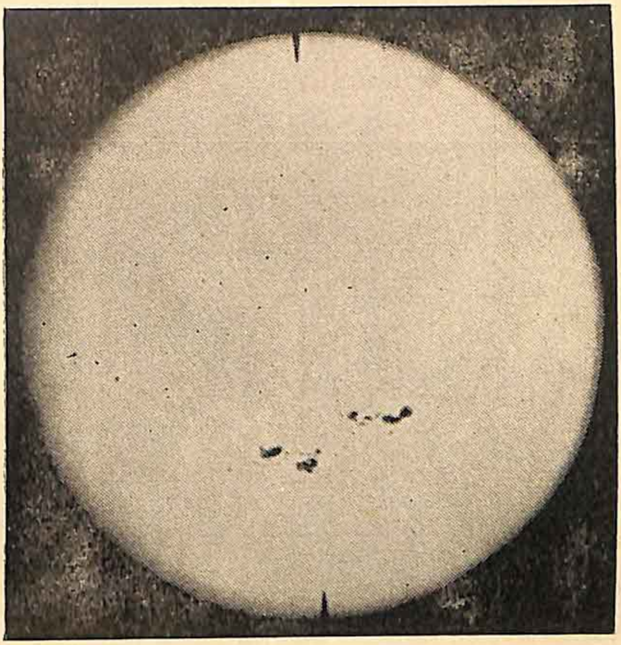
এ প্রশ্নের জবাব পাবার আগে একটু কথা আছে। একটি রাসায়নিক পদার্থে আগুন ধরিয়ে স্পেকট্রোসকোপের ভিতর

দিয়ে যখন তার আলো দেখা যায় তখন সূর্যের আলোর মতই তার একটি স্বাভাবিক বর্ণালী আমাদের চোখে পড়ে। মনে কর, একতাল লোহা আগুনে জ্বলছে। লোহার আলোর বর্ণালীকে সরাসরি না দেখে যদি বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা কোন গ্যাসভর্তি কাচের পাত্রের ভিতর দিয়ে স্পেকট্রোসকোপের সাহায্যে দেখি, তাহলে ঠিক আগের মতই বর্ণালীর সর্বাঙ্গ জুড়ে কালো কালো কতকগুলো রেখা ফুটে উঠবে। তফাতটা হল, সূর্যের বর্ণালীতে এই কালো রেখার সংখ্যা জ্বলন্ত লোহার বর্ণালীর চেয়ে অনেক বেশি।

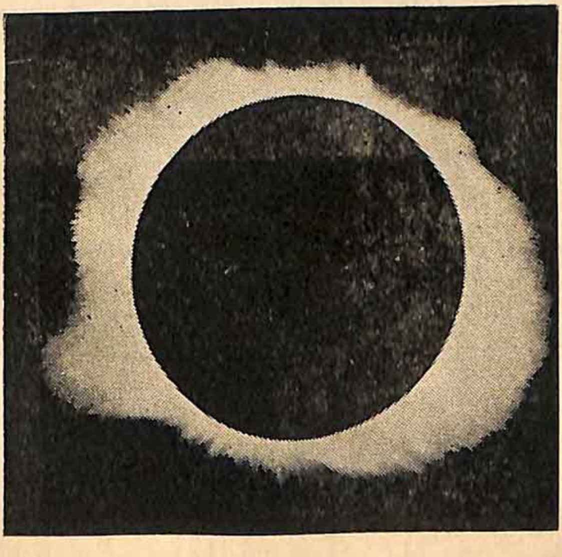
বিজ্ঞানীরা বলছেন কি জান, জ্বলন্ত লোহা ও স্পেকট্রোসকোপের মধ্যে ঐ যে খানিকটা ঠাণ্ডা গ্যাস ছিল, কালো রেখাগুলো তাদেরই কীর্তি। একটি গ্যাসের জায়গায় নতুন আর একটি গ্যাস ব্যবহার করে দেখা গেল, কালো রেখাগুলোর মাপ ও সংখ্যাও কম-বেশি হচ্ছে। এবারে যে বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষার কাজ চলছিল, তাদের আলাদা আলাদা ভাবে জ্বালানো হল এবং স্পেকট্রোসকোপে তাদের বর্ণালীর বিভিন্ন রঙের মাপগুলো বিজ্ঞানীরা নিলেন। আগের পরীক্ষার সময় গ্যাসগুলো যে কালো রেখা সৃষ্টি করছিল, তাদের মাপের সঙ্গে এই মাপ তাঁরা মিলিয়ে দেখলেন। দেখা গেল, দু'টি মাপ হুবহু এক।

তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল একটু ভেবে দেখ। গ্যাসীয় অবস্থায় একটি পদার্থের কালো রেখার মাপ যদি জানা থাকে, তাহলে পদার্থটির কথা না জেনেও শুধু কালো রেখার মাপ পরীক্ষা করেই পদার্থটির নাম সঠিকভাবে বলে দেওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা হাতে পেলেন এক বিরাট হাতিয়ার, আর তাই নিয়ে তাঁরা ছুটলেন সূর্যের পেটের ভিতরকার রহস্যকে জয় করতে।

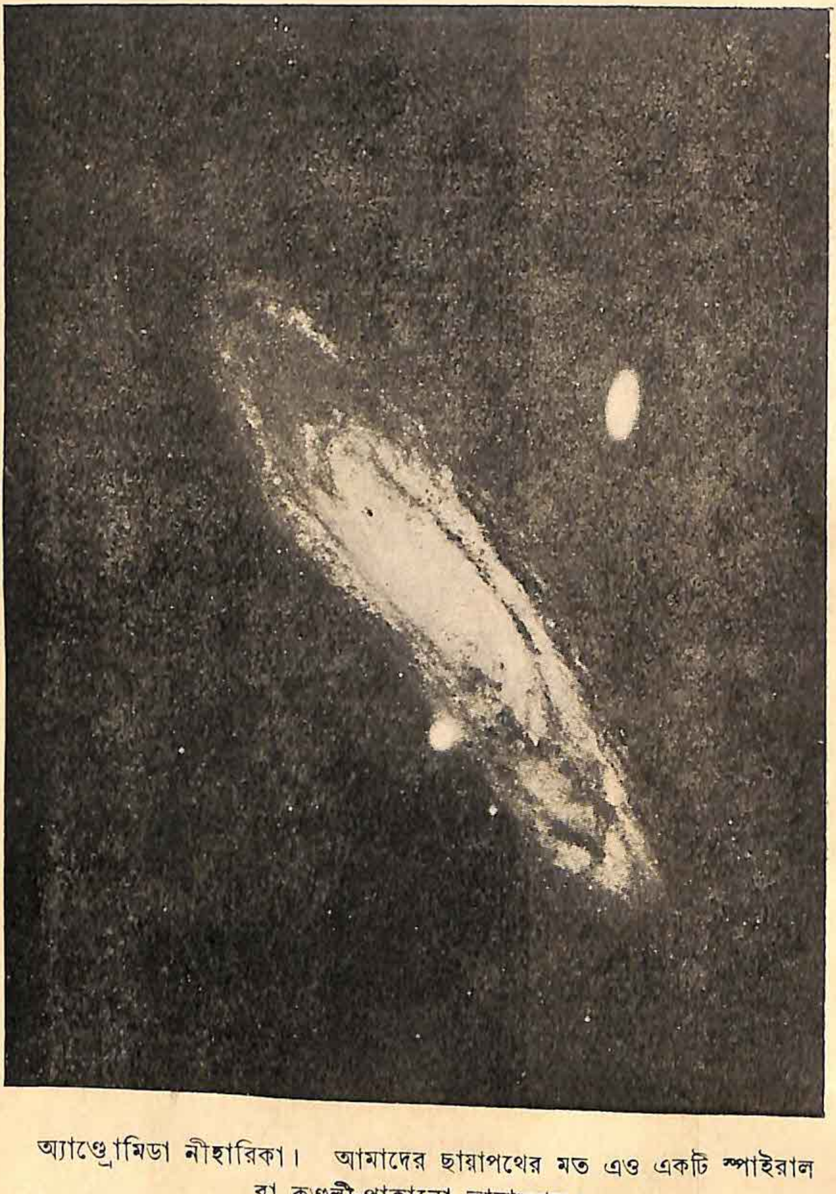
সূর্যের ফোটোস্ফিয়ার বা আলোকমণ্ডলে রয়েছে উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থের স্তর। আলোর যাত্রা শুরু হয়েছে সেখানে থেকে। সৌরমণ্ডলের হালকা গ্যাসের আবরণ পেরিয়ে সেই আলো এসে



সূর্যের আলোকমণ্ডল ও সৌরকলঙ্ক



পূর্ণ সূর্যগ্রহণ ও সূর্যের করোনা



অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকা। আমাদের ছায়াপথের মত এও একটি স্পাইরাল বা কুণ্ডলী-পাকানো তারাজগত।

পৌঁছোল পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন, সূর্যের আলোকমণ্ডল এবং পৃথিবীর মাঝখানে সৌরমণ্ডলের ঐ গ্যাসীয় আবরণটুকুর জন্যেই সূর্যের বর্ণালী জুড়ে কালো রেখাগুলোর রাজত্ব। সৌরমণ্ডল সূর্যেরই অংশ, সেখানে গ্যাসের আকারে যেসব পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, সূর্যের আলোকমণ্ডলেও তাদের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে। ব্যাপারটি আসলে তাই-ই। সূর্যের আলোর বর্ণালীতে কালো রেখাগুলোর মাপ পরীক্ষা করে সূর্যের বুকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৬৬টির মত মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে ঐ কালো রেখাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ফ্রাউনহোফের লাইন। অন্য নক্ষত্রলোকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিজ্ঞানীরা সেখানেও বহু মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে বস্তুর বিচারে একটি অভিন্নতার সূত্র যেন আমরা খুঁজে পাচ্ছি।

তারার দেহের চাপ ও তাপের সঙ্গে সম্পর্ক মিলিয়ে সেখানে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণের হিসেব পাওয়া গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে তাপ-আয়নন তত্ত্বের সাহায্যে। এর স্রষ্টা হলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ যে দশটি আবিষ্কারের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি, সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্ব তার মধ্যে একটি।

লাল আলোর বর্ণচ্যুতি

তারাজগতের ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য ঘটনা বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করেছেন। সমস্ত তারাজগত আমাদের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। আমাদের তারাজগতও কিন্তু স্থির হয়ে বসে নেই। পৃথিবী থেকে তিন-কোটি আলো-বছর দূরে ভার্গো তারাজগত দূরে সরে যাচ্ছে সেকেণ্ডে ৭৫০ মাইল বেগে। ২৬ কোটি আলো-বছর দূরে সিগনাস তারাজগতের ক্ষেত্রে এই গতিবেগ সেকেণ্ডে ১০,৫০০ মাইল। আর

৬৪০ কোটি আলো-বছর দূরে হাইড্রা তারাজগতের প্রসারণের গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩৮,০০০মাইল। ১৯৬০ সালে এমন একটি তারা-জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, যে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেকেণ্ডে ৯০,০০০ মাইল বা আলোর অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে। আমাদের পৃথিবী থেকে এই তারাজগতের দূরত্ব ৬০০ কোটি আলো-বছর। হিসেব করে বলা যায়, যে তারাজগত আলোর সমান গতিবেগে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তার আলোর নাগাল আমরা কোনদিনই পাব না। সেগুলো চিরকালের জন্যে আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে গেল।

তারাজগতের এই ক্রমপ্রসারণের ব্যাপার প্রথম জানা গেল তারার আলোর বর্ণালী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। বহুদূরের তারাজগতের বর্ণালীতে দেখা গেল লাল আলোর প্রান্তে বর্ণচ্যুতি ঘটছে। বর্ণালীর ডানদিকে হল লাল আলোর জায়গা। সেখানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম জাতীয় মৌলিক পদার্থের ফ্রাউনহোফের রেখা। তারাদের আলোর বর্ণালীতে দেখা গেল ঐ দুটি পদার্থের রেখাগুলো যেন আরো ডানদিকে সরে যেতে চাইছে। এই সরে যাওয়াকেই আমরা বলছি লাল আলোর বর্ণচ্যুতি। যে তারাজগতের দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে যত বেশি হবে, তার এই দূরে সরে যাবার গতিবেগ ও লাল আলোর বর্ণচ্যুতিও সেই অনুপাতে বেড়ে চলবে।

ডপলার এফেক্ট

মনে কর, তুমি একটি রেল স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে আছ। একটি গাড়ি তার বাঁশি বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে ছুটে আসছে। গাড়িটি যত তোমার দিকে এগিয়ে আসবে, বাঁশির শব্দ তত জোরে এসে তোমার কানের পর্দায় ধাক্কা মারবে। বাঁশির শব্দের ঢেউয়ের কম্পনসংখ্যা (এক সেকেণ্ডে শব্দের যতগুলো ঢেউ তৈরি

হচ্ছে, তাই হল তার কম্পনসংখ্যা) বেড়ে উঠছে বলেই শব্দ জোরে শোনাবে তোমার কাছে। আবার গাড়িটি যখন প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে থাকবে, তার শব্দের কম্পন-সংখ্যাও কমে আসবে ; সেই অনুপাতে শব্দের জোরটাও কমবে। অতএব কোন ধাবমান বস্তুর কাছে আসা বা দূরে চলে যাওয়ার সঙ্গে শব্দের কম্পনসংখ্যা বাড়া কমারও একটি যোগাযোগ রয়েছে। একেই বলা হয় ডপলার এফেক্ট।

আলোর সাতটা রঙের মধ্যে লাল রঙের কম্পনসংখ্যাই (প্রতি সেকেণ্ডে) সবচেয়ে কম। তাই তারার দল ছুটে পালাবার সময় ঐ রঙটার ওপরই যেন ঝক্কিটা পড়ে বেশি। আলোর অন্য রঙগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেচারা আর ছুটতে পারছে না, পথশ্রমে সে যেন ক্লান্ত। তাই তার কম্পনসংখ্যা যায় কমে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য ওঠে বেড়ে।

একটি গাড়ির বাঁশির শব্দের জোর কমে এলে আমরা বুঝতে পারি সে দূরে চলে যাচ্ছে এবং তার শব্দের কম্পনসংখ্যাও কমে আসছে। একটি তারার আলোর বর্ণালীর লাল রঙের কম্পনসংখ্যা কমতে দেখলেও (বা তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়তে দেখলেও) আমাদের বুঝতে হবে, ঐ তারাটি ক্রমে দূর থেকে আরো দূরে সরে যাচ্ছে। তারা ও তারাজগতের গতির সঙ্কেতটুকু ধরা পড়ছে বর্ণালীর লাল আলোর বর্ণচ্যুতিতে। ঐ বর্ণচ্যুতির মাপ কষে বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন, কোন্ তারাজগত কতটা গতিবেগে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

যদি ঐ বর্ণচ্যুতি কেবলই ঘটতে থাকত তারার আলোর বর্ণালীর বেগুনি রঙের প্রান্তে, তাহলে আমাদের দুশ্চিন্তার আর অন্ত থাকত না। বুঝতে হত, সব তারাজগত যেন ষড়যন্ত্র করে একসঙ্গে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আলোর বেগুনি রঙের কম্পনসংখ্যা অন্য রঙগুলোর তুলনায় বেশি। তাই বর্ণালীর বেগুনি রঙের

প্রান্তে চ্যুতি ঘটলে আমরা বুঝতুম তার কম্পনসংখ্যা বেড়ে উঠছে। গাড়ির বাঁশির জোর বা শব্দের কম্পনসংখ্যা বাড়ার মত সেও প্রমাণ করে দিত, গাড়ির মত তার গতিটাও আমাদেরই দিকে।

তারাজগতগুলোর একে অপরের কাছ থেকে দূরে ছুটে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র মহাবিশ্বটাই প্রসারিত হয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে অন্য তারাজগতের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়ছে। এই বইটির একটি পৃষ্ঠা পড়তে তোমাদের যত সময় লাগছে, তার মধ্যেই বহু তারাজগত আমাদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ মাইল পথ দূরে সরে গেল। একদিন হয়ত এই তারাজগতগুলোর সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের আলোক ও রেডিও দূরবীনের সব নাগালের বাইরে কোন্ সে জগতে তারা গিয়ে পৌঁছোবে, তার ঠিকানা কারো জানা নেই!

একটি প্রহেলিকা

রাতের আকাশের রঙ কালো কেন? আকাশে কত তারাজগত, কত অসংখ্য কোটি তারা তাদের আলো ছড়িয়ে চলেছে। ওল্‌বার নামে এক বিজ্ঞানী হিসেব করতে গিয়ে দেখলেন, এইসব তারাজগতের আলোয় আমাদের রাতের আকাশ পঞ্চাশ হাজার সূর্যের মত দীপ্তিমান হবার কথা। মহাবিশ্বকে ওল্‌বার স্থিতিধর্মী বলে বিবেচনা করেছিলেন। তাই ঘটনাটি তাঁর কাছে প্রহেলিকাই থেকে যায়। মহাবিশ্বকে যদি প্রসারণশীল বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু ঘটনাটি বুঝতে আর অসুবিধে হয় না। তারাজগতগুলো ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়ার জন্যে তাদের আলোর তীব্রতা কমে আসে, আলোর বন্যায় আকাশ অঙ্গন ভেসে ওঠবার সম্ভাবনা আর থাকে না। রাতের আকাশের কালো রঙ তাই প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণাকেই সুদৃঢ় করে তোলে।

প্রত্যেকটি তারা ছোট বড় এক-একটি সূর্য—দাউ-দাউ করে অনবরত জ্বলছে। তারাদের এই প্রচণ্ড দীপ্তির মূলে যে রহস্য লুকিয়ে আছে, সেটা বুঝতে হলে তারাদের জন্ম কিভাবে হল, সে কথা জানতে হয়।

এই মহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু আছে, তা সে নক্ষত্রদেহই হোক, দুটি নক্ষত্র বা দুটি তারাজগতের মধ্যবর্তী অঞ্চলই হোক—তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে মৌলিক পদার্থটির সন্ধান আমরা পাব সে হল হাইড্রোজেন। সাধারণ নক্ষত্রদেহে হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা প্রায় আশি ভাগ। পরিমাণে বেশি দ্বিতীয় মৌলিক পদার্থটি হল হিলিয়াম।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, আজ থেকে বহু কোটি বছর আগে হাইড্রোজেনের ধুলোকণা ও অন্যান্য গ্যাসীয় কণায় তৈরি বিরাট বড় বড় মেঘ মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, যেমন এখনও রয়েছে। আমাদের ছায়াপথের মোট বস্তুর অর্ধেকটাই খুঁজে পাওয়া যায় এই সমস্ত মেঘের মধ্যে। সেই মহাপ্রাচীন ধুলো ও গ্যাসে তৈরি মেঘের গড়পড়তা ব্যাস ছিল ৩০ আলো-বছর এবং প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে ছিল দশটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু। ছড়ানো ধুলো ও গ্যাসীয় কণাগুলো কিভাবে জড় হতে শুরু করেছিল, সেটা বিজ্ঞানীরা আজ শুধু অনুমান করতে পারেন। কেউ মনে করেন, আলোর চাপে দুটি একটি করে ধুলো ও গ্যাসীয় কণা একঠাঁই হতে শুরু করেছিল। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, যখন কোন তারাই গড়ে ওঠে নি, তখন আলোর চাপ সৃষ্টির জন্যে প্রথম আলো ছড়িয়েছিল কে? সে প্রশ্নের জবাব আজও মেলে নি। সে যাই হোক, এমন একটি ঘটনা সেদিন ঘটে থাকবে যার জন্যে

ঐ কাজটি শুরু হয়েছিল। ধুলো ও গ্যাসীয় কণাগুলো জড় হতে হতে যখন খানিকটা বড় হল, তখন মাধ্যাকর্ষণ-বল এসে আসন জুড়ে বসল। তার পর থেকে গড়ে ওঠার পালাটা আরো দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চলল।

এভাবে জড় হতে হতে সূর্যের মত আকারের একটি বস্তুপিণ্ডের মধ্যে যখন আমাদের পৃথিবীর ৩,৪০,০০০ গুণ বস্তুর সমাবেশ ঘটেছিল, তখন মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র বস্তু বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে প্রচণ্ড দীপ্তিশীল একটি নক্ষত্রের ভূমিকা নিয়ে বসে। এই জাতীয় একটি ঘটনা ঘটাবার জন্যে ঐ নক্ষত্রবস্তুর কেন্দ্রের তাপ প্রায় তিন কোটি ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় পৌঁছনো দরকার। এই তাপশক্তির রহস্য প্রথম উদ্‌ঘাটিত করেন জার্মান বিজ্ঞানী বেথে ১৯৩৯ সালে। বেথের মতে পারমাণবিক প্রক্রিয়াই এই তাপশক্তির মূল কারণ। নক্ষত্রবস্তুর কেন্দ্রে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে। এ রূপান্তরের সময় শতকরা ·৭ ভাগ ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ভরকে যে শক্তিতে রূপ দেওয়া যায় একথা সর্বপ্রথম মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের মাধ্যমে বলেছিলেন। তাঁর সূত্র অনুযায়ী এক কিলোগ্রাম ভরকে শক্তিতে রূপ দিলে যে শক্তি মিলবে তা দিয়ে এক হাজার ওয়াট শক্তিসম্পন্ন আড়াই হাজার কোটি বাতিকে অনায়াসে এক ঘণ্টা ধরে জ্বালিয়ে রাখা যাবে।

আইনস্টাইনের সূত্র ধরে সূর্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি ঘটছে দেখা যাক। সেখানে প্রতি সেকেণ্ডে ৫,৬৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন ৫,৬০০ লক্ষ টন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, সূর্যের দেহ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লক্ষ টনের মত হাইড্রোজেন বস্তু শক্তি বা বিকিরণের আকারে খোয়া যাচ্ছে। আর তার ফলেই না সূর্যের আলো ও তাপের এত জৌলুস! সূর্যের মত অন্য সব নক্ষত্র-দেহেও নাকি এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে।

নক্ষত্রের বিবর্তন

আমরা দেখতে পেলাম, নক্ষত্রবস্তুর পরিমাণ একটি বিশেষ অঙ্কের কোঠায় পৌঁছলে কিভাবে সমগ্র নক্ষত্রদেহ একটি পারমাণবিক চুল্লির রূপ ধারণ করে বসে। দুটি শক্তির খেলা এবারে শুরু হবে নক্ষত্রের বুকে। বস্তুভার বিপুল অঙ্কের কোঠায় পেঁ ৗছোনোর ফলে মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব গিয়েছে বেড়ে। এই বল নক্ষত্রের কেন্দ্র থেকে যেন হাত বাড়িয়ে বাইরের সব বস্তুকে টেনে নামাতে চাইছে তার কেন্দ্রের জায়গাটুকুর মধ্যে। কিন্তু এই সর্বনাশকে প্রতিহত করবার জন্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে আর-একটি উল্টোমুখী চাপ, যা নক্ষত্রটির কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ঠেলা মারছে। এই চাপের স্রষ্টা হল শক্তি, যার জন্ম হয়েছিল নক্ষত্রের কেন্দ্রে ভরের রূপান্তরের ফলে।

এ যেন শুরু হল এক বিরাট দড়ি-টানাটানির লড়াই। দুদিক থেকে যে দুটি দল টানছে গায়ের জোরে যদি তারা সমান হয়, তবেই মঙ্গল। দুদিক থেকে যুঝতে থাকা দুটো চাপের সাম্য ঘটছে যে নক্ষত্রের দেহে, তাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে 'মেন সিকোয়েন্স' নক্ষত্র। নক্ষত্রজীবনের এটাই প্রথম পর্ব। আমাদের সূর্য রয়েছে এই প্রথম পর্বেই। সূর্যের মূল উপাদান হাইড্রোজেন। এই জ্বালানিটি যে পরিমাণে সূর্যদেহে রয়েছে, তাতে সূর্যদেহ থেকে নির্দিষ্ট হারে তাপ ও আলোর বিকিরণ ঘটবে আরো এক হাজার কোটি বছর ধরে।

লোহিত দানব

নক্ষত্রজীবনের দ্বিতীয় পর্ব থেকে অশান্তির পালা শুরু হল। এক হাজার কোটি বছর পরের সূর্যের অবস্থাটা আমরা কল্পনা করবার চেষ্টা

করছি। সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন পুড়ে হিলিয়ামরূপী ছাইয়ের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে; বাড়তে বাড়তে সূর্যের মোট ভরের শতকরা দশভাগের কাছাকাছি যেই এসে পৌঁছোবে, অমনি শুরু হবে তার ভিতরে এক অস্থিরতার ভাব। নক্ষত্রকেন্দ্রটা হঠাৎ যেন কুঁচকে যেতে চাইবে, ফলে মাধ্যাকর্ষণ বল তাপশক্তিতে রূপ পেয়ে বসবে। কেন্দ্রের তাপে নক্ষত্রের বাইরের গ্যাসীয় আবরণটা তপ্ত হয়ে প্রসারিত হলেই তার ভিতরকার তাপশক্তি কমে আসে। নক্ষত্রের বাইরের আবরণের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনা ঘটবে। প্রসারণের ফলে ঐ অঞ্চল শীতল হয়ে ছড়াবে লাল আলো, বর্ণালীর অন্য রঙগুলোর তুলনায় চাপের অঙ্কটা যার কম। নক্ষত্রের এ অবস্থার নামকরণ করা হল লোহিত দানব বা 'রেড জায়াণ্ট'।

আমাদের সূর্যকেও একদিন এ অবস্থায় এসে পৌঁছতে হবে। তখন তার ক্রমাগত বাড়তে থাকা শরীরটা একে একে গ্রাস করবে সৌরজগতের কাছের চারটি গ্রহ—বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলকে। তাপের প্রচণ্ড দাহনে ঐ গ্রহগুলোর শেষবিন্দু জল বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবে আকাশে। সর্বাঙ্গ ঝলসে গিয়ে তাদের চেহারা হবে বীভৎস। আকাশে অ্যাণ্টেরেস ও বেতেলগুজে হল এ-জাতীয় দুটি নক্ষত্র।

সুপারনোভা

মেন সিকোয়েন্স অবস্থা থেকে একটি তারার জীবনে অশান্তি আরো বেড়ে উঠতে থাকে। চেহারার মাপে যে সব তারা বিরাট বড়, তাদের অবস্থাটাই হয় সবচেয়ে শোচনীয়। কারণ তাদের ভিতরকার পারমাণবিক চুল্লির জোরটা অনেক বেশি। তাই তারা নিজেদের দেহের ভরকে খুব তাড়াতাড়ি শক্তির আকারে খুইয়ে চলে। সূর্যের চেয়ে দশগুণ বেশি বস্তু আছে যে তারার দেহে, সে তার হাইড্রোজেনরূপী জ্বালানিকে হাজার গুণ তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করে বসবে। তার আয়ু

হবে বড়জোর এককোটি বছর, কিন্তু সূর্যের মাপের একটি তারা এক হাজার কোটি থেকে দশ হাজার কোটি বছর দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সূর্যের চেহারার মাপটাই হল একটি তারার সুস্থ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। চেহারাটি বেশি মোটা হবার দিকে এগুলেই বিপদ।

একটি তারার মৃত্যু বলতে আমরা কী বুঝব? সূর্যের চেয়ে আকারে পনের কি কুড়িগুণ বড় একটি তারার কথা চিন্তা কর। সে তার হাইড্রোজেনের শতকরা সাত থেকে দশভাগ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে বসে আছে। তার কেন্দ্রে হিলিয়ামরূপী ছাইয়ের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল প্রায় দেড়খানা সূর্যের সমান। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ চন্দ্রশেখর একটি অঙ্কের সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন, ওই মাপের চেয়ে বেশি হিলিয়াম একটি তারার কেন্দ্রে জড় হতে পারে না। ওই মাত্রার কাছে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র তারাটির দেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তার বাইরের অংশটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

তারার এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'সুপারনোভা'। এ অবস্থায় একটি তারার দীপ্তি অল্প সময়ের জন্যে সূর্যের তুলনায় কুড়ি কোটি গুণ বেড়ে উঠতে পারে। ছায়াপথের বুল্ বা বৃষ নক্ষত্রপুঞ্জে ক্র্যাব্ বা কাঁকড়ার মত চেহারার যে নীহারিকাটি রয়েছে, তা হল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ভেঙে যাওয়ার পর একটি তারার ধ্বংসাবশেষটুকু। ১০৫৪ সালের পৃথিবীর মানুষ ঘটনাটি ঘটতে দেখেছিল। ঐ সুপারনোভা পুরো তিন সপ্তাহ জুড়ে আকাশের আর সব তারাকে উজ্জ্বলতায় ম্লান করে দেয়। এমনকি দিনের বেলা সূর্যের আলোর ছটাতেও সে ঢাকা পড়ে নি।

আমাদের ছায়াপথের মধ্যে প্রতি বছর কুড়ি থেকে ত্রিশটির মত সুপারনোভা জাতীয় ঘটনা ঘটে চলেছে। সূর্যের চেয়ে বস্তুভারে অনেকগুণ বড় তারার সংখ্যা খুব বেশি নেই। তাই সুপারনোভা

তৈরির ব্যাপারটা সংখ্যায় কম। অন্যান্য তারাজগতেও এ জাতীয় ঘটনা নিয়মিতভাবে ঘটে থাকে। তবে বিরাট দূরত্বের জন্যে অতিসূক্ষ্ম সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া তাদের আমরা দেখতে পাই না।

আমাদের সূর্য কোনদিনই সুপারনোভা হয়ে উঠবে না। লোহিত দানব রূপ থেকে সে যে অবস্থায় এসে পৌঁছবে, সুপারনোভা পর্ব থেকে একটি তারার যাত্রাও হয় সেই একই দিকে।

শ্বেত বামন

লোহিত দানব রূপে একটি তারার বাইরের আবরণটা প্রসারিত হতে থাকে, সে কথা আগেই বলেছি। এই প্রসারণের শক্তি সরবরাহ করে তারার কেন্দ্র, আর সে কাজটা করবার জন্যে ঐ কেন্দ্রের তাপ ও গ্যাসীয় বস্তুর ঘনত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলতে থাকে।

শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে তারার কেন্দ্রে হাইড্রোজেন জ্বালানি একদিন নিঃশেষ হয়ে আসে। তখন সবটুকু হাইড্রোজেন হিলিয়াম ও অন্যান্য বস্তুর গ্যাসীয় রূপে রূপ পালটে বসে আছে। পারমাণবিক চুল্লির খোরাক আর নেই। তারার জীবনের শেষ পর্বে আমরা পৌঁছে গেছি। নক্ষত্রকুলুজিতে এ অবস্থার নাম হল 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' বা শ্বেত বামন।

লুব্ধক তারাটির একটি সঙ্গী আছে, কিন্তু উজ্জ্বলতায় সে লুব্ধকের চেয়ে অনেক কম বলে বেশ বড় এবং ভাল জাতের দূরবীন ছাড়া তাকে আদৌ দেখাই যায় না। সাধারণ একটি তারার মত দেখতে হলেও লুব্ধকের এই সঙ্গী তারাটি জ্যোতির্বিদদের কাছে বহুদিন এক পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ছিল। তারাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সিরিয়াস বি'। উজ্জ্বলতার মাপে এ তারাটি আমাদের সূর্যের দুশো ভাগের একভাগ মাত্র হবে, কিন্তু এর পৃষ্ঠভাগের তাপ হল ১৪,০০০° ফারেনহিট। সূর্যের বেলা এ তাপ হল ১১,০০০° ফারেনহিট। এ তারাটির ব্যাস মাত্র ২৪,০০০ মাইল; সূর্যের ব্যাস যেখানে হল গিয়ে ৮,৬৪,০০০ মাইল। তারাটির ভর কিন্তু সূর্যের ভরের

সমান। তার মানে, তারাটির ছোট দেহের মধ্যে এক বিপুল পরিমাণ বস্তু জড় হয়ে আছে, যার ঘনত্ব হল জলের ঘনত্বের চেয়ে প্রায় ৫৫,০০০ গুণ বেশি। 'সিরিয়াস বি' তারাটিতে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণটা এত বেশি যে পৃথিবীতে একটি মানুষের ওজন যদি হয় ১৫০ পাউণ্ড, ওই তারার দেহে সে ওজন দাঁড়াবে ২,৬২৫ টন। নিজের দেহের বিপুল ওজনের চাপে মানুষটি থেঁতলে কাগজের মত পাতলা হয়ে পড়বে। এক ম্যাচবাক্সভর্তি ঐ তারার বস্তুকে তুলতে বারোটির মত পালোয়ান দরকার হবে, কারণ ঐ বাক্সর ওজন দাঁড়াবে এক টন।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু বলেন, এত বিপুল ঘনত্ব সত্ত্বেও 'সিরিয়াস বি'র কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত সবটাই গ্যাসীয় বস্তু। তোমরা প্রশ্ন করতে পার, একটি বস্তু গ্যাসরূপেও এত ঘন হয় কী করে? সেটা বুঝতে হলে, পরমাণুর অন্দরমহলের দিকে একটু নজর দিতে হবে। পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রনদের চারপাশে ইলেকট্রনরা ঘুরপাক খাচ্ছে। পরমাণুর প্রায় সব জায়গাটাই ফাঁকা। পরমাণুগুলো একে অপরের খুব কাছে আসতে পারে না, চারপাশে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রনেরা যেন একটা সীমানা নির্দিষ্ট করে রেখেছে।

কিন্তু 'সিরিয়াস বি'র মত একটি শ্বেত বামন নক্ষত্রে বস্তুর ঘনত্ব এতই বেশি যে সেখানে পরমাণুগুলোর চেহারা হবে অদ্ভুত ধরনের। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনরা আর পরমাণু কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরবে না, বরং একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে অনেক ছোট জায়গার মধ্যে নিজেদের ঠাঁই করে নেবে। আমাদের শরীরের পরমাণুগুলোর ফাঁকা জায়গাকে যদি বাদ দেওয়া যেত, তাহলে দেহের সবটুকু বস্তুকে বোতামের মত ছোট্ট একটি পাত্রে পুরে ফেলতে একটুও অসুবিধে হত না। পদার্থের এই অবস্থাকে বলে তার মৃত বা বিকৃত রূপ, এরপর সহস্র চাপ প্রয়োগ করেও যাকে আর ঘনীভূত করা যায় না।

আমাদের সূর্য একদিন তার লোহিত দানব রূপ থেকে রূপান্তরিত হবে শ্বেত বামনে। সুপারনোভা রূপ থেকেও কালক্রমে একটি তারা একই পর্বে এসে পৌঁছবে। নক্ষত্রজীবনে মৃত্যুর চরম ডঙ্কা ঘোষিত হয়েছে। শ্বেত বামনের দেহের তাপও একদিন নিঃশেষ হয়ে আসবে—নতুন করে তাপ সৃষ্টির কোন উপাদান তখন আর তার নেই। ধীরে ধীরে তার গোত্রান্তর ঘটবে কালো বামন রূপে। আকাশের পট থেকে নক্ষত্রের দীপশিখার শেষ চিহ্নটুকু সেদিন বিলীন হয়ে যাবে। কালো একটা বস্তুপিণ্ডরূপে নক্ষত্রের মৃতদেহটা তখন আকাশের কোন এক প্রান্তে পড়ে থাকবে। পৃথিবীর চাঁদের মত ছোট্ট একটি তাপহীন বস্তুতে রূপান্তরিত হবে সেদিন সূর্যের বিপুল দেহটা।

তারার সৃষ্টিচক্র

একদল তারা এমনিভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সব তারার কপালেই একই লিখন রয়েছে লেখা। তাই যদি হয় তবে একদিন আকাশে কি আর তারা থাকবে না? জ্যোতির্বিদরা একটি ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করছিলেন অনেক দিন ধরেই। আমাদের ছায়াপথের মত যেসব তারাজগতের চেহারাটা স্পাইরাল বা কুণ্ডলী পাকানো, তাদের কেন্দ্রের কাছের তারাগুলোর আয়ু অনেক কম। লাহিত দানব রূপ থেকে এদের অনেকেই সুপারনোভা হয়ে দাঁড়ায়। তখন যেসব গ্যাসীয় বস্তুকে তারা চারদিকে ছিটিয়ে দেয়, সেগুলো এক জায়গায় জড় হয়ে নতুন আর একটি তারার দেহ তৈরির কাজ শুরু হয়। আমাদের সূর্য হল এই দ্বিতীয় জাতের তারা। এই জাতীয় তারার দেহেই আমরা বিভিন্ন ধাতুর সন্ধান পাই। পারমাণবিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থায় এসব ধাতু গড়ে ওঠে। আকাশের তারাহীন কালো জায়গাগুলোয় জড় হয়ে আছে যে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ বা নীহারিকার দল, তাদের মধ্যেও চলেছে নক্ষত্রসৃষ্টির পালা।

প্রাচীন তারার দল সৃষ্টি করল নতুন তারা। নক্ষত্রদেহ তৈরির উপাদান নীহারিকারা এখনো নিঃশেষ হয়ে যায় নি আমাদের ছায়াপথ ও একই জাতের তারাজগতগুলো থেকে। ইলিপ্‌টিক্যাল বা উপ-বৃত্তের মত চেহারার আর একদল তারাজগতের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাদের ধুলো ও গ্যাসের সঞ্চয়কে খুইয়ে বসে আছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, ছুটি উপবৃত্তাকার তারা-জগত মধ্যে মধ্যে একে অপরের সঙ্গে সজ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে এক বিচিত্র সজ্ঘর্ষ। একটি তারাজগত তার নক্ষত্রের সম্ভার নিয়ে আর একটির মধ্য দিয়ে ছুটে চলে যায়। নক্ষত্রগুলোর মধ্যে বিপুল দূরত্বের জন্যে পরস্পরের মধ্যে কোন ঠোকাঠুকি ঘটে না। কিন্তু তারাজগতছুটো পরস্পরের ধুলো ও গ্যাসের মেঘগুলোকে ঝাঁটা বোলানোর মত পরিষ্কার করে দিয়ে যেতে ভোলে না। উপবৃত্তাকার তারাজগতে তাই নক্ষত্র সৃষ্টির কোন বালাই নেই।

স্পাইরাল তারাজগতগুলোর শুঁড়ের মত বাহুগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানীরা এখনো নক্ষত্রদেহ তৈরি হতে দেখছেন। নক্ষত্র এবং তারাজগতের মধ্যবর্তী মহাকাশ অঞ্চলে বস্তুর ঘনত্ব সম্বন্ধেও নতুন তথ্য আজ জানা যাচ্ছে। এ অঞ্চলের প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে হয়ত দশটির মত হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে। ঘনত্বের পরিমাণটা কতখানি কম, একটি উদাহরণ দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে। পৃথিবীর মাপের মহাকাশের একটি অঞ্চলের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু ও গ্যাসীয় কণা রয়েছে তার সবটুকুই ছোট্ট একটি স্যুটকেসের মধ্যে পুরে ফেলা যায় অনায়াসে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাকাশের বিরাট এবং বিপুল রাজ্যে যে পরিমাণ বস্তু রয়েছে তার মোট পরিমাণ মহাবিশ্বের তারাজগতের নক্ষত্রের ভিতরকার মোট বস্তুর সমান। বিজ্ঞানীরা এখানেও সৃষ্টির উপাদানের এক বিপুল ভাণ্ডারের সন্ধান পাচ্ছেন।

৪

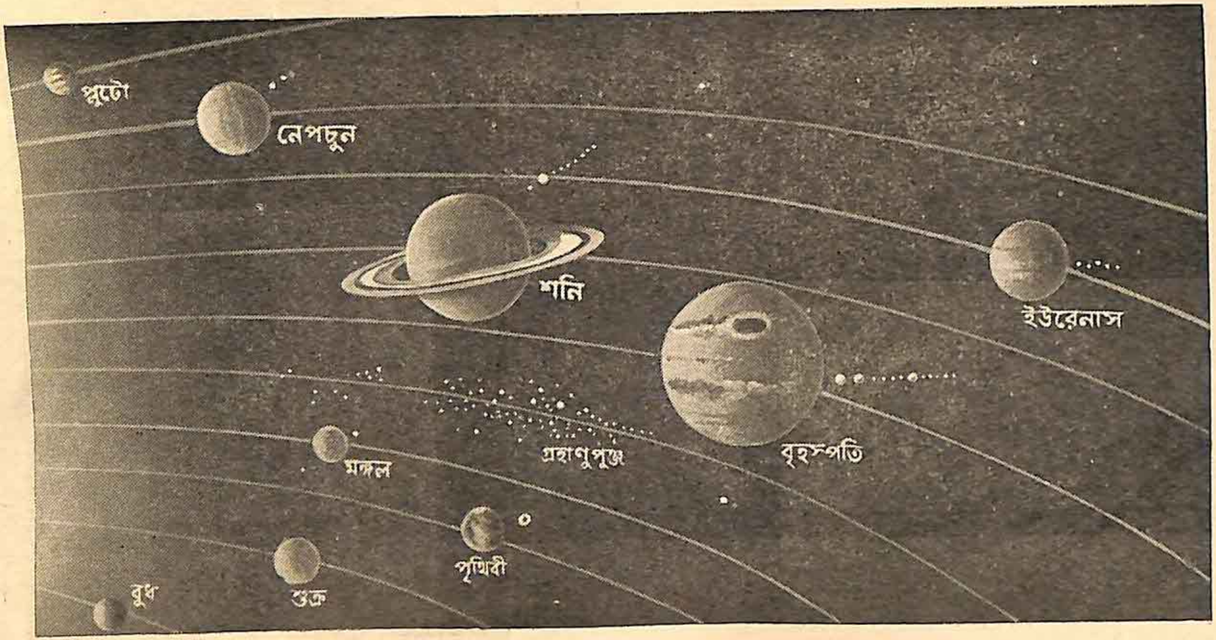
সৌরজগত

তারাজগতের পরিক্রমা শেষ করে এবারে আমরা ফিরে আসব আমাদের ঘরের কাছে। আমাদের ঘর বলতে বোঝাচ্ছি পৃথিবীকে, আর তার চারপাশের জায়গা হল সৌরজগত। সৌরজগতের কেন্দ্রমণি হল সূর্য—একটি জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক। আমরা বলি পিতা সূর্য, কারণ সূর্যের আলো ও তাপের প্রবাহ ছাড়া এই পৃথিবীতে কোন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের উদ্ভব সম্ভব হত না। তাই বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্যের উপাসনা সেখানকার ধর্মচিন্তায় একটি বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিল।

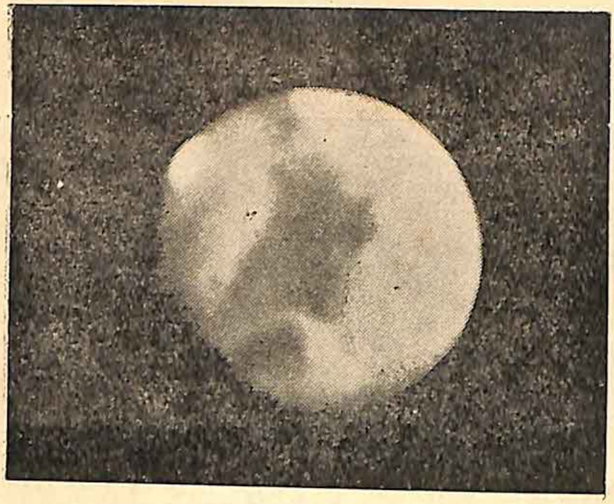
সূর্য

আমাদের ছায়াপথের দশ হাজার কোটি তারার একটি তারা এই সূর্য। আমাদের ঘরের এত কাছে থাকার জন্যে এর অনেক খবর আমরা জানতে পেরেছি। সূর্যের ব্যাস ৮,৬৪,০০০ মাইল। প্রায় ৩,৪০,০০০ পৃথিবীর ভরের সমান সূর্যের ভর। সূর্যের মোট আয়তনের মধ্যে স্বচ্ছন্দে তের লক্ষ পৃথিবীর জায়গা হতে পারে। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর ২৮ গুণ।

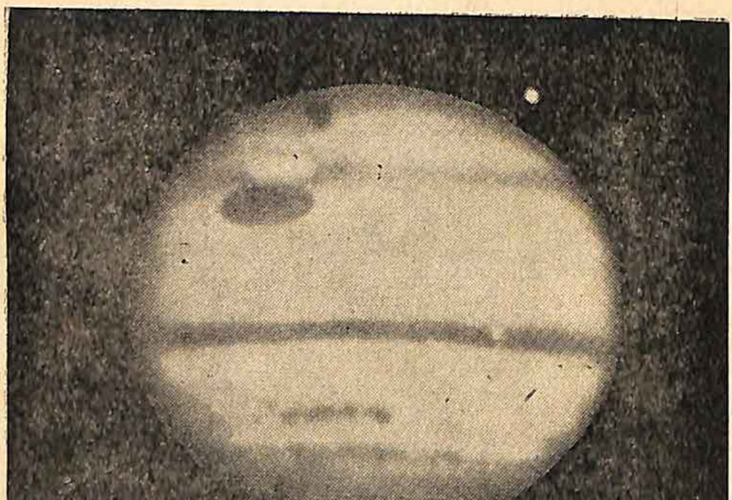
খালি চোখে নয়, একটি রঙিন কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকালে গোল বলের মত যে ক্ষেত্রটি আমাদের চোখে পড়ে, তার নাম ফোটোস্‌ফিয়ার বা আলোকমণ্ডল ; সূর্যের পৃষ্ঠভাগ বলা যায় একে। এই পৃষ্ঠভাগের তাপ মাত্র ১১,০০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। এর চেহারার মধ্যে একটি দানা দানা ভাব রয়েছে আর এর রূপ হল অশান্ত, নিয়ত চঞ্চল। জ্বলন্ত গ্যাসের শিখা আলোকমণ্ডলের ভিতর থেকে উঠে এসে উপর থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে।



সৌরজগত



মঙ্গল। গ্রহটির মেরু অঞ্চলের বরফের সাদা টুপী দেখা যাচ্ছে।



বৃহস্পতি। গ্রহের লাল চোখটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আলোকমণ্ডলের গ্যাসীয় চেহারাটা অস্বচ্ছ। সূর্যের মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন—পরিমাণে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ। শতকরা ১৫ ভাগ হিলিয়াম, বাদবাকি হল অন্যান্য উপাদান। আলোকমণ্ডলে গ্যাসীয় বস্তুর ঘনত্ব খুবই কম, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৬০ মাইল উপরের অঞ্চলের মত। কিন্তু যত নিচের দিকে নামা যাবে, তত গ্যাসীয় বস্তুর তাপ ও ঘনত্ব বাড়তে থাকবে। সূর্যের কেন্দ্রের ঘনত্ব জলের ৯০ গুণ, লোহার ১২ গুণ। সেখানে গ্যাসীয় বস্তুও ইস্পাতের মত শক্ত, কঠিন অবস্থায় রয়েছে। সূর্যের কেন্দ্রে তাপের পরিমাণ আড়াই কোটি ডিগ্রি ফারেনহিটের কাছাকাছি এবং চাপের মাত্রা পৃথিবীর জমির উপর বায়ুমণ্ডলের চাপের ১০০ কোটি গুণ বেশি।

এত প্রচণ্ড চাপে পদার্থ কিভাবে গ্যাসীয় রূপে রয়েছে, সে এক রহস্য। কোন পদার্থের গ্যাসীয় রূপে থাকা নির্ভর করে তার পরমাণুগুলোর গতিশক্তির উপর। সূর্যের কেন্দ্রে বিপুল তাপের ফলে বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে-থাকা ইলেকট্রনেরা ছিটকে বেরিয়ে আসে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেকোন পদার্থের একটি পরমাণু থাকে তড়িৎ-নিরপেক্ষ—তার কেন্দ্রের প্রোটনদের ধনাত্মক বা পজিটিভ বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরতে থাকা ইলেকট্রনদের ঋণাত্মক বা নেগেটিভ বিদ্যুৎশক্তির ঠিক সমান মাপের হয়। কিন্তু তাপ বা অন্য কোন শক্তির প্রভাবে ইলেকট্রন খোয়া গেলেই পরমাণুটির বিদ্যুৎশক্তি হয়ে দাঁড়ায় পজিটিভ। এমনি একটি পজিটিভ পরমাণুকে আমরা বলব পজিটিভ আয়ন। তেমনি একটি বাড়তি ইলেকট্রনকে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলে একটি পরমাণুর বিদ্যুৎশক্তি নেগেটিভও হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন আবার তাকে বলা যায় নেগেটিভ আয়ন। পদার্থের আয়নিত রূপকে বলা হচ্ছে পদার্থের চতুর্থ রূপ বা প্লাজ্‌মা অবস্থা। বিভিন্ন তারার কেন্দ্রে পদার্থ রয়েছে এই আয়নিত রূপেই।

১০০ কোটি হাইড্রোজেন বোমা একসঙ্গে ফাটালে অবস্থাটা যা দাঁড়ায়, সূর্যের কেন্দ্রের চেহারাটা হল ঠিক তাই। পারমাণবিক 'ফিউসন' বা লঘু কেন্দ্রকের সঙ্গম প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণুরা মিলে হিলিয়াম পরমাণুদের গড়ে তুলছে। এই রূপান্তরের সময় প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ লক্ষ টন হাইড্রোজেন শক্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। তোমরা ভাবতে পার, সূর্য বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু হিসেব কষে দেখেছেন, সূর্য তার জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত মোট হাইড্রোজেন জ্বালানির শতকরা একভাগ মাত্র খুইয়েছে। বাকি অংশ নিঃশেষ হতে এখনো পাঁচশো থেকে হাজার কোটি বছরের মামলা। কাজেই মা ভৈঃ।

সূর্যের কেন্দ্র থেকে শক্তির যাত্রা শুরু হয় গামা ও রঞ্জন রশ্মির আকারে। সেখানকার বিপুল চাপযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে সামান্য পথ এগুতেই তাদের বহু সময় চলে যায়। এক বিন্দু শক্তির সূর্যের কেন্দ্র থেকে আলোকমণ্ডলের উপরিতল পর্যন্ত পৌঁছতে হয়ত সময় লেগে যাবে দশ লক্ষ বছর। তারা যখন ওপরে এসে পৌঁছল তখন তাদের চেহারা একেবারেই পালটে গেছে। তখন গামা ও রঞ্জন রশ্মির রূপ দাঁড়িয়েছে বেগনি পারের আলো, লাল উজানি প্রভৃতি আলোতে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় আরো দুটি ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। একটি হল সৌরোচ্ছ্বাস (solar flare)। ক্রোমোস্‌ফিয়ার অঞ্চলে বিদ্যুতের ঝলকের মত এক একটি গ্যাসের উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হতে থাকে। এর ফলে প্রোটন কণিকার স্রোত পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। দ্বিতীয়টি হল, সৌরোৎক্ষেপ (solar prominences)—ফোটোস-ফিয়ার থেকে হাইড্রোজেন কণিকা ও গ্যাস বিরাট শিখার আকারে প্রায় লক্ষ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠে এসে যাদের সৃষ্টি করছে। কখনো এক সপ্তাহ, কখনো একমাসের মত সূর্যের আকাশে গোল আংটির মত কয়েক পাক ঘুরে আবার সূর্যেরই বুকে ফিরে যায় এরা। পূর্ণ সূর্য-

গ্রহণের সময় আরো দুটি ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। একটি হল সৌরোচ্ছ্বাস (Solar flare)। ক্রোমোস্ফিয়ার অঞ্চলে বিদ্যুতের ঝলকের মত একটি গ্যাসের উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রোটন কণিকার স্রোত পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। দ্বিতীয়টি হল, সৌরোৎক্ষেপ (Solar prominences)। ফোটোস্ফিয়ার থেকে হাইড্রোজেন কণিকা ও গ্যাস বিরাট শিখার আকারে প্রায় লক্ষ মাইল পর্যন্ত উপরে উঠে আসে। কখনো এক সপ্তাহ, কখনো এক মাসের মত সূর্যের আকাশে গোল আংটির মত কয়েক পাক ঘুরে আবার সূর্যেরই বুকে ফিরে যায় এরা। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পৃথিবীর অল্প কয়েকটি জায়গা থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদরা আজকাল করোনাগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থাতেই সূর্যের ফোটোস্ফিয়ারকে আড়াল করে ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করছেন।

সূর্যের করোনা কোটি কোটি মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের বর্তমানে সিদ্ধান্ত হল, পৃথিবীও এই করোনা-প্রভাবিত অঞ্চলেই অবস্থান করছে।

সূর্যের আলোকমণ্ডল থেকে যে বিপুল পরিমাণ আলো ও তাপের ঢেউ যাত্রা শুরু করল, তার দুশো কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। আর তারই ফলে পৃথিবীর মাটি ও জলের এলাকা জুড়ে প্রাণের এত বিচিত্র সমারোহ। এই আলোর বয়স দশ লক্ষ বছর। সূর্যের কেন্দ্রে জন্মলাভের পর পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছতে ওর ওই সময়টাই লেগেছে। হিসেব করে বলা যায় যে, পৃথিবীর মাত্র দুশো বর্গ-মাইল এলাকায় যে পরিমাণ সূর্যের আলো এসে পড়ছে, তাই দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর সারা বছরের শক্তির চাহিদা মিটতে পারে।

সৌরকলঙ্ক

সূর্য প্রতিদিন যে আলো ও তাপের প্রবাহ ছড়িয়ে চলেছে, তার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যেই অবস্থান করে। কিন্তু সৌরদেহজাত বেগনিপারের আলো, রঞ্জনরশ্মি ও সৌর-কণিকাস্রোতের তীব্রতা মধ্যে মধ্যে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সূর্যের একটি ঘটনা বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ঘটনাটি হল সৌরকলঙ্ক। আলোকমণ্ডলের থালাটার উপর এরা হল কালো কালো অনেকগুলো ক্ষেত্র। ১৬০৯ সালে গ্যালিলিওর দূরবীনে প্রথম এগুলো ধরা পড়ে। তিনি অবশ্য তখন এর কারণ বুঝে উঠতে পারেন নি। এদের কালো দেখাবার কারণ, আশেপাশের জায়গার (যার তাপমাত্রা এগারো হাজার ডিগ্রি ফারেনহিট) তুলনায় এ জায়গাগুলোর তাপমাত্রা খানিকটা কম (আট হাজার ডিগ্রি ফারেনহিট)। এরা কিন্তু স্থির হয়ে বসে থাকে না। সূর্যের থালাটার উপর দিয়ে এরা ঘুরে চলে, তাই থেকেই সূর্যের আপন অক্ষের উপর গতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সর্বপ্রথম।

সৌরকলঙ্কের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাধরনের মত রয়েছে। এদের সঙ্গে চৌম্বকক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়ার ফলে অনেকে অনুমান করেন, সূর্যের আপন চৌম্বকক্ষেত্রের কোন অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক রয়েছে। আপন অক্ষের উপর সূর্যের যে গতিবেগ, তার পরিমাণ সৌরদেহের সর্বত্র সমান নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে একবার সম্পূর্ণ ঘুরতে সূর্যের সময় লাগে ২৫ দিন, কিন্তু ৪০ ডিগ্রি উত্তর বা দক্ষিণ অক্ষাংশে এই সময় দাঁড়ায় ২৭½ দিন, আবার মেরু অঞ্চলে এ হচ্ছে ৩৩ দিন। সৌরদেহের বিভিন্ন অংশে গতির এই তারতম্যের ফলে সূর্যের গ্যাসীয় বস্তুর মধ্যে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে। এই আলোড়নে বিপর্যয় ঘটছে সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রে, যার বহিঃপ্রকাশ যেন ঐ সৌরকলঙ্কেরা। ওদের গঠনের মধ্য দিয়ে সূর্য যেন তার বেসামাল অবস্থাকে বাগে আনতে চাইছে।

প্রতি এগারো বছর অন্তর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও তীব্রতা বেড়ে ওঠে। পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা সূর্যের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সৌরকলঙ্কেরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতেও নানা ধরনের পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র হয়ত দেখা গেল অস্থির হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে বেতারবার্তার আদান প্রদান ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ হয়ে বসল। এইজাতীয় পরিবর্তনগুলোর কারণ খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। সৌরকলঙ্কেরা যেন সূর্যের বুকে বসানো বিরাট বিরাট পিচকিরির মুখ, আর তাদের মধ্য দিয়ে সূর্য মহাকাশে ছিটিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন রশ্মি ও সৌরকণিকাস্রোত। পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের সঙ্গে এদের সজ্ঘাত সৃষ্টি হবার পর থেকেই যে সব পরিবর্তনের কথা বলা হল সেগুলো শুরু হয়ে যায়।

একটি তারা রূপে সূর্যের দেহে কী ধরনের বিবর্তন ঘটবে, সে কথা 'তারাজগত' অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

নটি গ্রহ, একত্রিশটি চাঁদ, কয়েক হাজার গ্রহকণিকা, বহু উল্কাপিণ্ড, ধূমকেতু এবং বেশ কিছু পরিমাণে ধুলো আর গ্যাস—এই নিয়ে আমারের সৌরজগত গড়ে উঠেছে। নটি গ্রহ হল—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। গ্রহদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই তাদের উজ্জ্বলতার সৃষ্টি।

বুধ

সূর্যের সবচেয়ে ঘরের কাছের গ্রহটি হল বুধ। অন্য গ্রহ-গুলোর মত বুধেরও সূর্য-পরিক্রমা-পথ উপবৃত্তাকার। সূর্য থেকে এর নিকটতম দূরত্ব ২ কোটি ৮৬ লক্ষ মাইল ও দূরতম দূরত্ব হল ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ মাইল। সূর্য থেকে বুধের গড়পড়তা দূরত্ব তাহলে দাঁড়াল ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইলের মত। বুধের কক্ষ-পথের গতিবেগ গ্রহজগতে সবচেয়ে বেশি, সেকেণ্ডে ২৯ মাইল।

বুধের ব্যাস ৩,০০৮ মাইল। সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ হল এটি। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে অষ্টাশি দিন। বুধের একটি পিঠ বরাবরের মত সূর্যের দিকে ফেরানো, সে পিঠের তাপমাত্রা পৌছয় ৬৪০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায়। এই তাপে টিন এবং সীসেও গলিত অবস্থা লাভ করে। এই পিঠের চেহারা দাঁড়াবে অনেকটা আগুনে ঝলসানো রুটির মত। বুধের অন্য পিঠটি আবার চিরকালের মত সূর্যের দিক থেকে মুখ ফেরানো। এখানে চলেছে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের রাজত্ব। এখানকার তাপমাত্রা নেমে আসে —৪৫০ ডিগ্রি ফারেনহিটে। যে তাপে বরফ গলে তা থেকেও ৪১৮ ডিগ্রি ফারেনহিট কম।

বুধের নিজের অক্ষের চারপাশে একবার ঘুরে আসতেও সময় লাগবে ৮৮ দিন, অর্থাৎ বুধের একটি দিনের পরিমাণ হবে আমাদের ৮৮টি দিনের সমান।

বুধের ভরের পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম; তাই তার মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণও কম। বুধে কোন বায়ুমণ্ডল নেই; কারণ তার দুর্বল মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা সে কোন গ্যাসীয় উপাদানকে ধরে রাখতে পারে নি। বুধে যদি কোন বায়ুমণ্ডল থাকত তাহলে সূর্যের আলো বুধের পিঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসার সময় ঐ আলোর বর্ণালীতে আমরা ফ্রাউনহোফের রেখার সন্ধান পেতাম। এই রেখাগুলোর মধ্যে বুধের বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদানের অস্তিত্ব ধরা পড়ত। কিন্তু সে-জাতীয় কোন রেখার সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

বুধের সূর্যালোকিত ও চির-অন্ধকারময় দুই অংশের তাপমাত্রায় বিপুল তারতম্য। যে জাতীয় জটিল রাসায়নিক পদার্থের সমবায়ে আমাদের জীবদেহ গড়ে উঠেছে, তারা খুব তপ্ত বা খুব শীতল কোন পরিবেশেই গড়ে উঠতে পারে না। বুধে তাই উন্নত উদ্ভিদ বা প্রাণীর অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব। তবে, বুধের যে অঞ্চলটুকু আলো ও

অন্ধকারের মিলনক্ষেত্র, সেখানে তাপমাত্রার তারতম্য হয়ত অনেকটা কম। সেই অঞ্চলে খুব নিচুশ্রেণীর কিছু পোকামাকড় এবং কাঁটা-জাতীয় গুল্মের উদ্ভব সম্ভব হলেও হতে পারে।

শুক্র

সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ হল শুক্র। বছরের কিছুদিন একে ভোরের আকাশে দেখা যায়, তখন একে আমরা বলি শুকতারা; আবার অন্য সময়ে এর দেখা পাওয়া যায় সন্ধ্যার আকাশে; তখন তাকে বলি 'সাঁঝের তারা'। সূর্য ও চাঁদকে বাদ দিলে শুক্র আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল বস্তু। তার কারণ হল এই যে, শুক্রকে ঘিরে যে ঘন মেঘের আস্তরণটি রয়েছে তা সূর্যের আলোর শতকরা প্রায় ৬৭ ভাগকে প্রতিফলিত করে থাকে।

সূর্য থেকে শুক্রের গড়পড়তা দূরত্ব হল ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন। শুক্রের ব্যাস ৭,৭০০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের কাছাকাছি। শুক্রের ভরের পরিমাণ পৃথিবীর ভরের পাঁচভাগের চারভাগ। শুক্রের মাধ্যা-কর্ষণ বল আবার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের শতকরা ৮৮ ভাগ। কাজেই পৃথিবীতে কারো ওজন ১০০ কে. জি. হলে শুক্রে সে ওজন দাঁড়াবে ৮৮ কে. জি.। পৃথিবীর সঙ্গে এত মিল থাকার জন্যে শুক্রকে পৃথিবীর যমজ বোনও বলা হয়। পৃথিবী থেকে শুক্রের সবচেয়ে নিকটতম দূরত্ব দাঁড়ায় ২২ কোটি মাইল।

শুক্র সম্বন্ধে এই কয়েকটি তথ্যই আমরা সঠিকভাবে এতকাল জানতুম। ঘন মেঘের আড়ালে শুক্র তার অন্য সব রহস্যকে গোপন করে রেখেছে। জ্যোতির্বিদরা দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টা করেও শুক্রের জমির উপরিতলকে দেখে উঠতে পারেন নি; কাজেই তার গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণাও এতকাল ছিল না। এমন কি শুক্রের দিন ও রাতের পরিমাণ পর্যন্ত জানা ছিল না। মেঘের

আবরণের জন্যে আপন অক্ষের উপর শুক্রের গতিবেগ নির্ণয় করা ছিল দুঃসাধ্য।

শুক্রের ঘন মেঘটি প্রধানত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দিয়ে তৈরি —এই ছিল বিজ্ঞানীদের ধারণা। কিছুদিন আগে একটি পরীক্ষায় সেই মেঘের মধ্যে কিছু জলীয় বাষ্পের সন্ধানও পাওয়া গেছে। তবে, অক্সিজেন আছে বলে কোন প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

শুক্রের জমির গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা বিজ্ঞানীমহলে গড়ে উঠেছিল। কেউ কেউ অনুমান করতেন, শুক্রের সবটাই জলময়। কিন্তু তাহলে আবার শুক্রের আকাশে অত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস জমে থাকার কথা নয়। সমুদ্রের জল তার অনেকটাই শোষণ করে দিত। শুক্র তাহলে হয়ে দাঁড়াত সোডা-ওয়াটারের চমৎকার একটি ডিপো। পরীক্ষায় দেখা গেল যে, শুক্রের জমির তাপ ৬০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কাছাকাছি। তাই যদি হয় তবে অবশ্য শুক্র যে জলময় এ ধারণা বাতিল না করে উপায় থাকে না।

আর একদল বিজ্ঞানীর কাছ থেকে শোনা গেল, শুক্র হচ্ছে একটি রুক্ষ মরুময় ভূমি। সূর্যের আলো শুক্রের ঘন মেঘের মধ্য দিয়ে এসে তার জমিকে তাতিয়ে তুলছে। সেই জমি তখন ছড়াচ্ছে লাল উজানী (ইনফ্রারেড) আলো। ঐ আলো কিন্তু শুক্রের মেঘের ঘেরাটোপের জালে বন্দী হয়ে পড়ল। এভাবে তাপ জমা হতে হতে খোদ শুক্রের জমিটাই অসম্ভব রকম গরম হয়ে উঠেছে। আর সেই তপ্ত জমির উপর দিয়ে প্রচণ্ড জোরালো ঝোড়ো হাওয়া দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছে। আবার কেউ ভাবতেন, শুক্র একটি গরম তেলের সমুদ্র, তাপের ঠেলায় তেল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে এসে ঐ মেঘের আবরণটাকে তৈরি করেছে।

শুক্রের আকাশে অত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস কোথা থেকে এল? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু কারো কাছ থেকেই সঠিকভাবে পাওয়া যায় নি। শুক্রের গাছপালা থেকে যদি ঐ গ্যাস এসে থাকে,

তাহলে সেখানকার আকাশে অক্সিজেনের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত ছিল। ঐ গ্যাসীয় মেঘের তাপমাত্রা দেখা গেল ৩৬ ডিগ্রি ফারেনহিট, অর্থাৎ যে তাপে জল বরফ হয়, তার চেয়েও কম। তাই অনেকের অনুমান যে, ঐ মেঘ জমানো কার্বন ডাই-অক্সাইডের কুচি দিয়ে তৈরি।

রহস্যময় শুক্রের ঘরের খবর সংগ্রহের পরিকল্পনা নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ১৯৬২ সালের শেষভাগে 'মেরিনার'-২ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক রকেটকে শুক্রের ঘরের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ঐ বছরের ১৪ই ডিসেম্বর সেই রকেট শুক্রের ২১, ৫৯৪ মাইল পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সে সময় তার ভিতরকার যন্ত্রপাতি শুক্র সম্বন্ধে কতকগুলো দামি খবর পাঠিয়েছে। শুক্রের জমির তাপ হল নাকি ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। সেখানে একফোঁটাও জলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। শুক্রের আকাশে নাকি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বা জলীয় বাষ্প নেই। এতদিন ধরে যে ধারণা ছিল তার একেবারে উলটো খবর আর-কি। তাছাড়া যে মেঘের আবরণটা আমাদের চোখে পড়ে, তা প্রধানত নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে তৈরি। শুক্রের কোন চৌম্বক ক্ষেত্র থাকলেও রকেটের যন্ত্রে তা ধরা পড়ে নি। শুক্র সম্ভবত তার অক্ষের উপর ২৪০ দিনে একবার পাক খাচ্ছে। অর্থাৎ শুক্রের একটা দিন আমাদের ২৪০টি দিনের সমান। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে শুক্র সূর্যের চারদিকে ঠিক সেভাবেই ঘুরছে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলো কিন্তু সূর্যের চারদিকে ঘোরে ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘুরছে তার উলটোভাবে।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন না থাকার ফলে এবং তার জমির তাপ খুব বেশি বলে সেখানে কোন জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে নি। শুক্রের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর বহু কোটি বছর আগের চেহারার একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর আকাশেও তখন অক্সিজেন ছিল না এবং

জমির তাপ ছিল খুব বেশি। শুক্রে হয়ত প্রাণসৃষ্টির প্রথম পরীক্ষা সবে শুরু হয়েছে বা শুরু হবার উপক্রম দেখা দিয়েছে।

শুক্রগ্রহ থেকে জ্যোতির্বিদরা বেতার-তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন। কি কারণে সেখানে এই তরঙ্গের উদ্ভব হচ্ছে, সে বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি।

পৃথিবী

সূর্যের তৃতীয় গ্রহ হল পৃথিবী, সূর্য থেকে তার গড়পড়তা দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০,০ মাইল। পৃথিবীর বুকে বাস করি বলে আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে আকাশের বুকে অন্য গ্রহগুলোর মত পৃথিবীর জন্যেও একটি আসন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে অন্য গ্রহগুলোর মত পৃথিবীরও একটি উজ্জ্বল কান্তি দেখা যাবে মহাকাশ থেকে। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল। পৃথিবী আপন অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় এক পাক ঘুরছে। এই গতির পরিমাণ ঘণ্টায় ১১০০ মাইল। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে পৃথিবী সময় নেয় ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন। সূর্য-পরিক্রমা-পথে পৃথিবীর গতিবেগ হল সেকেণ্ডে ১৯$\frac{১}{২}$ মাইল। পৃথিবীর জমিতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন যে তাপের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা হল যথাক্রমে ১৩৮ ডিগ্রি ফারেনহিট ও—১২৫ ডিগ্রি ফারেনহিট।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শুক্রের মত অত ঘন নয়। সেখানে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন থাকার ফলে পৃথিবীর বুকে জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। সমুদ্রের বিশাল জলরাশির জন্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কখনো একটি নির্দিষ্ট মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। শুক্র গ্রহের ঘন গ্যাসের মেঘের উপর থেকে কেউ যদি পৃথিবীকে দূরবীনের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে পৃথিবীকে সে দেখবে শুক্রের চেয়ে খানিকটা বড় উজ্জ্বল একটি

জ্যোতিষ্করূপে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘেরাটোপের মধ্য দিয়ে সে তার মহাদেশের জমির সীমারেখাগুলো দেখতে পাবে। পৃথিবীর সমুদ্রের জলের উপর থেকে প্রতিফলিত আলোর ছটা দেখে সে অনুমান করবে, এসব জায়গায় বিরাট বিরাট চেহারার মসৃণ সব ক্ষেত্র রয়েছে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর জমাট-বাঁধা তুষারের স্তূপ তার চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠবে। অবশ্য পৃথিবীতে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীজগতের অস্তিত্ব আছে কি না, এ বিষয়ে কোন ধারণাই সে করে উঠতে পারবে না। 'পৃথিবীর কথা' বইতে পৃথিবী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাঁদ। অন্য আরো কয়েকটি গ্রহেরও উপগ্রহ আছে। কিন্তু সেই উপগ্রহগুলোর ভরের মাপ তাদের আপন-আপন গ্রহের তুলনায় অনেক কম। এ ব্যাপারে চাঁদ হচ্ছে স্বতন্ত্র।

চাঁদ

পৃথিবীর একটিমাত্র উপগ্রহ চাঁদ, এক উপবৃত্তাকার পথে সে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। চাঁদ কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে না। চাঁদের পরিক্রমাপথের কেন্দ্র পৃথিবীরই মধ্যে, কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তা ২,৮৮৬ মাইল দূরে। পৃথিবী থেকে চাঁদের কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব হল ২,৫২,৭৬০ ও ২,২১,৪৬৩ মাইল। গড়পড়তা দূরত্ব দাঁড়ায় ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। চাঁদের ব্যাস ২,১৬০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের চারভাগের একভাগের চেয়ে সামান্য বেশি। চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের ৮১ ভাগের একভাগ মাত্র। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ পৃথিবীর ছ-ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর মাটিতে একটি বস্তুর যা ওজন, চাঁদে হবে ঠিক তার ছ-ভাগের এক ভাগ। এখানে যে জিনিসটির ওজন ৬ সের, চাঁদে নিয়ে যেতে পারলে তার ওজন দাঁড়াবে ১ সেরের মত।

চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই চাঁদ তার জ্যোৎস্নাকে তৈরি করে। এই কারণে, এবং চাঁদের ভূপ্রদক্ষিণের ফলে চন্দ্রকলার সৃষ্টি হয়। চাঁদ যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে থাকে তখন চাঁদের যে পিঠটায় সূর্যের আলো পড়ছে সেদিকটা থাকে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। চাঁদের অন্ধকার দিকটাকে আমরা তখন দেখতে পাই। এই সময়টাকে আমরা বলি অমাবস্যা। দু-সপ্তাহ পরে চাঁদ চলে আসে পৃথিবীর যেদিকে সূর্য তার বিপরীত দিকে। সূর্যের আলোয় ঝলমলে চাঁদের থালাটা তখন আমাদের দিকে ফেরানো থাকে। এই সময়টাকে আমরা বলি পূর্ণিমা। পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৭দিন ৭ঘণ্টা। কিন্তু সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এক অমাবস্যা থেকে আর একটি অমাবস্যার মধ্যে সময়ের মাপ দাঁড়ায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, সে সময়ের মধ্যে চাঁদ নিজের অক্ষের চারদিকেও একবার ঘুরে আসে। যার ফলে চাঁদের শুধু একটি পিঠই আমরা দেখতে পাই। একটি সহজ পরীক্ষায় তুমি নিজেই ঘটনাটি বুঝতে পারবে। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল ল্যাম্প রেখে তার চারপাশে ঘুরতে থাক। ঘোরার সময়ে খেয়াল থাকে যেন, তোমার সামনের দিকটাই আলোর দিকে ফেরানো থাকবে, পেছনের দিকটা নয়। আলোটাকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরে এসে তুমি দেখতে পাবে, ঐ সময়টুকুর মধ্যে তুমি নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকেও একবার ঘুরে নিয়েছ, অথচ তোমার একটা দিকই বরাবর আলোর দিকে ছিল। চাঁদ ঠিক একই কায়দায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। অবশ্য চাঁদের অর্ধেকের চেয়ে খানিকটা বেশি জায়গা (প্রায় শতকরা ষাট ভাগ) আমাদের চোখে পড়ে।

চাঁদের জ্বালামুখ

পূর্ণিমার রাতে দূরবীন দিয়ে চাঁদের গোল থালাটার দিকে

তাকালে আমরা দেখতে পাব আংটির মত গোল গোল চেহারার কতকগুলো দাগ। এরা হল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এদের উচ্চতাও খুব কম নয়। চাঁদের দক্ষিণমেরুর কাছে 'আইজ্যাক নিউটন' নামে যে জ্বালামুখটি রয়েছে, সে পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ২৯,০০০ ফুট। দক্ষিণমেরুর কাছে ক্লেভিয়াস নামে জ্বালামুখটির ব্যাস সবচেয়ে বেশি। তার পাথরের দেয়ালের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি হল ১৪৬ মাইল। কলকাতার মত পাঁচ ছ-টা শহরকে ওর মধ্যে অনায়াসে পুরে ফেলা যায় আর কি। চাঁদের ছোট বড় জ্বালামুখগুলোর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩২,০০০ এবং এরা প্রায় সবাই বিভিন্ন সরল রেখার আকারে সারিবদ্ধ হয়ে আছে।

এ ধরনের একটি সুন্দর শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়ে জ্বালামুখগুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে চান্দ্রবিশেষজ্ঞেরা চমৎকার কতকগুলো তত্ত্ব খাড়া করেছেন। একটি মত হল, চাঁদের জীবনের প্রথম অবস্থায় হাজার হাজার উল্কা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত চাঁদের গায়ে। তাদের আঘাতে লক্ষ-লক্ষ টন পাথর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শূন্যস্থানগুলোয় সৃষ্টি হয়েছিল ঐ জ্বালামুখগুলো। আর একটি মত অনুসারে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারই হল জ্বালামুখগুলোর উৎপত্তির মূল কারণ। আজকের ঠাণ্ডা, মৃত আগ্নেয়গিরিগুলো একদিন ছিল জীবন্ত। মাঝে মাঝে তারা বিপুল পরিমাণ পাথর ও জ্বলন্ত লাভার স্রোত বাইরে ছুঁড়ে দিত। এমনিধারার ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরে চলতে চলতে একদিন ঐ গহ্বরগুলো তাদের আজকের গভীরতা লাভ করে বসেছিল।

চাঁদের সমুদ্র

কোন পরিষ্কার জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদের দিকে তাকালে দূরবীন ছাড়াই যে কালো-কালো অংশগুলো চোখে পড়ে, তাদের নিয়েও চান্দ্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক তর্ক আছে। কেউ কেউ মনে

করেন, ওদের সৃষ্টির মূলেও উল্কাদের সজ্ঘাতই ছিল প্রধান ঘটনা। এক মাইল থেকে দু-মাইল আকারের বিরাট বিরাট উল্কাখণ্ড প্রচণ্ড বেগে এসে যখন আছড়ে পড়ত চাঁদের জমিতে, তারা ঠিক একতাল মাখনের মধ্যে ছুরির মত সেই পাথুরে জমি ভেদ করে নিচে নেমে যেত। সজ্ঘাতের বেগে চাঁদের লক্ষ-লক্ষ টন পাথর গলে গিয়ে জ্বলন্ত লাভার স্রোতের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসত। সেই লাভার নদী চাঁদের জমির উপর নাগালের মধ্যে যা কিছু পেত গ্রাস করতে করতে এগিয়ে চলত; উঁচু নিচু সব জায়গা লাভার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে এক-একটি বিরাট সমতল ক্ষেত্র উঠত জেগে। এই জ্বলন্ত লাভার স্রোত কালক্রমে জমাট বেঁধে গিয়ে আজকের বিরাট সমুদ্রগুলো গড়ে তুলেছে। এদেরই কালো দেখায়, কারণ এরা সূর্যের আলোর শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ ফিরিয়ে দিতে পারে। চাঁদের আলোর মধ্যে ঝলমলে যে জায়গাগুলো আমরা দেখি, তারা গড়ে উঠেছে হালকা ধরনের পাথর দিয়ে। এরা সূর্যের আলোর শতকরা পনেরো ভাগকে ফিরিয়ে দিতে পারে। আরো অবশ্য নানা মত রয়েছে চাঁদের এই 'মেরিয়া' বা সমুদ্রগুলোর গড়ে ওঠার পেছনে।

চাঁদের থালাটার প্রায় তিনভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে এই সমুদ্রগুলো। চাঁদের সবচেয়ে বড় সমুদ্রটার নাম হল 'মেয়ার ইমব্রিয়াম'। কথাটি ল্যাটিন, বাংলা অর্থ, বৃষ্টি-সাগর। রুশ বিজ্ঞানীরা একটি রকেট ছুঁড়েছিলেন চাঁদের বুকে। সেটি গিয়ে আছড়ে পড়েছিল যে তিনটি সমুদ্রের মাঝে তাদের নাম মেয়ার সেরেনিট্যাটিস, মেয়ার ট্র্যানকুইলিট্যাটিস ও মেয়ার ভেপারাম; বাংলা মানে হল: শান্তি সাগর, প্রশান্তি সাগর, ও বাষ্প সাগর। এগুলো শুধু নামেরই বাহার। চাঁদে না আছে বৃষ্টি, না আছে জল, না আছে বাষ্পের কোন চিহ্ন। সে যাই হোক, দূরবীনের মধ্য দিয়ে এই সাগরগুলোর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না হয়ে কিন্তু পারা যায় না।

চাঁদের পাহাড় ও জমি

দূরবীন দিয়ে দেখলে চাঁদের আর একটি বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সে তার সমুন্নত পর্বতগুলো। চাঁদের জীবনে যখন তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হবার পালা চলেছে, তখন হয়ত এই পাহাড়গুলোর জন্ম হয়ে থাকবে। সে সময় চাঁদের বুকে জায়গায় জায়গায় বিরাট বড় সব ফাটল জেগে উঠেছিল। আর সেইসব ফাটলের মধ্য দিয়ে শূন্যে হাজার হাজার ফুট মাথা তুলে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছিল বিরাট বড়-বড় পাথরের খণ্ড। গোড়াতে যেমন খোঁচা-খোঁচা চেহারা ছিল পাহাড়গুলোর, আজও তার কোন বদল হয় নি। জল বা বাতাসই পৃথিবীর পাহাড়গুলোর অমন মসৃণ আর সুঠাম চেহারা গড়ে তুলেছে, কিন্তু চাঁদে না আছে জল, না আছে বাতাস। চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির নাম মাউন্ট লিবনিৎজ, এটি রয়েছে চাঁদের দক্ষিণমেরুর কাছে। এর উচ্চতা ৩৫,০০০ ফুট, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এভারেস্টের চেয়ে প্রায় ৬,০০০ ফুট বেশি।

চাঁদের থালাটার মধ্যে ঝলমলে জায়গাগুলো হল তার স্থলভাগ আর এর সবটাই হল অসমান, উঁচুনিচু এবং চক্রাকার পাহাড়, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ও গোলাকার সমতল ক্ষেত্রের রাজত্ব। সমতল ভূমিগুলো আবার ঘেরা আছে পাহাড়ের চক্রাকার প্রাচীরে। এদের কোন-কোনটি আবার এত বড় যে আমাদের বাংলাদেশের সমগ্র ২৪ পরগণা জেলাটিরই জায়গা হয়ে যেতে পারে তার মধ্যে।

পূর্ণিমা রাতে শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে চাঁদের দিকে তাকালে একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো থেকে লম্বা লম্বা হাতের মত কতকগুলো রশ্মি যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। চাঁদের এই রহস্যময় রশ্মিগুলোর উৎপত্তি নিয়ে অনেক তর্ক আছে। টাইকো নামে জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসা

রশ্মিটাই সবচেয়ে বেশি বিচিত্র। অনেকের মতে, উল্কাপাতের ফলে চাঁদের জমিতে যে বিস্ফোরণ ঘটছে, তার ফলে খুব পাতলা ময়দার মত পদার্থ চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পৃথিবী থেকে এদেরই আমরা রশ্মির আকারে দেখি।

চাঁদের জমির গঠন সম্বন্ধেও অনেক তর্ক রয়েছে। কেউ মনে করেন, উল্কার সজ্ঘাতে চাঁদের জমির উপরটা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে ধুলোর পাহাড় তৈরি হয়ে বসে আছে। এই ধুলো কয়েকশো ফুট থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত গভীর হতে পারে। কিছুদিন আগে রুশ রেডিও-জ্যোতির্বিদদের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল, চাঁদের জমির গঠন নাকি 'পিউমিস স্টোন' বা ঝামাপাথর-জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা 'রেঞ্জার' নামে পর-পর দুটো মহাকাশযান চাঁদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। মহাকাশযানদুটি চাঁদের জমিতে আছড়ে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত চার হাজার ছবি তুলে পাঠিয়েছে। সেগুলোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চাঁদের গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যাবে।

চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই, উদ্ভিদ বা প্রাণীজগত কিছুই নেই। চাঁদ একেবারে মরা জগত বলেই এতদিন ধরে নেওয়া হত। ১৯৫৮ সালে রুশ জ্যোতির্বিদ কজিরেভ চাঁদের আলফনসাস্ নামে একটি জ্বালামুখের মধ্যে কার্বনের সন্ধান পেলেন। চাঁদের অভ্যন্তরে এখনো আগ্নেয় গ্যাস রয়েছে কি না, এই পরীক্ষার পর অনেককেই তা ভাবিয়ে তুলেছে।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে রুশ বিজ্ঞানীরা চাঁদের উলটো পিঠে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে পাঠিয়ে, সে পিঠের ছবি তুলে, টেলিভিশনের মাধ্যমে ছবিগুলোকে পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। চাঁদের উলটো পিঠটার সঙ্গে তার দৃশ্য পিঠের খানিকটা তফাত রয়েছে। সেখানে সমুদ্রের সংখ্যা অনেক কম এবং অন্য পিঠের তুলনায় তারা আয়তনেও ছোট। পর্বতমালার সংখ্যাই

সেখানে বেশি। জ্বালামুখেরা আকারে কেউ খুব বড় নয়; সবচেয়ে বড়টির ব্যাস ৪৩ মাইল।

চান্দ্রবিজ্ঞানীরা একটি মস্ত সমস্যায় পড়েছেন। চাঁদের দুই পিঠের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে এতটা তফাত হবার কারণ কী?

চাঁদ কি চিরদিন পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে থাকবে? চান্দ্রবিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের কক্ষপথ প্রতি বছর সাত ফুট করে সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এভাবে চাঁদের দূরত্ব যেদিন পৃথিবী থেকে দশ লক্ষ মাইলের কোঠায় গিয়ে পৌঁছবে, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে চাঁদ বন্দী হয়ে সৌরজগতে আর একটি নতুন গ্রহের ভূমিকা গ্রহণ করবে। চাঁদের সূর্য-পরিক্রমাপথ তৈরি হবে পৃথিবী ও শুক্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

চাঁদকে হারানোর পর পৃথিবীর জীবনে কয়েকটি বড় পরিবর্তন ঘটে। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে যে জোয়ারের সৃষ্টি হত, তা আর কোনদিন ঘটবে না। সূর্য যদিও চাঁদের তুলনায় বহুগুণ বড়, কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে থাকার ফলে পৃথিবীর উপর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের টান সূর্যের তুলনায় দ্বিগুণ জোরালো হয়ে দেখা দেয়, ফলে চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের বেগটাও হয় অনেক প্রবল।

চাঁদকে হারিয়ে পৃথিবীর আকাশ জ্যোৎস্নার আলো থেকে বঞ্চিত হবে এবং সূর্যগ্রহণ মানুষ আর কোনদিনই দেখতে পাবে না।

বিজ্ঞানীরা বলেন, শৈশব অবস্থায় পৃথিবী আপন অক্ষের উপর দশ ঘণ্টায় একবার পাক খেত, অর্থাৎ পৃথিবীর একটি দিন ও রাত হত মোট দশ ঘণ্টায়। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে রোজ যে দু-বার করে জোয়ারের সৃষ্টি হত, তা পৃথিবীর ঐ দ্রুত আবর্তনের গতিকে কমানোর জন্যে গাড়ির ব্রেকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কয়েক শো কোটি বছর ধরে ধীরে ধীরে এই পিছু টান পৃথিবীর 'আহ্নিক গতির' বেগকে কমিয়েছে। আজ পৃথিবীতে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি দিন ও একটি রাত ঘটছে।

মঙ্গল

সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল, সূর্য থেকে তার দূরত্ব হল ১৪ কোটি ১৫ লক্ষ মাইল। মঙ্গল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে, তখন তার দূরত্ব দাঁড়ায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল। মঙ্গলের ব্যাস ৪,২৫০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকের একটু বেশি। এর দিন ও রাতের পরিমাণ পৃথিবীরই মত; প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটে একবার নিজের অক্ষের উপর পাক খাচ্ছে। একবার সূর্য-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে মঙ্গল সময় নেয় ৬৮৭ দিন। মঙ্গলের বছরের পরিমাণ তাহলে আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়।

মঙ্গলগ্রহের লাল রঙ আকাশে খোলা চোখে তাকিয়েও নজরে পড়বে। একদল বিজ্ঞানী বলেন, মঙ্গলের আকাশে একদিন প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছিল, কিন্তু সেই অক্সিজেন কোন কারণে তার জমির তলায় চলে গিয়েছে। এর ফলে সমস্ত জমিটা যেন মরচে ধরে লাল হয়ে গেছে। মঙ্গলের আকাশ জুড়ে এখন রয়েছে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও আরগন। অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই সামান্য। মঙ্গলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পৃথিবীর ১৫ ভাগের ১ ভাগ। বায়ুর ঘনত্ব পৃথিবীর ১১ মাইল উপরকার আকাশের বায়ুর ঘনত্বের সমান।

মঙ্গলের জমি উষর মরুময় ভূমির মত আর তার উপর দিয়ে ছুটছে ধূলোর ঝড়। দূরবীন যন্ত্রে হলদে মেঘের মত এ ঝড় ধরা পড়ে। দুপুরবেলা মঙ্গলের তাপ পৌঁছয় ৫০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায়, কিন্তু রাত্রিবেলা তা নেমে আসে – ৯০ ডিগ্রি ফারেনহিটে। তাপমাত্রার এই বিপুল তারতম্যের কারণ হল, মঙ্গলের শুকনো বাতাস দিনের তাপকে রাতের বেলা একেবারেই ধরে রাখতে পারে না।

১৮৭৭ সালে ইতালিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্কিয়াপ্যারেলি একদিন দূরবীনে মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তার দেহে সোজা সোজা অনেকগুলো রেখা দেখতে পেলেন। ঐ বছরটা ছিল মঙ্গলের পৃথিবীর খুব

কাছাকাছি আসবার সময়। রেখাগুলোকে স্কিয়াপ্যারেলি নাম দিলেন ক্যানেলি, ইতালিয়ান ভাষায় যার অর্থ হল, প্রণালী। কিন্তু অনুবাদের ভুলে সেই শব্দটি ইংরেজিতে ক্যানাল বা খাল নামে পরিচিতি লাভ করল। সোজা লম্বা লম্বা খাল কাটা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাজ। বহু জ্যোতির্বিদ ধরে নিলেন, মঙ্গলে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীরা রয়েছে। মঙ্গল গ্রহে এ জাতীয় রেখার সন্ধান আরো কিছু লোকের দূরবীনেও ধরা পড়েছিল।

সমস্ত ব্যাপারটিই একটি প্রহেলিকা ছাড়া কিছুই নয়। মঙ্গলের আকাশে অক্সিজেন নেই—এটা জানার পর সেখানে বুদ্ধিমান প্রাণীদের অস্তিত্ব নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাতে চাইলেন না। মঙ্গলগ্রহে যখন শীতকাল, তখন দেখা যায় তার একটি মেরু অঞ্চলে বরফের টুপি যেন জমতে শুরু করেছে। তবে ঐ বরফের স্তরটা যে খুবই পাতলা, সেটা পরীক্ষায় বোঝা গিয়েছিল। মঙ্গলের বসন্তকালে সেই টুপির চেহারা ছোট হতে শুরু করে, আর ঠিক তখনই মঙ্গলের দেহের অনেকখানি জায়গা জুড়ে কালো রঙের বহু এলাকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ঐ কালো এলাকাগুলোকে চাঁদের মতই নাম দেওয়া হয়েছে মেরিয়া বা সমুদ্র। অনেকের ধারণা, ওরা মঙ্গলের দেহে গজানো উদ্ভিদরাজি। কিন্তু বর্ণালী বিশ্লেষণ দ্বারা ওই জায়গাগুলোয় পৃথিবীর গাছের পাতার ক্লোরোফিলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়, ওরা উদ্ভিদ হলেও পৃথিবীর লিচেন বা শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের বরফস্তূপ বসন্তের উষ্ণতার স্পর্শে বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে এসে ঐ কালো সমুদ্রগুলোর উপর আবার জলের আকারে নিজেদের ছড়িয়ে দেয়। জলের স্পর্শে মঙ্গলের উষর ভূমি প্রাণ পেয়ে জন্ম দেয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদের। মঙ্গলের দেহে এ ঘটনা প্রতি বছরই ঘটে চলেছে।

মঙ্গলের দুটি চাঁদ। সৌরজগতে চাঁদের পরিবারে ছোট

চেহারার মাপে তাদের জুড়ি নেই। একটির নাম ফোবো, আকারে মাত্র দশ মাইল চওড়া ; অপরটির নাম ডাইমো, আকারে পাঁচ মাইল চওড়া। এরা মঙ্গলের ৫৮০০ ও ১৪,৬০০ মাইল দূরে থেকে গ্রহটিকে পরিক্রমা করে চলেছে।

গ্রহাণুপুঞ্জ

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল—এরা মোটামুটি একই জাতের গ্রহ। গঠন-প্রকৃতির দিক দিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। মঙ্গলের পর সৌরজগতের যে গ্রহটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সে হল গ্রহরাজ বৃহস্পতি। সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব হল ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ মাইল ও বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩৩ লক্ষ মাইল। এই দুটি গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আর একটি গ্রহের থাকবার কথা। কিন্তু ঐ অঞ্চলে গ্রহের জায়গায় একদল বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, তারা হল গ্রহাণুপুঞ্জ। এদের মোট সংখ্যা ৫০,০০০। সবচেয়ে বড় গ্রহাণুটির নাম সিরিস, ব্যাস ৪৫০ মাইল। সবচেয়ে ছোটটি হয়ত লম্বায় মাত্র কয়েক ফুট।

এ পর্যন্ত মাত্র ১৬০০ গ্রহাণুর কক্ষপথ নির্দিষ্টভাবে ছকে ফেলা সম্ভব হয়েছে। তালিকা তৈরি হয়েছে আরো এক হাজারটির। গ্রহাণুপুঞ্জদের আর একটি সঙ্গী হল অসংখ্য গ্রহকণিকা, ধুলোর মত ক্ষুদ্র যাদের চেহারা।

গ্রহাণুরা এল কোথা থেকে? এ বিষয়ে এখনো কোন স্থির ধারণায় কেউ পৌঁছতে পারেন নি। একদল পণ্ডিতের মতে, এরা হল একটি গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। অন্যান্য গ্রহের মত এদের দেহও ধাতু ও পাথর দিয়ে তৈরি। এদের কিছু-কিছু নমুনা আমরা পৃথিবীতে বসেই লাভ করি। উল্কার আকারে আমাদের আকাশে যারা এসে প্রতিনিয়ত ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের অনেকেই এই

গ্রহাণু পরিবারের সদস্য। দুটি গ্রহাণুর সঙ্ঘাত থেকেও বহু উল্কাপিণ্ড জন্ম নিয়ে থাকে বলে অনেকের ধারণা। আর-এক দলের মতে, এই গ্রহাণুরা বহু কোটি বছর আগে একটি গ্রহরূপে গড়ে উঠবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোন কারণে তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গ্রহাণুদের জীবনে গ্রহরাজ বৃহস্পতির প্রভাব প্রায় শনির মত। তিনি যে এদের কত সহস্রকে তাঁর বিশাল বপুর মধ্যে বেমালুম হজম করে বসে আছেন, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অনেকের মতে, বৃহস্পতির বারোটি চাঁদের বেশ কয়েকটি গ্রহাণু-পরিবার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া।

কতকগুলো গ্রহাণু মাঝে মাঝে পৃথিবীর খুব ধার ঘেঁসে চলে যায়। ১৯৩৭ সালে হার্মিস নামে একটি গ্রহাণু পৃথিবীর ৪,৮৫,০০০ মাইল পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। জ্যোতির্বিদরা হিসেব করে দেখিয়েছেন, হার্মিস কোন সময়ে পৃথিবীর ২,২০,০০০ মাইলের মধ্যেও এসে পড়তে পারে। খানিকটা চিন্তিত হবার মতই খবর বটে। হার্মিসের ব্যাস এক মাইল। পৃথিবীর আকর্ষণে হঠাৎ একদিন কোন্ দেশের ঘাড়ের উপর যে এসে পড়বে, তা আগে থেকে জানবার কোন উপায় নেই।

কতকগুলো গ্রহাণুর স্বভাব নিতান্তই ছন্নছাড়ার মত। ইকেরাস নামে একটি গ্রহাণু দিশেহারার মত ছুটতে ছুটতে পৃথিবী ও বুধের পাশ কাটিয়ে সূর্যের দু-কোটি মাইলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়। সূর্যের তাপে ওর সর্বাঙ্গ তখন গনগনে হয়ে ওঠে। আবার চক্কর মেরে উল্টো দিকে তার ছুট শুরু হয়। সে দৌড় সূর্য থেকে প্রায় ৯০ কোটি মাইল দূরে শনির দরজায় গিয়ে থামে। সেই অঞ্চলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশে তার সর্বাঙ্গ বরফে জমে যায়। কিন্তু কোন বস্তুর গতিই উদ্দেশ্যহীন নয়, তা সে সৌরজগতেই হোক বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রেই হোক। ইকেরাসও তাই সূর্যের মায়া কাটাতে পারে না,

সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের টানে তাকে আবার ফিরে আসতে হয়। ইকেরাসের মত আরো অনেক গ্রহাণু এরকম লম্বা পথে চরকিবাজির মত পাক খাচ্ছে। ওদের করুণ দশার দিকে তাকিয়ে তোমাদের মনে খানিকটা সহানুভূতি জাগছে না কি ?

বৃহস্পতি

বুধগ্রহ থেকে শুরু করে পৃথিবী পেরিয়ে গ্রহাণুপুঞ্জ পর্যন্ত যে জগত, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের নানা বিষয়ে মিল থাকার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তার পরেই যে চারটি গ্রহের সন্ধান আমরা পাচ্ছি—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন—এরা সম্পূর্ণভাবেই আমাদের চেনা জগতের বাইরে। গ্যাসীয় উপাদানে ভরা ও আকারে বিরাট দৈত্যের মত চেহারার এই গ্রহগুলোর গঠন-প্রকৃতির রহস্যের পুরোপুরি কিনারা আজও হয় নি।

সূর্যের গ্রহজগতে যিনি নিঃসন্দেহে রাজকীয় সম্মান দাবি করতে পারেন, তিনি হলেন বৃহস্পতি। আকারে ইনি সর্ববৃহৎ। সূর্য থেকে বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩৩ লক্ষ মাইল, সূর্যের চারদিকে এর একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে প্রায় বারো বছর। গ্রহটির কক্ষপথে গতিবেগ সেকেণ্ডে আট মাইল।

বৃহস্পতির নিরক্ষীয় অঞ্চলের ব্যাস ৮৮,৭০০ মাইল, কিন্তু মেরু অঞ্চলে এই ব্যাস ৮৩,০১০ মাইল। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে গ্রহটির আপন অক্ষের উপর দ্রুত গতিবেগ, যার পরিমাণ ঘণ্টায় ২৭,০০০ মাইল। ফলে গ্রহটির একটি দিনের পরিমাণ পাঁচ ঘণ্টা ও একটি রাতের পরিমাণ পাঁচ ঘণ্টা। এর মেরু অঞ্চলের চেহারা দেখে মনে হয় কেউ যেন দু-দিক থেকে চেপে বসিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতির আয়তনের মধ্যে স্বচ্ছন্দে তেরোশো পৃথিবীর জায়গা হতে পারে। অথচ বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় মাত্র ৩১৮ গুণ বেশি। বৃহস্পতির ঘনত্ব জলের ১.৩ গুণ, পৃথিবীর ঘনত্ব জলের ৫.৫ গুণ।

বৃহস্পতির ঘন আকাশ জুড়ে রয়েছে প্রধানত দুটি গ্যাস—হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এবং তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণে রয়েছে অ্যামোনিয়া ও বিষাক্ত মিথেন গ্যাস। আপন অক্ষের উপর দ্রুত ঘূর্ণনের ফলে বৃহস্পতির বিরাট গ্যাসীয় মণ্ডলের মধ্যেও বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে। বৃহস্পতির দেহে নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে লাল, নারঙ্গি, হলদে, বাদামি প্রভৃতি নানা রঙের গ্যাসীয় বন্ধনীর ঘুরপাক খাওয়ার মধ্যে দিয়ে আভ্যন্তরীণ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সাক্ষ্যই মিলছে। বাংলাদেশে আমরা কালবোশেখি ঝড়ের মাতলামি দেখেছি, কিন্তু বৃহস্পতির আকাশের ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না।

অনেকের ধারণা ছিল, বৃহস্পতির উজ্জ্বলতা সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করার জন্যে নয়। বৃহস্পতি নিজেই একটি ছোটখাট তারা। আলো ও তাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া তার দেহেও ঘটে চলেছে। কিন্তু এ ধারণার আজ কোন গুরুত্ব নেই, কারণ বৃহস্পতির দেহে যে তাপের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার পরিমাণ হল −২০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস পর্যন্ত তরল অবস্থা লাভ করে বসে। একদল বিজ্ঞানীর মতে বৃহস্পতির গ্যাসীয় মণ্ডল ৮০০০ মাইল বিস্তৃত ; তার তলায় রয়েছে ১৭,০০০ মাইল পুরু বরফের স্তূপ, আর সকলের তলায় হল বৃহস্পতির পাথুরে জমি—যার ব্যাস হল ৮০০০ মাইল। আর একটি মত হল, বৃহস্পতির সবটাই হাইড্রোজেনে ভর্তি আর তার কেন্দ্রে এই হাইড্রোজেন রয়েছে শক্ত কঠিন রূপে। হাইড্রোজেন কঠিন অবস্থা লাভ করে তাপমাত্রা −৪৩৪ ডিগ্রি ফারেনহিটে নেমে এলে।

বৃহস্পতির সবচেয়ে বিচিত্র বস্তু হল তার বিরাট লাল চোখটি, যার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩০,০০০ মাইল এবং প্রস্থে ৭,০০০ মাইল। আমাদের পৃথিবীকে স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে পুরে ফেলা যায়। আরো বিচিত্র ব্যাপার হল, লাল চোখটি বৃহস্পতির উপর দিয়ে দিব্যি

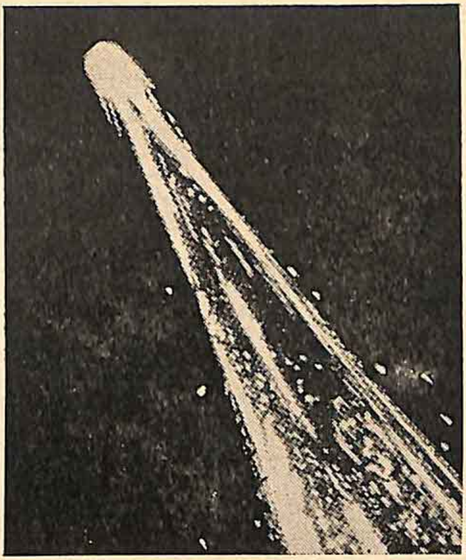
এদিক-ওদিক চলে ফিরে বেড়ায়। গ্রহটির সঙ্গে তার গাঁটছড়া আদৌ বাঁধা রয়েছে কি না, তা বোঝবার উপায় নেই। লাল চোখটি থেকে এবং আরো পাঁচটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বৃহস্পতি প্রচণ্ড জোরালো মাপের বেতার-তরঙ্গ ঝলকে ঝলকে ছুঁড়ে মারে, যার খানিকটা পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। ঐ বেতার-তরঙ্গের শক্তি মেপে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ওর এক ঝলক তৈরি করতে গেলেও বৃহস্পতির উপর দশ সেকেণ্ড ধরে প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে বড় জাতের হাইড্রোজেন বোমা ফাটাতে হবে।

বৃহস্পতির বারোটি চাঁদ, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় চারটি চাঁদ ১৬১০ সালে সর্বপ্রথম গ্যালিলিওর দূরবীনে ধরা পড়েছিল। বড় চারটির মধ্যে আইও এবং ইয়োরোপা পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে সামান্য ছোট, আর গ্যানিমিডে ও ক্যালিস্টো বুধের চেয়েও বড়।

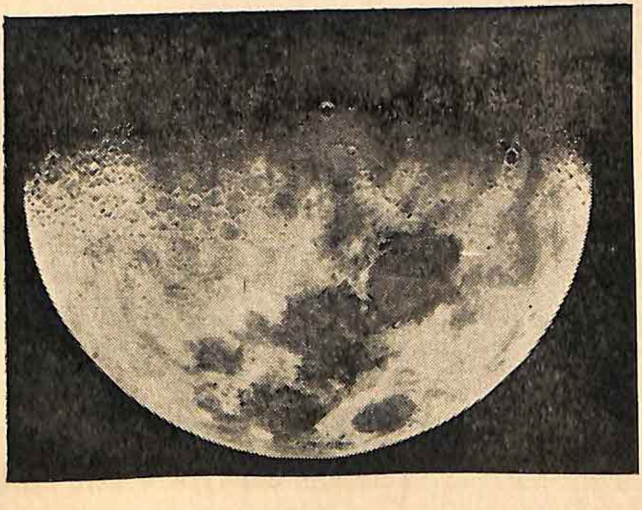
বৃহস্পতির প্রচণ্ড শীতল পরিবেশে কোন জটিল রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ আদৌ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। অতি সাধারণ উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের এলাকা রূপেও বৃহস্পতির পরিচয় আমরা দিতে পারি কি না, সে বিষয়ে এখনো সন্দেহ রয়েছে।

শনি

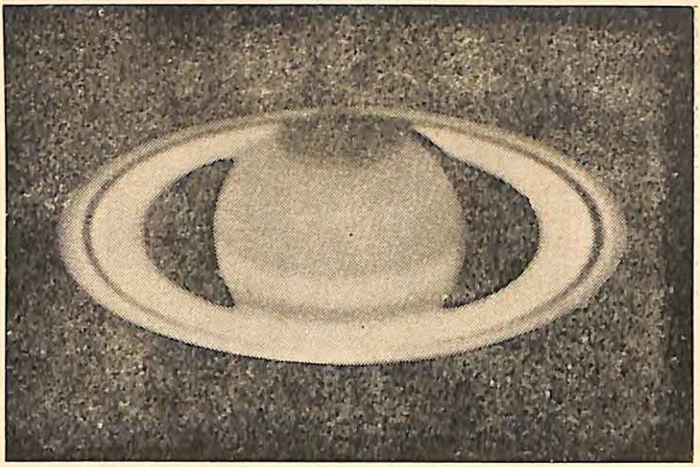
শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৮৮ কোটি ৬১ লক্ষ মাইল এবং সূর্যের চারদিকে একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে এর সময় লাগে ২৯½ বছর। এর ব্যাস ৭৫,১০০ মাইল। আপন অক্ষের উপর দ্রুত ঘূর্ণনের জন্যে বৃহস্পতির মতই এরও দিন ও রাতের পরিমাণ পাঁচ ঘণ্টা করে। শনির আয়তনের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ৭৫০টা পৃথিবীর জায়গা হতে পারে। কিন্তু শনির ভর পৃথিবীর ভরের মাত্র ৯৫ গুণ। শনির ঘনত্ব সৌরজগতের অন্য সব গ্রহদের তুলনায় কম। শনির হালকা গঠনের জন্যে বিজ্ঞানীরা ঠাট্টা করে বলেন, যদি শনিকে ভাসাবার মত



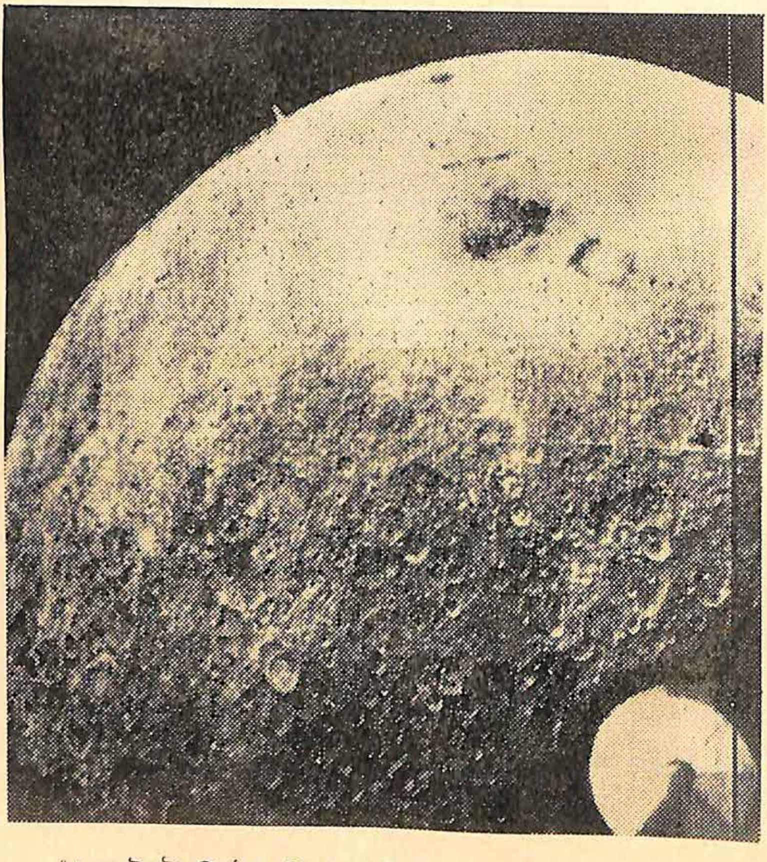
হ্যালির ধূমকেতু। ঝাঁটার মত লম্বা গ্যাসের লেজটা লক্ষ লক্ষ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে।



চাঁদ। কালো রঙের মেরিয়া বা সমুদ্র ও চক্রাকার
আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখা যাচ্ছে।



শনি



চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি। রাশিয়ার স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশন 'জোন্দ্—৩' ১৯৬৫ সালের ২০শে জুলাই চাঁদের প্রায় ৬৫০০ মাইল কাছ থেকে এই ছবিটি তুলে পাঠিয়েছে।

বিরাট একটি সমুদ্র পাওয়া যেত, তাহলে শনি সেখানে কর্কের মত দিব্যি ভেসে থাকত।

শনির আকাশে রয়েছে প্রচুর হাইড্রোজেন, কিছু মিথেন এবং সামান্য পরিমাণ অ্যামোনিয়া। শনির দেহের তাপমাত্রা −২৪০ ডিগ্রি ফারেনহিট। একদল বিজ্ঞানীর অনুমান, শনির গঠন-প্রকৃতি অনেকটা বৃহস্পতির মতই।

শনির সংসারে সবচেয়ে দামি বস্তু হল তার গোল গোল চাকার মত তিনটি বিরাট আংটি। এদের দৌলতে শনির খেতাব হল, 'আকাশের শ্রেষ্ঠ শোভা'। আংটি তিনটির মোট বিস্তৃতি হল ১,৭০,০০০ মাইল, কিন্তু তারা মাত্র দশ মাইল পুরু। দূরবীন ছাড়া খালি চোখে ওদের দেখা পাওয়া মুস্কিল। শনির কোল থেকে শুরু করে তিনটি আংটির বিস্তৃতি হল যথাক্রমে ১০০০০,১৭০০০ ও ৬০০০০ মাইল। এদের পরস্পরের মধ্যে বেশ খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা রয়েছে।

আংটিগুলো কিভাবে তৈরি হল? বিজ্ঞানীদের ধারণা, শনির একটি চাঁদ নিজেকে গড়তে গিয়েও গড়তে পারে নি। তারই সাক্ষ্য হিসেবে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের ক্ষুদে কণার উপর বরফের আস্তরণ, এই হল ওদের গঠন। বহু কোটি বছর আগে ওরা আকারে ছিল অনেক বড়। সেই সময় কোন একদিন ওরা হঠাৎ শনির খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল। শনির ব্যাসার্ধের আড়াই গুণ মাপের যে দূরত্ব তার বাইরে শনির যেকোন চাঁদকেই থাকতে হবে। পৃথিবীর চাঁদকেও থাকতে হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের আড়াই গুণ অর্থাৎ দশ হাজার মাইল দূরে। প্রতিটি গ্রহের বেলাতেও এই এক হিসেব। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এই দূরত্বের মাপকে 'রখের মাত্রা' বলা হয়। এই মাত্রা পেরিয়ে এলেই সেই চাঁদকে শনির দশায় পেয়ে বসবে। বিরাট বিরাট একদল পাথরের খণ্ডের কপালেও বোধহয় তাই লেখা ছিল। শনির একটি চাঁদ

রূপে গড়ে ওঠবার উৎসাহে তাল সামলাতে না পেরে শনির বে-আইনি এলাকার মধ্যে যেই না ঢুকে পড়া, শনির মাধ্যাকর্ষণের টানে তাদের সর্বাঙ্গ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। টুকরোগুলো কিন্তু পালিয়ে যেতে পারল না। শনির আকর্ষণে বন্দী হয়ে তিনটে গোল চাকার মত আংটির রূপ ধরে শনির চারদিকে পাক খেয়ে চলেছে যুগ-যুগান্ত ধরে।

শনির ন-টি চাঁদ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম টাইটান— ব্যাস ৩৫০০ মাইল। সৌরজগতে চাঁদের পরিবারে ইনি স্বচ্ছন্দে বড়দা বলে পরিচিত হতে পারেন। বুধগ্রহের চেয়েও আকারে এটি বড়।

শনির হিমশীতল পরিবেশে কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের বিকাশের সম্ভাবনা নেই বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

ইউরেনাস

মানুষ দীর্ঘদিন খোলা চোখে আকাশে পাঁচটি গ্রহকেই দেখতে পেত। পৃথিবী যে সৌরজগতের একটি গ্রহ, এই ধারণা স্বীকৃত হতেও দীর্ঘদিন সময় লেগেছে। ১৭৮১ সালে জ্যোতির্বিদ হার্শেল দূরবীন যন্ত্রে আকাশে প্রথম একটি গ্রহকে আবিষ্কার করলেন। জেমিনি নক্ষত্রপুঞ্জে সবুজ রঙের একটি বস্তু তাঁর চোখে পড়েছিল, আশেপাশের অন্য তারাদের তুলনায় যাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি প্রথমে বস্তুটিকে একটি লেজবিহীন ধূমকেতু বলে অনুমান করেছিলেন। এটিই পরবর্তীকালে ইউরেনাস নামে পরিচিত হল।

ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ১,৭৮৩,০০০,০০০ মাইল। এর একবার সূর্য-পরিক্রমার সময় ৮৪ বছর। গ্রহটির কক্ষপথের গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র চার মাইল। সূর্যের কেন্দ্র থেকে গ্রহদের দূরত্ব যত বাড়বে, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের

টান তাদের উপর তত কম পরিমাণে অনুভূত হতে থাকবে। সেই কম-জোরালো টানকে কাটানোর জন্যে তাদের কক্ষপথে গতিবেগের পরিমাণও হবে কম।

ইউরেনাসের ব্যাস ২৯,৪০০ মাইল। এর পেটের মধ্যে ৬৫টি পৃথিবীর জায়গা হতে পারে। এর ভর পৃথিবীর ভরের ১৫ গুণ। গ্রহটি গ্যাসীয় উপাদানে পূর্ণ ; এর তাপমাত্রা –৩১০ ডিগ্রি ফারেনহিট। আপন অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে এর সময় লাগে প্রায় এগারো ঘণ্টা। ইউরেনাসের সূর্য-পরিক্রমার ভঙ্গিটা খুবই অদ্ভুত। এ যেন প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। এর একটি মেরুর মুখ সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে ৪৪টি বছর। তখন অন্য মেরু অঞ্চলটায় অন্ধকারের রাজত্ব। পরের ৪৪ বছর অন্য মেরুর মুখটি আবার সূর্যের দিকে ফিরে আসে। ইউরেনাসের পাঁচটি চাঁদ।

নেপচুন

ইউরেনাসের কক্ষপথের চেহারাটা ছিল খানিকটা অস্বাভাবিক। কোন এক রহস্যময় ঘটনার প্রভাবে তার মধ্যে এই বিচ্যুতি ঘটছে বলে অনেকে অনুমান করছিলেন। একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী জ্যোতির্বিদ প্রায় একই সঙ্গে ১৮৪৫ সালে নতুন একটি গ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ভিত্তিতে নিছক কাগজে কলমে মাপজোক কষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ১৮৪৬ সালে আকাশের পূর্ব-নির্দিষ্ট একটি জায়গায় দূরবীন যন্ত্রে নেপচুনের সন্ধান পাওয়া গেল। মানুষের অঙ্ক-বিজ্ঞানের এক বিরাট জয় সেদিন ঘোষিত হল, সন্দেহ নেই।

নেপচুনের ব্যাস ২৮,০০০ মাইল। সৌরজগতের চতুর্থ বৃহত্তম গ্রহ নেপচুন। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ২৭৯,৩০,০০,০০০ মাইল। একবার সূর্য-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে এর সময় লাগে ১৬৫ বছর। গ্রহটির কক্ষপথে গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩½ মাইল। এর তাপমাত্রা

-৩৬০ ডিগ্রি ফারেনহিট। ইউরেনাসের মতই এ গ্যাসীয় উপাদানে পূর্ণ। গঠন-প্রকৃতির বিচারে দুটি গ্রহেরই বৃহস্পতি ও শনির সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে। ঐ দুটি গ্রহের মতই এদের হিমশীতল পরিবেশে কোন জটিল রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়।

নেপচুনের দুটি চাঁদ। একটির নাম ট্রাইটন, ব্যাস ৩৩০০ মাইল। সৌরজগতের অন্য সব চাঁদের তুলনায় ট্রাইটনের ভর অনেক বেশি।

প্লুটো

নেপচুনের আবিষ্কারের পরেও ইউরেনাসের কক্ষপথের সব বিচ্যুতির পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনকি নেপচুনের কক্ষপথেও খানিকটা ব্যতিক্রম ধরা পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, যেন পেছন থেকে কোন একটি রহস্যময় বস্তু এই গ্রহদুটির উপর তার অদৃশ্য প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। শুরু হল এক ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পর্ব। আকাশের যে অংশে ঐ অদৃশ্য বস্তুটির দেখা পাবার কথা, প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তার অজস্র ছবি তোলা হল। তারার দল এত দূরে রয়েছে যে দূরবীন ক্যামেরার ছবিতে তাদের স্থান বদলের ঘটনাটুকু (যাকে লম্বন বা Parallax বলা হয়) আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু সূর্যের কোন গ্রহের স্থানচ্যুতি সেইসব ছবিতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। ফোটোগ্রাফির কলাকৌশল সে যুগে খুব উন্নত পর্যায়ের না থাকার ফলে অদৃশ্য বস্তুটি ধরা দিতে বহু সময় নিয়েছিল। ১৯৩০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি দূরবীন ক্যামেরার ছবির পরিস্ফুটনে ধরা পড়ল প্লুটো—সৌরজগতের সুদূরতম প্রান্তের গ্রহটি। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৩৬৬,৬০,০০,০০০ মাইল। আলোর রশ্মি সূর্য থেকে রওনা হয়ে প্লুটো গ্রহে পৌঁছতে সময় নেয় পাঁচ ঘণ্টা। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে গ্রহটির সময় লাগে ২৪৮ বছর। এর তাপমাত্রা -৪০০ ডিগ্রি ফারেনহিট।

আপন অক্ষের উপর একবার পাক খেতে প্লুটো সময় নেয় প্রায় ৬½ দিন।

প্লুটোর ব্যাস ৩৬০০ মাইল, বুধের চেয়ে পাঁচশো মাইল বড়। আয়তনে এত ক্ষুদ্র হয়েও প্লুটো কিভাবে ঐ দৈত্যের মত চেহারাওয়ালা ইউরেনাস ও নেপচুনের কক্ষপথে বিচ্যুতির সৃষ্টি করছে, এ রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে যে তথ্যটি বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। পৃথিবীর ব্যাস প্লুটোর ব্যাসের দ্বিগুণেরও বেশি, অথচ প্লুটোর ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় দশগুণ। অর্থাৎ এমন এক বিচিত্র জাতের বস্তু দিয়ে প্লুটোর দেহ তৈরি, যার সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই। তবে, ঐ বস্তুটির দেহে গ্যাসীয় উপাদানের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না।

প্লুটোর কক্ষপথের চেহারা এতটাই উপবৃত্তাকার যে অনেকে অনুমান করেন, প্লুটো সুদূর অতীতে আদৌ সূর্যের কোন গ্রহই ছিল না। বরং নেপচুনের একটি চাঁদ হয়ে তার থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি। তবে প্লুটো কিভাবে নেপচুনের আকর্ষণের মায়া কাটালো, তা অঙ্কের সাহায্যেও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে ওঠা যায় না।

এক পরম শীতল, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্লুটোর এই সূর্যপরিক্রমা ; এর মধ্যে একটি বিষাদের ভাব রয়েছে বলে তোমাদের মনে হয় না কি ?

অনেকের ধারণা, প্লুটোর পরেও সৌরজগতে হয়ত আর একটি গ্রহ থাকতে পারে। তবে, বহু অনুসন্ধানের পরেও আজও পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ধূমকেতু

সৌরজগতে অশরীরী প্রেতাত্মার মত কতকগুলো বস্তু আছে, যাদের স্বভাব প্রায় উড়নচণ্ডীর মত। আমরা তাদের নাম দিয়েছি ধূমকেতু। প্রাচীনকালে পৃথিবীর মানুষের কাছে এরা ছিল নিতান্তই

অমঙ্গলের প্রতীক ; যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, মহামারী, বন্যা, সব-কিছুই নাকি এরা আকাশে দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করত। আজ অবশ্য সে-জাতীয় ভয় কেটে গেছে।

কলকাতার আকাশে সাত-আট বছর আগে একটি ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। ধূমকেতুর চেহারার মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র বস্তু হল তার লেজটা। খুব পাতলা গ্যাসের তৈরি বলে মনে হয় সেটাকে। লেজটা বেশ কয়েক লক্ষ মাইল লম্বাও হতে পারে, তবে তার বস্তুর ঘনত্ব খুবই সামান্য। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন, লক্ষ-লক্ষ মাইল লম্বা একটি ধূমকেতুর মধ্যে মোট যে পরিমাণ বস্তু ছড়ানো থাকে, তাকে মাত্র দু-এক মাইল জায়গার মধ্যে দিব্যি ঠেসে জড়ো করে ফেলা যায়। এক বস্তুহীন ভারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ধূমকেতু আপন পথ তৈরি করে চলেছে। সে পথের চেহারাও বিচিত্র। সূর্যের আকর্ষণে তার কাছ-বরাবর এসে তাকে সেলাম ঠুকে ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার পথ রচনা করে পেছোতে পেছোতে প্লুটো গ্রহের কক্ষপথ পেরিয়ে চলে যায় মহাকাশের এক সুদূর অঞ্চলে। অনেকে হয়ত আর কোনদিনই সৌরজগতের এলাকায় ফিরে আসবে না। এভাবে সৌরজগত থেকে বহু ধূমকেতু চিরতরে হারিয়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা। সৌরজগতে ধূমকেতুর মোট সংখ্যা আজও কেউ নির্ণয় করতে পারেন নি। ১৬৮২ সালে জ্যোতির্বিদ হ্যালি আকাশে একটি ধূমকেতু দেখে, আবার কবে সে সূর্যের কাছে ফিরে আসবে তা হিসেব করে বলে দিয়েছিলেন। তাঁর হিসেবে সময়ের মাপটা ছিল ৭৫ বছর। ঠিক ১৭৫৮ সালে ধূমকেতুটি আবার দেখা দিল, সেই থেকে তার নামকরণ হল হ্যালির ধূমকেতু। ঐ ধূমকেতুটি আগেও বহুবার পৃথিবীর আকাশে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার আসা যাওয়ার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছন্দ হ্যালির আগে আর কারো খেয়াল হয় নি। ওর দেখা আমরা আবার পাব ১৯৮৬ সালে।

ধূমকেতুগুলো যখন সূর্যের আকর্ষণে তার কাছে এগিয়ে আসতে

থাকে, তখনই তার ঝাঁটার মত লেজটা বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এরকম ঘটার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধূমকেতুর গঠন নিয়ে প্রশ্ন উঠল। এ বিষয়ে মোটামুটি আমরা যা জানি তা হল এই যে, ধূমকেতুর মাথাটি (যার ব্যাস ১০,০০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে) প্রধানত জমাটবাঁধা মিথেন, অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং জল দিয়ে তৈরি। গ্যাস ও জলের নিচে রয়েছে পাথর এবং ধাতুর খণ্ড। পৃথিবীর আকাশে রোজ যে উল্কাকণারা আছড়ে পড়ে, তারাও ঐ একই উপাদানে তৈরি। সূর্যের কাছাকাছি এসে পৌঁছলে সূর্যের তাপে ধূমকেতুর বরফের স্তূপ বাষ্প হয়ে ছুটে বেড়াতে থাকে। পাথর ও ধাতুর টুকরোগুলো গিয়ে হাজির হয় লেজের দিকটায়। এবারে ধূমকেতুর গায়ে লাগে 'সূর্যের বাতাস'। সৌরদেহজাত প্রোটন কণিকাস্রোতের নাম দেওয়া হয়েছে সূর্যের বাতাস। সেই বাতাসের ঠেলায় ধূমকেতুর পেছন দিকে লেজটা ক্রমেই লম্বাটে হতে থাকে, কিন্তু ঐ লেজের বস্তুর ঘনত্ব এত কম যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে আকাশের তারাগুলোকে দেখা যায়। সূর্যের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যাবার পথে ধূমকেতুর মুড়ো আর লেজটা হয়ে যায় একই দিকে। সূর্যের বাতাসের ঠেলাটা এবার উল্‌টো দিক থেকে লাগছে কিনা, তাই।

ধূমকেতুরা আকাশে এল কোথা থেকে? এ তর্কের শেষ আজও হয় নি। অনেকের মতে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে একটি গ্রহের ধ্বংসাবশেষ যেমন গ্রহাণুরা, তেমনি ঐ গ্রহেরই হালকা কিছু বস্তু থেকে ধূমকেতুরা তৈরি। আবার কেউ বলেন, বড় গ্রহাণুগুলো পরস্পরের মধ্যে ঠোকাঠুকি বাধিয়ে সর্বাঙ্গ চূর্ণ করে ওদের জন্ম দিয়েছে। সবচেয়ে বিচিত্র ধারণাটি হল এই যে, ধূমকেতু তৈরির একটি বেশ বড় কারখানাই নাকি তৈরি হয়ে বসে আছে সূর্য ও তার ঘরের কাছের তারা 'প্রক্সিমা সেণ্টরি'র মধ্যবর্তী মহাকাশের কোন একটি জায়গায়। সংখ্যায় তারা কয়েকশো

কোটিও হতে পারে। তাদের মধ্যে কিছু হয়ত সৌরজগতের প্রায় ধার ঘেঁষে চলেছে, মাঝে-মাঝে হঠাৎ সূর্যের সংসারে দল বেঁধে পাড়ি জমিয়ে বসে। পৃথিবীর কাছে যে দুটি একটি এসে পড়ে, তাদের লেজের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের ছোঁয়া লাগলেই আকাশ জুড়ে উল্কার বর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

সূর্য আর বড় গ্রহগুলোর আকর্ষণেই ধূমকেতুর চলবার পথগুলো সিগারেটের মত লম্বাটে হয়ে বসে আছে। সূর্যের সংসারে যে এত বড় একটা ষড়যন্ত্র জোট পাকিয়ে বসেছিল, তা আগে থেকে জানা থাকলে বেচারা ধূমকেতুর দল বোধহয় আর এ পথই মাড়াত না।

উল্কাপিণ্ড

রাতের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার সময় তারা খসে পড়তে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। আজ আমরা বেশ ভাল করেই জানি, ওরা কেউ তারা নয়। ওরা উল্কাপিণ্ড। মহাকাশের এই সৌখীন ভ্রমণকারীরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। পাথর ও ধাতু দিয়ে তৈরি এদের দেহ। চেহারার মাপে কেউ এক বা দু-মাইল লম্বা হতে পারে, আবার পাথরের নুড়ির মত ক্ষুদ্রও হতে পারে কেউ-কেউ। একেবারে ধুলোকণার মত যাদের দেখতে, তাদের আমরা বলি উল্কাকণা। গ্রহাণু ও উল্কার মধ্যে গঠনের বিচারে বিশেষ কোন তফাত নেই। গ্রহাণুদের বা ধূমকেতুর সঙ্গে একই পথ ধরে এদের অনেকেই চলে। বোঝবার সুবিধের জন্যে, ধাতু ও পাথরের খণ্ডগুলো যতক্ষণ বায়ুমণ্ডলের বাইরে থাকবে ততক্ষণ তাদের বলতে পারি গ্রহাণু, আর তারা বায়ুসমুদ্রে প্রবেশ করলেই নাম দেব উল্কা। পৃথিবীর আকর্ষণে যে উল্কাপিণ্ডেরা ধরা পড়ে, তারা সেকেণ্ডে প্রায় ৪০ মাইল গতি নিয়ে নেমে আসতে থাকে পৃথিবীর দিকে। মাটির ৬০

মাইল উপরেই বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণে তপ্ত হয়ে ওঠে তাদের দেহ এবং আরো কিছুটা পথ নেমে এলেই তারা জ্বলে গিয়ে গ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। যেগুলো মাঝারি আকারের, পৃথিবীর দশ মাইল উপর পর্যন্ত তারা চলে আসতে পারে অনায়াসে। তখন আকাশ-বাতাস-কাঁপানো কানফাটা আওয়াজে চারিদিক ভরে যায়। খুব বড় আকারের যারা, তারাই পৃথিবীর জমি পর্যন্ত নেমে আসে এবং তাদের লক্ষ লক্ষ টন পাথুরে দেহের সজ্ঘাতে পৃথিবীর বুকে যে গভীর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি হয়, তার কিছু-কিছু নমুনা এখনো দেখা যায় নানা জায়গায়। বড় মাপের একটি উল্কা যদি পৃথিবীর কোন বড় শহরের উপর এসে পড়ে, তাহলে কত মানুষ যে মারা যাবে, সহজেই বুঝতে পার। বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবী কতকগুলো উল্কার ঝাঁকের মধ্যে এসে পড়ে। তখন এক-একটি অঞ্চলের আকাশ জুড়ে দিনরাত ধরে চলতে থাকে উল্কার বর্ষণ; রাতের আকাশ উল্কাদের দেহের জ্বলে-ওঠা আলোয় ঝলমলে হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর আকাশে রোজ কত যে উল্কা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার কোন হিসেব নেই। কয়েক শো থেকে কয়েক হাজার কোটি পর্যন্ত যে-কোন সংখ্যাই হতে পারে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, পৃথিবীর দেহে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার থেকে দশ হাজার টন পর্যন্ত উল্কাবস্তুর ধুলোকণা জমা পড়ছে। পৃথিবীর ওজন অবশ্য এর তুলনায় এত বেশি যে, বিরাট সমুদ্রে একবিন্দু জল ঢালবার মত এই ক্রমিকভাবে বাড়তি ওজনটুকুতে তার কোন বিপর্যয় ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

৫

সৌরজগতের জন্মকথা

সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড নিয়ে এই যে বিরাট সৌরজগত, তার খানিকটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা আগের আলোচনার মধ্যে দিয়ে লাভ করলাম। সূর্য তার গ্রহজগতকে নিয়ে হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে ৬২ মাইল গতিবেগে ছুটে চলেছে। সূর্য আবার পার্শ্ববর্তী বেশ কিছু তারার সঙ্গে ছায়াপথের কেন্দ্রের চারপাশে সেকেণ্ডে দুশো মাইল গতিবেগে ঘুরে চলেছে এবং একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে এদের সময় লাগে কুড়ি কোটি বছর। ছায়াপথও ছুটছে, কিন্তু এর গতি কোনদিকে এবং কত তা আমাদের জানা নেই।

সৌরজগতের নিয়মগুলি

এই গ্রহজগতের সৃষ্টি কিভাবে হল, এ প্রশ্ন মানুষের মনে চিরন্তন। এই সৃষ্টি-সংক্রান্ত যেকোন তত্ত্বকেই সৌরজগতের কয়েকটি বিশেষ শৃঙ্খলাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। সেগুলো হল :

(১) গ্রহগুলোর সূর্যপরিক্রমা-পথ উপবৃত্তাকার হলেও, তাদের চেহারা প্রায় বৃত্তের কাছাকাছি।

(২) সৌরজগতের গ্রহগুলো সবাই একই দিকে সূর্যকে পরিক্রমা করে চলেছে—ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার ঠিক উল্টো দিকে গ্রহদের এই গতিপথ। এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হল কয়েকটি ধূমকেতু। কয়েকটিকে বাদ দিয়ে উপগ্রহেরাও প্রায় সবাই গ্রহগুলোর চারদিকে একই ভাবে ঘুরে চলেছে। আপন অক্ষের উপরেও বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহেরা ঠিক একই কায়দায় ঘুরছে, একমাত্র ব্যতিক্রম হল ইউরেনাস, কয়েকটি উপগ্রহ

ও সম্ভবত শুক্র।

(৩) গ্রহগুলোর সূর্যপরিক্রমা-পথ সূর্যের সঙ্গে প্রায় একই সমতলে রয়েছে। ইউরেনাসের উপগ্রহগুলো এবং কয়েকটি ধূমকেতু হল এর ব্যতিক্রম।

(৪) সূর্য থেকে গ্রহগুলোর দূরত্বকে একটি অঙ্কের সূত্রের মধ্যে বেঁধে ফেলা যায়।

(৫) গ্রহগুলোকে দুটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হল, পৃথিবী জাতের গ্রহ; এরা সংখ্যায় চারটি—বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল। অপরটি বৃহস্পতি জাতের গ্রহ। এরাও সংখ্যায় চারটি—বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রহদের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর গ্রহদের ঘনত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রহেরা মূলত গ্যাসীয় উপাদানে ভরা। যদিও এরা আকারে পৃথিবী জাতের গ্রহদের তুলনায় অনেক বড়, কিন্তু এদের গড়পড়তা ঘনত্ব বেশ কম; এ প্রায় জলের ঘনত্বের সমান।

এইসব শৃঙ্খলা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, গ্রহজগতের উৎপত্তি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়। তাছাড়া প্রত্যেকটির উৎপত্তি ভিন্ন-ভিন্ন উপায়ে ঘটেছে বলেও জানা যায় না। বরং তারা একই পরিবারের সদস্যরূপে, একই সময়ে এবং একই জায়গাতে সৃষ্টিলাভ করেছিল।

কৌণিক ভরবেগ

সৌরজগতের উৎপত্তির ব্যাপারটিকে বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব যে জটিল একটি বাধার সামনে এসে হাজির হয়, তা হল কৌণিক ভরবেগ বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। ভরবেগ বা মোমেন্টাম হল একটি বস্তুর ভর ও বেগের গুণফল। লাটিমের মত পাক-খেতে-থাকা একটি বস্তুর ক্ষেত্রে কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ দাঁড়াবে বস্তুটির ভরবেগ, ও যে কেন্দ্রের চারপাশে সে ঘুরপাক খাচ্ছে সেখান থেকে তার দূরত্বের গুণফল। মনে কর, একজন লোক তার দুটো হাতকে ছড়িয়ে

দিয়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। তার হাতদুটো নামিয়ে এনে নিজের গায়ের সঙ্গে এঁটে ধরলে ব্যাপারটি কী দাঁড়াবে? এতে করে লোকটির নিজের চারপাশে ঘুরবার বেগ যাবে বেড়ে। কারণ, পাক খাবার ঘটনাটি ঘটছে যে কেন্দ্রের চারপাশে (এখানে লোকটির নিজের দেহের কেন্দ্র) সেখান থেকে দূরত্বের মাপটা কমলে ঘোরার বেগটাও বেড়ে ওঠে, কারণ কৌণিক ভরবেগের পরিমাণকে দুটো অবস্থাতেই সমান রাখতে হবে। হাতদুটো আবার ছড়িয়ে দিলেই কেন্দ্র থেকে দূরত্বের মাপটা যায় বেড়ে, ঘোরার বেগটাও তাই সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে।

সৌরজগতে অন্যান্য গ্রহগুলোর তুলনায় সূর্যের ভর বহুগুণ বেশি। কাজেই সূর্যের কৌণিক ভরবেগের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবার কথা। এর ফলে সূর্যের নিজের অক্ষের চারপাশে ২৭ দিনে একবার না ঘুরে ১২ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসা উচিত।

সূর্যকে বাদ দিয়ে সৌরজগতের অন্যান্য বাসিন্দাদের মোট ভর হল সূর্যের ভরের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। অথচ সৌরজগতের কৌণিক ভরবেগের শতকরা ৯৮ ভাগই রয়েছে ঐসব বস্তুর মধ্যে। সূর্য জোগায় মাত্র শতকরা দু-ভাগ।

কাণ্ট-লাপ্লাস তত্ত্ব

১৭৫৫ সালে সৌরজগতের উৎপত্তির প্রথম তত্ত্ব পেশ করেছিলেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট। ১৭৯৬ সালে জ্যোতির্বিদ লাপ্লাস এককভাবে কাজ করে ঐ তত্ত্বটিকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলে-ছিলেন। কাণ্ট-লাপ্লাস তত্ত্বের মূল কথাটা হল এই: সৌরজগত সৃষ্টির কাজটা শুরু হয়েছিল একটি ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে। সমগ্র মেঘটা আপন কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছিল। ঘুরবার সময়ে ওর দেহে সঙ্কোচন ঘটতে শুরু হল। চেহারার মাপটা যত কমবে, ঘোরার বেগ তত বাড়বে। ঘোরার বেগটা যখন একটি বিশেষ মাত্রায়

এসে পৌঁছল, ধুলো ও গ্যাসের মেঘটার নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে আংটির মত এক বস্তুপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে এল। কিছু বস্তুভার কমে যাওয়ার ফলে ভরবেগের পরিমাণটাও কমে আসার কথা। ফলে ঐ মেঘের চরকিবাজির মত পাক খাওয়ার বেগটাও খানিকটা মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। কিন্তু মেঘটার দেহে আবার সঙ্কোচন ঘটল, গতিবেগও বেড়ে উঠল এবং আংটির মাপের আর খানিকটা বস্তু ছিটকে বেরিয়ে এল। এভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চরকিবাজির মত পাক খেতে থাকা ঐ মেঘটা আংটির মাপের অনেকগুলো বস্তুপিণ্ড তৈরি করে বসল। ঐ বস্তুগুলোই কালক্রমে ঘনীভূত হয়ে আজকের গ্রহের রূপ পেয়েছে।

সূর্যের ঘরে চুরি

'গ্রহজগতের' উৎপত্তির ব্যাপারে যে তত্ত্বটি একদিন খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেটি হল এই, হঠাৎ একদিন এক বিরাট তারা ছুটতে ছুটতে আমাদের সূর্যের ঘরের কাছে এসে পড়ে। যতই সে এগিয়ে আসে ততই তার মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্যের দেহ থেকে একটা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ড ঠেলে উঠতে শুরু করে। তারাটা সূর্যের ঘাড়ে না পড়ে প্রায় তার নাকের ডগা ছুঁয়ে বেরিয়ে চলে যায়। কিন্তু যাবার সময় এক হ্যাঁচকা টানে সূর্যের দেহ থেকে ঠেলে ওঠা জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডটাকে দিল ঘরছাড়া করে। সেই লম্বাটে গ্যাসীয় বস্তুটা সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। তারপর জায়গায় জায়গায় গ্যাসীয় বস্তুগুলোর মধ্যে দানা বাঁধবার কাজ চালু হয়। কালক্রমে এগুলোই গ্রহের রূপ নিয়েছে। ইংরেজ বিজ্ঞানী জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ এ মতের একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন।

এই তত্ত্বও কিন্তু ধোপে টিকল না। কুমোরের চাক তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। সেই চাকটার উপর যখন মাটি বেশি পরিমাণে থাকে, তখন সেটা ঘোরে ধীরে ধীরে। কিন্তু কুমোর যত সেখান থেকে

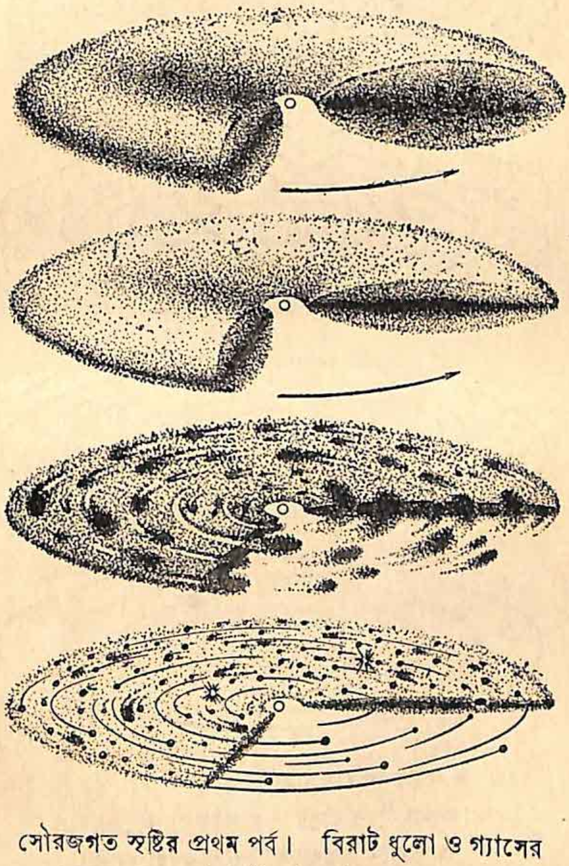
মাটি সরিয়ে ফেলতে থাকে, তার ঘোরবার বেগটাও বেড়ে ওঠে না কি ? কাজেই আগন্তুক তারার টানে সূর্য থেকে অত বড় এক খাবলা গ্যাস বেরিয়ে এল, আর সূর্যদেব এক প্রলয় নাচের আসর জাঁকিয়ে তুললেন না, এ কেমন করে মানা যায় !

গ্রহজগতের জন্ম

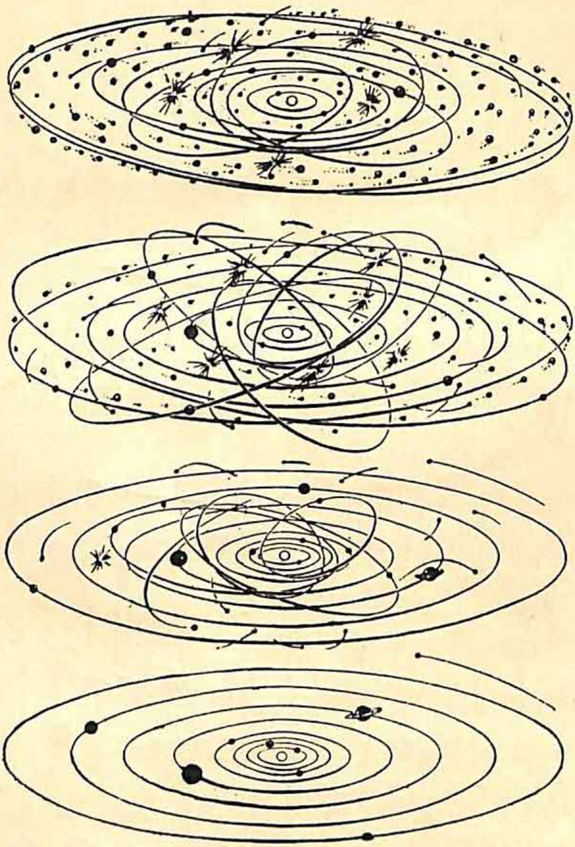
সৌরজগতের উৎপত্তির ব্যাপারে বর্তমানে ছুটি মতের পক্ষে বিশেষভাবে সমর্থন পাওয়া যায়। একটির প্রবক্তা জার্মান বিজ্ঞানী ভাইজ্‌স্যাকার, অপরটির প্রবক্তা রুশ বিজ্ঞানী অটো স্মিথ। তাঁরা ছু-জনেই একটি ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে গ্রহদের উৎপত্তি হয়েছে বলে মেনে নিচ্ছেন। আমরা অটো স্মিথের বক্তব্য দিয়েই সৌরজগতের জন্ম-ইতিহাস বোঝবার চেষ্টা করব। কারণ সৌরজগতের কৌণিক ভরবেগের ব্যাপারে যে গরমিল রয়েছে তার একটি সঠিক ব্যাখ্যা স্মিথের তত্ত্বই দিতে পেরেছে অনেকটা।

সৌরজগতের উৎপত্তি ঠিক কবে হয়েছিল, এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে, পাঁচশো কোটি বছর আগেই ঘটনাটি ঘটেছিল বলে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর ধারণা। সৌরজগতের উৎপত্তির সঙ্গে অবশ্য মহাবিশ্বের উৎপত্তির ঘটনাটিও জড়িয়ে আছে। তবে সে আলোচনায় আমরা পরে আসব।

সৌরজগত গড়ে উঠেছিল একটি ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে। এই মেঘের আদি বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল কিভাবে, সে প্রশ্নের অবশ্য কোন জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। গঠনপর্বের কাজটি ছু-রকম-ভাবে শুরু হয়ে থাকতে পারে। সূর্য নিজে যখন গড়ে উঠছিল, তখন ধুলো ও গ্যাসের একটি মেঘ হয়ত তার কাছেই ছিল। অথবা সূর্য নিজের গড়ার কাজ সম্পূর্ণ করে মহাকাশ-পথে একটি বিরাট ধুলো ও গ্যাসের মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে ঐ মেঘের বেশ বড় একটি অংশকে নিজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আসতে ভোলে নি।



সৌরজগত সৃষ্টির প্রথম পর্ব। বিরাট ধুলো ও গ্যাসের মেঘের মধ্যে দানা বাঁধবার কাজ শুরু হয়েছে।



সৌরজগত সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্ব। ধুলো ও গ্যাসের ছোট বড়
দানাগুলো ধীরে ধীরে এক জায়গায় জড়ো হয়ে
কালক্রমে গ্রহগুলো তৈরি করে তুলল।

ঐ মেঘের মধ্যে ধুলো ও গ্যাসের কণা ছিল প্রচুর সংখ্যায়। তাদের মধ্যে শুরু হল ঠোকাঠুকি এবং ছোট-ছোট দানা বাঁধবার কাজ। এই দানা পাকিয়ে তোলবার কাজে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বল বেশ বড় একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গ্রহগুলো বর্তমানে সূর্যের চারদিকে যেভাবে ঘুরছে ঐ ধুলো ও গ্যাসের মেঘটাও গোড়া থেকেই সেভাবে ঘুরছিল। যতটা জায়গা নিয়ে ঘুরছিল সে জায়গায় কেন্দ্রের দিকে ভারি ধুলোকণাগুলো গিয়ে জড় হচ্ছিল, আর হালকা গ্যাসের কণাগুলো ছিল ধারের দিকে। ছোট-ছোট ধুলো ও গ্যাসের দানাগুলো এক জায়গায় জড় হয়ে হয়ে ক্ষুদে গ্রহগুলোর আকার ভারি করে তুলছিল। কালক্রমে এই গড়ার কাজ অনেক দূর এগিয়ে এসে তৈরি করল কতগুলো বস্তু ও গ্যাসের পিণ্ড। বস্তু ছিল পিণ্ডগুলোর কেন্দ্রে আর হালকা গ্যাস তার চারদিকে গড়ে তুলছিল আবহমণ্ডল। একেবারে গোড়ার দিকে আজকের গ্রহগুলোর চেহারা ছিল আরো অনেক বড়। সেই আদিম কালের আমাদের এ পৃথিবীর দেহে হয়ত জড় হয়েছিল আজকের তুলনায় এক হাজার গুণ বেশি বস্তু।

সূর্যের বিকিরণের চাপে গ্রহগুলোর আদি আবহমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্যাসীয় উপাদানই পালিয়ে গিয়ে থাকবে। যে গ্রহগুলোর ভর ছিল কম, মাধ্যাকর্ষণের দুর্বল টানে হালকা গ্যাস তারা ধরে রাখতে পারে নি। বড় আকারের গ্রহগুলো অবশ্য তাদের আকর্ষণের টানে বেশির ভাগ আবহমণ্ডলকে ধরে রাখতে পেরেছিল।

আদি মেঘের ধুলো ও গ্যাসের মধ্যে ছিল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু। গ্রহ গড়ার কাজ শুরু হয় এক পরম শীতল পরিবেশের মধ্যে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ (যারা সব সময় বিকিরণের আকারে ক্ষয় পাচ্ছে) গ্রহগুলোর কেন্দ্রে ক্রমে ক্রমে জড় হয়ে তাদের ভিতরকার তাপকে একদিন বাড়িয়ে তুলেছিল। গ্রহজগতের গড়ে ওঠার কাজ সম্পূর্ণ হতে মোট দশ কোটি বছর সময় লেগে থাকবে হয়ত।

উপরের তত্ত্ব-অনুযায়ী গ্রহগুলোর কৌণিক ভরবেগ গড়ে ওঠার কাজ শুরু হয়েছিল আদি মেঘের ধুলো ও গ্যাসীয় কণাদের জড় হওয়ার মধ্য দিয়েই। এই জড় হওয়ার কাজ যত এগুচ্ছিল, ততই ভরবেগের পরিমাণও বেড়ে উঠছিল। গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে আজ যেভাবে ঘুরছে, তাও পেয়েছিল ঐ মেঘের ঘূর্ণনের কাছ থেকেই। গ্রহগুলো তৈরি হবার সময় তাদের চারপাশে ছোট ছোট কতগুলো ধুলো ও গ্যাসের চক্রও দানা বাঁধতে শুরু করে। এরাই কালক্রমে আজকের উপগ্রহগুলো গড়ে তুলেছে।

প্রাণস্থষ্টির মূলে

সৌরজগত কিভাবে গড়ে উঠেছিল, সে ধারণা আমরা মোটামুটি পেলাম। সৌরজগতে ন-টি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে, আর কোন গ্রহে কেন আদৌ তা ঘটল না, এ প্রশ্ন সহজেই আমাদের মনে জাগতে পারে। জটিল বা বুদ্ধিমান প্রাণীজগত গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্যে একটি গ্রহকে কতকগুলো বিশেষ অবস্থা মানতে হয়। প্রথমত, যে সৌরজগতের সে বাসিন্দা সেই সূর্যের খুব কাছে যাবার যেমন তার অধিকার নেই, তেমনি অনেক দূরেও নিশ্চয়ই তার যাওয়া চলবে না। প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে কোন জটিল রাসায়নিক পদার্থ গড়ে উঠতে পারে না, যেমন আমাদের সৌরজগতে বুধ গ্রহটির ক্ষেত্রে ঘটেছে। আবার প্রচণ্ড শীতল পরিবেশেও জটিল রাসায়নিক পদার্থের মিলনে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ বা প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এই ধরনের একটি ছবি আমরা বৃহস্পতি ও বিরাট আকারের অন্য গ্রহগুলোর বেলায় দেখতে পাই। পৃথিবী সূর্য থেকে একটি নির্দিষ্ট মাপের আলো এবং তাপের ঢেউ প্রতিনিয়ত লাভ করে চলেছে। এর ফলে জটিল প্রাণ-সৃষ্টির একটি পরিবেশ সেখানে একদিন গড়ে উঠতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, গ্রহজগতের কেন্দ্রে থাকবে একটিমাত্র তারা। যুগল তারা থাকা সেখানে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। দুটি তারা থাকলে তাদের চারপাশে গ্রহটির কক্ষপথ হবে খুবই জটিল। তাছাড়া তারাদুটির আলো এবং তাপের ঢেউ নির্দিষ্ট হারে গ্রহটিতে এসে পৌঁছবে না। কখনো তার মাত্রা কমবে, কখনো আবার খুব বেড়ে উঠবে। এ ধরনের একটি পরিবেশ জটিল প্রাণসৃষ্টির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

তৃতীয়ত, প্রাণসৃষ্টির ব্যাপারে একটি গ্রহের চেহারা আকারে ও আয়তনে খুব ছোট বা বড় হওয়া কোনটিই বাঞ্ছনীয় নয়। বুধ গ্রহটির ভর খুবই কম। সে অনুপাতে তার মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণও কম। ফলে সে তার বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারে নি। বৃহস্পতি বা শনির মত বিরাট আকারের গ্রহ জোরালো মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে তাদের বায়ুমণ্ডলের সমস্ত গ্যাসীয় উপাদান ধরে রেখে দিতে পেরেছিল। ফলে, এমনকি হাইড্রোজেনের মত খুব হালকা গ্যাসও তাদের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে নি। ঐ গ্যাসটি কার্বন ও নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিথেন ও অ্যামোনিয়ার মত কতগুলো গ্যাস তৈরি করে তুলেছে, উন্নত জীবের বিকাশের পক্ষে যারা খুবই ক্ষতিকারক।

পৃথিবী উপরের সবকটি শর্ত সুষ্ঠুভাবে পালন করে চলছে। আর তারই ফলে পৃথিবীতে উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ এবং প্রাণীর সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্ভব হতে পেরেছিল। সৌরজগতে জটিল প্রাণসৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আরো দুটি গ্রহে, এরা হল শুক্র ও মঙ্গল। বর্তমানে অবশ্য তাদের পরিবেশ এ ব্যাপারে যথেষ্ট অনুকূল নয়।

মহাবিশ্বে আমাদের মত গ্রহজগত আরো রয়েছে কি না এবং সেখানে পৃথিবীর মত এমন একটি গ্রহের সন্ধান পাওয়া যাবে কি না যার বুকে মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। সে আলোচনা শুরু করবার আগে এই বিরাট মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিভাবে হল, তা বলছি।

বিরাট এ মহাবিশ্ব

এই মহাবিশ্বে তারাজগতের মোট সংখ্যা কত, তা জানবার কোন উপায় নেই। আলোর দূরবীনের সাহায্যে এপর্যন্ত প্রায় একশো কোটি তারাজগতকে গোনা সম্ভব হয়েছে। কয়েকজন জ্যোতির্বিদ হিসেব করে বলেছেন, সবচেয়ে জোরালো আলোর দূরবীনের নাগালের মধ্যে প্রায় একলক্ষ কোটি তারাজগত থাকার সম্ভাবনা। এ তো হল—যে সব তারাজগত আমাদের দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে তাদের কথা। রেডিও দূরবীন একদিন আমাদের কাছে আরো বহু তারাজগতের সন্ধান এনে দেবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের আলো ও রেডিও দূরবীনের নাগালের বাইরে যে কত তারাজগত রয়ে গেল, তাদের সংখ্যা অনুমান করে ওঠাও অসম্ভব ব্যাপার। দূরবীনের কাছে ধরা দিয়েছে এবং আজও ধরা দেয় নি, সেই অসংখ্য কোটি তারাজগতের সমবায়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এই মহাবিশ্ব। সকলেরই জানতে ইচ্ছে করে কবে এবং কেমন করে এই মহাবিশ্বের চাকাটা গড়িয়েছিল। নাটকের প্রথম অঙ্কটাই বা শুরু হয়েছিল কোথায়, আর শেষের অঙ্কেই বা কী লেখা রয়েছে।

মহাবিশ্বের সৃষ্টির ব্যাপারে দুটি তত্ত্বকথাকে ঘিরে জ্যোতির্বিদদের যত তর্কের ধূম। তার একটি হল বিবর্তনতত্ত্ব (Theory of the Evolving Universe), অপরটি হল স্থিতাবস্থাশীল তত্ত্ব (Steady State Theory of the Universe)। প্রথম তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন জর্জ লেমেইতার ও গ্যামো। দ্বিতীয় তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন হয়েল, গোল্ড এবং বণ্ডি।

মহাডিম্বের তত্ত্ব

প্রথম তত্ত্ব-মতে আজ থেকে একহাজার কোটি বছর (আড়াই

হাজার কোটি বছরও হতে পারে) আগে মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তু এবং শক্তি এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিল। এই বস্তুপিণ্ডটির নাম দেওয়া হয়েছে মহাডিম্ব (Cosmic egg) বা প্রাথমিক পরমাণু।

কিন্তু ঐ প্রাথমিক বস্তু ও শক্তি কোথা থেকে এল, তাদের সৃষ্টিই বা কিভাবে হয়েছিল এবং সবাই এক জায়গাতেই বা হঠাৎ জড়ো হল কেন, এ সব প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

আমরা বস্তু বলছি বটে, কিন্তু ঐ মহাডিম্বের সবটাই খুব সম্ভবত ছিল শক্তি বা বিকিরণের আকারে (যেমন—আলো, বেগনিপারের আলো, গামারশ্মি ইত্যাদি)। খুবই ঘনসন্নিবদ্ধ অবস্থায় থাকা ঐ বিকিরণ-পুঞ্জের ভিতরের তাপ দাঁড়িয়েছিল কয়েক কোটি ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায়। ঐ প্রচণ্ড তাপে কোন বস্তু আদৌ গড়ে ওঠাই সম্ভব ছিল না, এমনকি গ্যাস রূপেও নয়। পরমাণু গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে জোরালো গামারশ্মির সঙ্ঘাতে সেগুলো খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে পড়ত।

শক্তির ঐ গোলকটির ব্যাস ছিল হয়ত ১৭০ কোটি মাইল। এক বিপুল পরিমাণ চাপের পরিবেশের মধ্যে থাকার ফলে ঐ শক্তিজোটের ঘনত্ব ছিল এত বেশি যে, তার প্রতি ঘন-ইঞ্চির পরিমাণ ক্ষেত্রের ওজন দাঁড়িয়েছিল প্রায় দশ কোটি টন। সামান্য শক্তির ওজন কিভাবে এত বেশি হতে পারে ভাবতে গিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছ!

শক্তিরূপী ঐ মহাডিম্ব কতদিন ধরে একই অবস্থায় ছিল, তা কারোর জানা নেই। হঠাৎ একদিন তার মাঝে বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিপুল শক্তি তাদের বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে চারদিকে ছুটে পালাতে শুরু করল। ঐ বিস্ফোরণ থেকেই নাকি জন্ম নিয়েছিল মহাবিশ্ব। বিস্ফোরণের ঠিক পাঁচ মিনিট পরে মহাবিশ্বের তাপ এসে দাঁড়িয়েছিল ১০০ কোটি ডিগ্রি

ফারেনহিটে। তাপ কমে আসার ফলে বিভিন্ন বস্তুর পরমাণুর গড়ে ওঠা সম্ভব হল। সবচেয়ে সরল মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনের পরমাণুই গড়ে উঠেছিল সকলের আগে। তারপরে গড়ে উঠল একে একে হিলিয়াম, লিথিয়াম ও অন্যান্য হালকা জাতের মৌলিক পদার্থের পরমাণু। তাপমাত্রা আরও কমে এলে ভারি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টিও সম্ভব হয়ে উঠল। মহাবিশ্ব সৃষ্টির আধ ঘন্টার মধ্যেই হালকা এবং ভারি—সব জাতের মৌলিক পদার্থেরাই গড়ে উঠেছিল। তবে, তাদের পরমাণুর সবটাই ছিল গ্যাস রূপে।

মহাডিম্বের মাঝে বিস্ফোরণ ঘটার পর দীর্ঘ তিনকোটি বছর ধরে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের ছুটে চলার মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের চেহারাটাও প্রসারিত হতে থাকল। ভিতরের জমা তাপের মাত্রা দাঁড়াল গড়পড়তায় আশি ডিগ্রি ফারেনহিটে। তারপর একদিন ভারি মৌলিক পদার্থের গ্যাসীয় পরমাণুগুলো জড়ো হয়ে কঠিন বস্তুর ধুলোকণার রূপ নিয়ে বসল। বিরাট আকারের ধুলো আর গ্যাসের মেঘে ধীরে ধীরে সমস্ত মহাবিশ্বটা ভরে উঠল। চারদিকে ছিল শুধু শীতলতা, আর ছিল সীমাহীন অন্ধকার। আলো ছিল না কোথাও। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধুলো আর গ্যাসের বিরাট মেঘগুলো শুধু বাইরের দিকে চলেছিল ছুটে।

এরপর প্রায় ২৫ কোটি বছর ধরে একটি নতুন ধরনের ঘটনা ঘটতে শুরু করে। গ্যাসের মেঘের রাজ্যে একদিন আরম্ভ হল নিজেদের চারপাশে চরকিবাজির মত পাক খাওয়ার কাজ। আর তারই ফাঁকে চারপাশে ছড়ানো ধুলোর মেঘগুলোকে শুষে নিয়ে তারা নিজেদের আয়তনকে বাড়িয়ে চলল। যে বিরাট বিরাট ধুলো আর গ্যাসের মেঘগুলো এভাবে গড়ে উঠল, তা আবার ভেঙে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা বহু আবর্তের সৃষ্টি করল। ঐ মেঘগুলোর এক একটির দৈর্ঘ্য ছিল হয়ত কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ আলো-বছরের।

যত দিন যায়, মহাবিশ্বের সর্বত্র এ-জাতীয় অসংখ্য ধুলো আর গ্যাসের চক্র গজিয়ে উঠতে থাকে। আর চারপাশের ধুলোর মেঘ-গুলোকে গ্রাস করে তাদের ঘনত্বও বেড়ে চলে। ঘনত্ব বাড়ার ফলে মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাবে বিভিন্ন চক্রের মধ্যে আলো আর গ্যাসীয় বস্তু আরো অনেক ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে আসে। এভাবে চাপ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঠাণ্ডা বস্তুপিণ্ড একদিন আবার তপ্ত হয়ে ওঠে। আরো কিছুদিন পরে তারা চারদিকে আলো ছড়াতে থাকে। অন্ধকার দূর হয়ে মহাবিশ্ব আবার আলোয় ভরে ওঠে।

ঘনত্ব ও চাপ বাড়তে বাড়তে একদিন ঐসব আলো ও গ্যাসের চক্রের কেন্দ্রে তাপের পরিমাণ যখন দু-কোটি ডিগ্রি ফারেনহিটে এসে পৌঁছল, তখন তারা জ্বলন্ত বস্তুতে পরিণত হয়ে আলো বিকিরণ করতে লাগল। তারাদের জন্ম এভাবেই হয়েছিল একদিন। আর তৈরি-হতে-থাকা বহু তারার বস্তু নিয়ে আলো আর গ্যাসের এক-একটি বিরাট মেঘে আলাদা আলাদা তারাজগত রূপে গড়ে উঠেছিল।

তারাজগতের ওই যে বাইরের দিকে ছুটে চলা কাজ তা আজও চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। এ সব বিষয় নিয়ে আমরা আগেই বলেছি। মহাবিশ্ব এভাবে যত প্রসারিত হয়ে চলবে, তার বস্তু ও শক্তিও ততই ছড়িয়ে পড়বে বাইরের দিকে। ফলে তাদের পরিমাণ হয়ে উঠবে সূক্ষ্ম থেকে আরো সূক্ষ্ম। তারপর একদিন সব শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে মহাবিশ্বের মৃত্যু ঘটবে।

মহাবিশ্বের অপরিবর্তনশীলতা

মহাবিশ্বের শোকাবহ পরিণতির ছবি আমরা যে তত্ত্বে পেলাম, তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একটি ধারণাকে উপস্থিত করলেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। এই তত্ত্বের মূল কথাটা হল, এই মহাবিশ্বের কোন আদি

নেই, কোন অন্ত নেই। মহাবিশ্ব চিরকাল ধরে রয়েছে, চিরকাল ধরে থাকবে—এ যেন এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। মহাবিশ্বে সময় এবং ক্ষেত্র, দুইই অনন্ত। প্রসারণের ফলে মহাবিশ্বের তারাজগতেরা অনন্ত ক্ষেত্রের মাঝে একদিন হারিয়ে যাবে। অপরদিকে আবার মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেনের পরমাণু প্রতিনিয়ত মহাকাশ জুড়ে তৈরি হয়ে চলেছে অসংখ্য পরিমাণে। তাদের সমবায়ে গড়ে উঠবে আবার নতুন তারাজগত। দূরে মিলিয়ে যাওয়া তারাজগতের স্থান গ্রহণ করবে এরা। ফলে মহাবিশ্বের চেহারাটা মোটামুটি একই রকম থাকছে। এ অতীতেও যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমনি রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও একই রূপে থাকবে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী এক অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটছে। এই তত্ত্বের কিছু কিছু কথা দুর্বোধ্য ঠেকলেও সাধারণ মানুষের মনের কাছে এর আবেদন বেশি। মহাবিশ্বের যে মৃত্যু নেই, জন্ম ও মৃত্যু দুটোই তার ক্ষেত্রে সমান সত্য —এটা আমাদের কাছে খুব সান্ত্বনার কথা নয় কি?

দুটি তত্ত্বের মধ্যে কোনটি বেশি খাঁটি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচারে আজও তার সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়নি।

প্রাণের উৎপত্তি

সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবীর বুকে জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভব কেন সম্ভব হয়েছিল, সে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবে, প্রথম প্রাণসৃষ্টির অধ্যায়টি নিয়ে আজ বহু তর্ক রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে অনুমান করেন, পৃথিবীতে এককোষী প্রাণের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় তিনশো কোটি বছর আগে। সেদিনের পৃথিবীর অবস্থা আজকের পৃথিবীর চেয়ে একেবারেই অন্যরকম ছিল। সেদিনকার সে পৃথিবীর আকাশে তখনো মুক্ত অবস্থায় অক্সিজেন তৈরি হয় নি। সেখানে ছিল অ্যামোনিয়া,

কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং মিথেন-জাতীয় গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। প্রাণসৃষ্টির পক্ষে ঐ পরিমণ্ডলটি যে খুবই মারাত্মক ও প্রতিকূল ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের মণ্ডলটি তখনো তৈরি হয় নি। ফলে সূর্যদেহজাত বেগুনিপারের আলো বা আলট্রা-ভায়োলেট রে তাদের প্রাথমিক মারাত্মক চরিত্র নিয়ে পৃথিবীর মাটি ও সমুদ্রের উপর এসে আছড়ে পড়ছিল। বায়ুর ঐ ওজোন মণ্ডলের জন্যেই আজ তা এভাবে আর ঢুকে পড়তে পারে না। তাছাড়া সমুদ্রের জলে মিশে ছিল নানা অজৈব লবণ-জাতীয় পদার্থ। বায়ুমণ্ডলের মিথেন, অ্যামোনিয়া গ্যাস, সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট (বেগনিপারের) আলো, সবাই মিলে সমুদ্রে এক রাসায়নিক কারখানা বানিয়ে বসেছিল। সেই কারখানার চালক ছিলেন স্বয়ং প্রকৃতি।

ঐ সাগরের কারখানায় একদিন সৃষ্টি হল অ্যামাইনো অ্যাসিড। প্রাণের মূল উপাদান আমিষ-জাতীয় অণু অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেই গড়ে উঠেছে। আরো বহু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একদিন জন্ম নিল প্রথম এককোষী প্রাণ। এ পরীক্ষাটির পেছনেও কিন্তু কোন পরিকল্পনা ছিল না। খামখেয়ালি প্রকৃতির এ ছিল যেন আর এক নতুন খেলা। সেই প্রথম এককোষী প্রাণ তিনশো কোটি বছরের বিবর্তনের ধারাপথ বেয়ে আজকের জটিল প্রাণী মানুষে এসে পৌঁছেছে।

মানুষের দেহের একটি মূল উপাদান হল কার্বন। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অজস্র যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলার ক্ষমতায় কার্বন অদ্বিতীয়। কার্বন-ভিত্তিক জীবনের বিকাশ শক্তি ও কয়েকটি উপাদানের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ; এসব হল নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো এবং তাপ, অক্সিজেন ও জল। উদ্ভিদজগত অক্সিজেনের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। উদ্ভিদ মানুষের কাছ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড

গ্যাস গ্রহণ করে নিয়ে বায়ুমণ্ডলে এই উপাদানটির পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখার ব্যবস্থা করে। তা না হলে পৃথিবীতে জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভব অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

মহাবিশ্বে প্রাণের সন্ধানে

সৌরজগতের মধ্যে অনেকগুলো নিয়ম-শৃঙ্খলার সন্ধান আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, সৌরজগতের উদ্ভব একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং একে প্রকৃতির একটি নিয়ম বলেই ধরে নিতে হবে। এই বিরাট মহাবিশ্বের একটি তারা হল সূর্য। এরকম আরো কত তারা যে এখানে রয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ হার্লো স্যাপ্‌লির মতে এই সংখ্যা খুব কম করে হবে ১-এর পর ২০টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা দাঁড়ায় ঠিক তাই। পৃথিবীর সব মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা দিনরাত যদি গুণেই চলে, তাহলে ঐ সংখ্যাটি গুণে উঠতে তাদের চারশো বছর সময় লাগবে। একবার ভেবে দেখ ব্যাপারটা! আর এ হল সবচেয়ে ছোট হিসেব। মোট তারার সংখ্যা অবশ্য এর চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।

স্যাপ্‌লি অনুমান করছেন, এই বিপুল-সংখ্যক তারার মধ্যে হয়ত হাজারে একটির সূর্যের মত গ্রহজগত রয়েছে। একটি তারার চার-পাশে যে গ্রহজগত রয়েছে, তা জানবার উপায় কী? উপায় হল, তারাটির আপন অক্ষের উপর পাক খাওয়ার বেগের পরিমাপ করা। এ গতি যদি কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে এর মূলে রয়েছে গ্রহদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব।

তাহলে যে অগণিত গ্রহজগতের সন্ধান আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে কটি গ্রহের তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলের গঠন প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল? স্যাপ্‌লির মতে, প্রতি হাজারে একটি মাত্র। এভাবে হিসেব করেও

আমরা দেখতে পাই যে, প্রায় দশ কোটি গ্রহে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হতে পারে। পৃথিবীতে বিবর্তনের যে ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সেই একই ধারায় হয়ত এর মধ্যে বহু গ্রহে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। মানুষের মত বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান এর মধ্যে যে পাব না, জোর গলায় নিশ্চয়ই তা বলা যায় না। কার্বনের জায়গায় হয়ত মৌলিক পদার্থ সিলিকন বা সালফারকে (গন্ধক) ভিত্তি করেও জটিল প্রাণীদেহ গড়ে উঠতে পারে। বিবর্তনের একটিমাত্র পথের সঙ্গেই পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়। এ জাতীয় বা এর চেয়ে উন্নত ধরনের বিবর্তনের পরীক্ষা অন্য কোন তারার জগতে যে হয় নি, তেমন কথা বলা যায় না। তাহলে মহাবিশ্বের সেইসব গ্রহজগতে হয়ত বিচিত্রদেহধারী জটিল বুদ্ধিমান প্রাণীরা বসবাস করছে। তাদের কারোর চেহারা হয়ত ছোট গাছের মত—সবুজ ক্লোরোফিল দিয়ে ঢাকা। কারোর চেহারা হয়ত বলের মত গোল। আমাদের তুলনায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংখ্যা কারোর ক্ষেত্রে বেশিও হতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে আমাদের জীবদেহটাই যে সবচেয়ে নিখুঁত একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। বরং এই দেহযন্ত্রটার গঠনের মাঝে জীববিজ্ঞানীরা অনেক ত্রুটির সন্ধান পাচ্ছেন।

মহাবিশ্বে আমাদের সঙ্গী ঐ বুদ্ধিমান প্রাণীদের কারো ক্ষেত্রে অক্সিজেন হয়ত বিষ। তারা হয়ত বাস করে সম্পূর্ণ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভরা একটি বায়ুমণ্ডলে, আমাদের পক্ষে যা হবে মারাত্মক। কারোর জীবদেহ হয়ত আমাদের তুলনায় অনেক বেশি তাপ ধারণে সক্ষম। বিবর্তনের সিঁড়িতে যারা আগে চড়েছে বুদ্ধিবৃত্তির মাপে তারা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেকগুণ এগিয়ে রয়েছে।

সূর্যের সবচেয়ে ঘরের কাছের তারাগুলোর মধ্যে দুটির গ্রহজগত রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। তারাদুটির নাম

টাউ সেটি ও এপ্‌সিলোন এরিডানি। সূর্য থেকে এদের দূরত্ব হল যথাক্রমে ১১·২ ও ১০·৭ আলো-বছর। আমেরিকার গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দিরে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ একটি রেডিও দূরবীনের সাহায্যে তারাদুটির দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের মস্তবড় আশা, ঐ তারাদুটির চারপাশে ঘুরতে থাকা কোন একটি গ্রহে হয়ত বুদ্ধিমান প্রাণী রয়েছে। ওরাও হয়ত অন্য গ্রহজগতের বুদ্ধিমান প্রাণীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে খুবই উৎসুক। কিন্তু যোগাযোগ ঘটবে কিভাবে? পরস্পরের ভাষা জানা নেই। কাজেই বেতারে কথা পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, ঐ বুদ্ধিমান প্রাণীরা যোগাযোগের জন্যে বেছে নিতে পারে দুটি বেতার-সঙ্কেতকে। একটি হল মহাকাশে অজস্র পরিমাণে ছড়ানো হাইড্রোজেন পরমাণুর কম্পনসংখ্যা (যা হল ১৪২০ মেগাসাইক্‌ল্; এক মেগাসাইক্‌ল্ হল দশলক্ষ সাইক্‌ল্) বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকে (যা হল ২১ সেন্টিমিটার; পাশাপাশি দুটি ঢেউয়ের উপরের বা নিচের দুটি মাথার মধ্যেকার দূরত্বকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)। অপরটি হল এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কের যে-কোন একটি সংখ্যাকে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মহাবিশ্বে অন্য যেখানেই সভ্যতা গড়ে উঠুক না কেন, সকলের ক্ষেত্রে অঙ্কের এই সংখ্যাগুলো থাকবে একই। কাজেই অপর আর-একটি সভ্য প্রাণীজগতের কাছে নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানাবার সবচেয়ে সহজবোধ্য ও সর্বপরিচিত মাধ্যম হবে এই দুটি অঙ্কের সংখ্যা ও হাইড্রোজেনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

মহাকাশ থেকে কত অজস্র বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। রেডিও দূরবীন যদি ঐ জাতীয় দুটি বেতার-সঙ্কেতকে একদিন আবিষ্কার করে বসে—বিজ্ঞানীদের তাই এত প্রচেষ্টা। কিন্তু টাউ সেটি বা এপ্‌সিলোন এরিডানির গ্রহজগত থেকে এক বিপুল দূরত্বকে পাড়ি জমাতে গিয়ে ঐ বেতার-সঙ্কেতের সময়ই লেগে যাবে ১১·২ ও ১০·৭ বছর, যেহেতু বেতার-ঢেউ আলোর

মতই সমান বেগে দৌড়োয়। সেই সঙ্কেতকে গ্রহণ করে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আবার যে জবাব পাঠাবেন, তা পৌঁছোতেও ঐ একই সময় লাগবে। একবার যোগাযোগ ঘটতেই ২১ থেকে ২২ বছর সময় লেগে যাচ্ছে। তুমি ভাবতে পার, সব ব্যাপারটাই নিছক পাগলামি। তাই বলে কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। কোনদিন হয়ত সত্যি-সত্যি আমাদের বিজ্ঞানীরা মহাকাশে আর একটি বুদ্ধিমান গ্রহজগত আবিষ্কার করে বসবেন। মহাবিশ্বে মানুষই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী—একথাটা আজও বলতে পারছি। সেদিন কিন্তু তা আর পারা যাবে না। এ মহাবিশ্বে মানুষ নিঃসঙ্গ নয়, সুদূর লোকে হলেও তার সঙ্গী বুদ্ধিমান প্রাণী কোথাও রয়েছে—এ আবিষ্কার পৃথিবীর মানুষের কাছে এক পরম সান্ত্বনার বাণীই বয়ে আনবে, সন্দেহ নেই।

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি মানুষের বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ঐদিন রুশ দেশের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে মহাকাশে একটি বস্তুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বস্তুটির নাম তাঁরা দিয়েছিলেন— 'ইস্কুত্‌ভেনি স্পুৎনিকি জেমলি'। অর্থাৎ পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী। চাঁদ হল পৃথিবীর স্বাভাবিক সহযাত্রী। চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই বস্তুটিকে ছোটানো হয়েছিল, তাই এ হল কৃত্রিম সহযাত্রী। ছোট্ট একটি নামে এটি পরিচিত হল—স্পুৎনিক।

প্রথম স্পুৎনিক মহাকাশে পাড়ি জমানোর পর রুশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত দুশোর চেয়েও বেশি স্পুৎনিক মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে। স্পুৎনিককে মহাকাশে বয়ে নিয়ে যাবার বাহকের কাজ করছে যে বস্তুটি, সে হল রকেট। স্পুৎনিকগুলো ছিল উড়ন্ত গবেষণাগার। এদের ভিতরে বিজ্ঞানীরা বোঝাই করে দিয়েছিলেন নানা ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি; তারা তাদের কলকাঠির নাড়াচাড়ায় পৃথিবী, সূর্য ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশের প্রাণঘাতী রশ্মিদের প্রাথমিক চরিত্র সম্বন্ধে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং সেগুলো বেতার-ঢেউয়ের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের গবেষণা-মন্দিরে ফেরত পাঠিয়েছে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে আজ সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্ত উন্মুক্ত হতে চলেছে।

মহাকাশ

পৃথিবীকে ঘিরে প্রায় ২৫০ মাইলব্যাপী একটি বায়ুমণ্ডলের আবরণ রয়েছে, যার মূল উপাদান হল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। পৃথিবীর

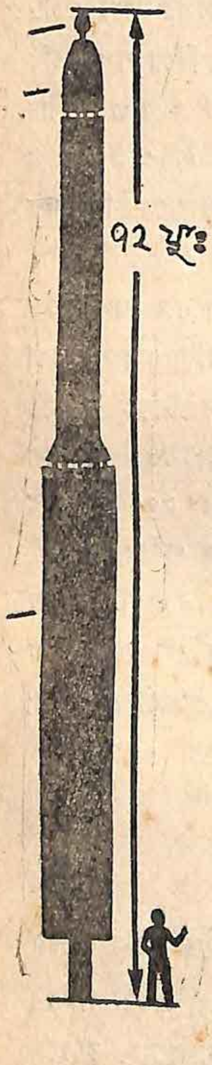
জমি ছেড়ে যত উপরের দিকে ওঠা যাবে, এই বায়ুর চাপ ও ঘনত্ব ততই কমে আসবে। মাত্র চার মাইল উপরেই বাতাস এত হালকা হয়ে আসে যে কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া মানুষের বাঁচবার কোন উপায় থাকে না। পৃথিবীর উপরে পনের থেকে কুড়ি মাইলের মধ্যে একটি ওজোন গ্যাসের মণ্ডল রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পথ তৈরি করতে গিয়ে সূর্যদেহজাত বেগনিপারের আলো ও অন্যান্য রশ্মির যেটুকু প্রাণঘাতী চরিত্র অবশিষ্ট থাকে, তাদের ঐ ওজোনমণ্ডল শোষণ করে নেয়। এর উপর থেকেই মানবদেহের পক্ষে বিপদের এলাকা শুরু হল।

পৃথিবী ছেড়ে যত দূরে যাওয়া যাবে, ভর দিনের বেলাতেও আকাশের রঙ তত কালচে হয়ে আসবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সাতরঙা সূর্যের আলোর ছ-টা রঙকে শুষে নিয়ে নীল রঙটাকে ছড়িয়ে দেয়, তাই আকাশের রঙ আমরা নীল দেখি। উপর আকাশে বায়ুর অল্প ঘনত্বের জন্যে এ ব্যাপারটি আর ঘটবে না। ২৫০ মাইলের বাইরেও বায়ুর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তবে তার পরিমাণ খুবই সামান্য। আমাদের বোঝবার সুবিধের জন্যে বায়ুহীন সমগ্র অঞ্চলটার নাম দেব মহাকাশ। (ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে এই অঞ্চলটিকে বোঝাতে গিয়ে আকাশ ও মহাকাশ দুটো কথাকেই ব্যবহার করা হয়েছে)।

রকেটের কথা

মহাকাশে পাড়ি জমানোর যান হল রকেট। ছবিতে তিন স্তরের একটি রকেটকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেন তেতলা একটি বাড়ি। রকেটটি লম্বায় ৭২ ফুট। একেবারে মাথায় চাপানো রয়েছে স্পুৎনিক। ঐখানেই ছিল পৃথিবীর মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশ-কক্ষ। রকেটের সমগ্র ওজনের শতকরা ৯৫ ভাগ থাকে তার প্রথম স্তরে বা

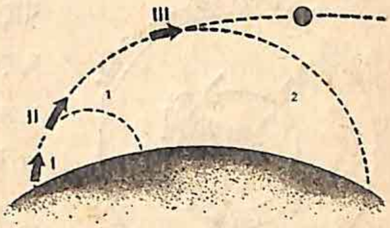
একতলায়। সেখানে বিভিন্ন আধারে রয়েছে তরল জ্বালানি (কেরোসিন, ডাইমেথাইল হাইড্রোজেন, তরল অ্যামোনিয়া-জাতীয় বস্তুকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়) ও অক্সিজেন। দুটি



জিনিসকে রকেটের একতলার দহন কাজ চালানোর ঘরে পাঠানো হল। শুরু হল দুয়ের মধ্যে জ্বলুনি আর পুড়ুনি। জন্মাতে লাগল রাশি-রাশি গ্যাস আর জন্মের পরই বেরিয়ে আসতে শুরু করল পেছনের ছিদ্র-পথটা দিয়ে। নিউটনের গতিবিজ্ঞানের প্রথম নিয়ম অনুযায়ী একদিকে একটি ধাক্কার সৃষ্টি হলে বিপরীত দিকে একটি সমপরিমাণ প্রতি-ধাক্কার সৃষ্টি হবে। প্রতিধাক্কার ফলে সমস্ত রকেটটি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে শুরু করবে।

রকেট দেড় মিনিট বাদে পৃথিবী থেকে যখন ৪০ মাইল দূরে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন একতলার জ্বালানি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ। কাজেই তার অকেজো খোলটাকে আর বয়ে নিয়ে যাবার দরকার নেই। প্যারাশুটের সাহায্যে সেটাকে ফেলে দেওয়া হয় সমুদ্রের জলে। রকেট এখন ছুটছে ঘণ্টায় চার হাজার মাইল গতিবেগ নিয়ে। রকেটের দোতলার এঞ্জিনকে এবারে চালু করা হল। সেখানকার তরল জ্বালানি ও অক্সিজেনের মধ্যে দহন-কাজ শুরু হল। রকেটের চলবার পথটা আগে ছিল সোজা উপরের দিকে। তাকে এখন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাঁকানো শুরু হল। আরো দেড় মিনিট পরে পৃথিবী থেকে

১১০ মাইল উচ্চতায় রকেটের দোতলার জ্বালানি যখন নিঃশেষ হল, তখন তার গতিবেগ তৈরি হয়েছে ঘণ্টায় ১১০০০ মাইল এবং চলবার পথটা পৃথিবীর বাঁকা পিঠের সমান্তরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রকেটের দোতলার খোলটাও খসে পড়ল। তেতলার দহনকাজের ঘরে এবারে কাজ শুরু হবে।



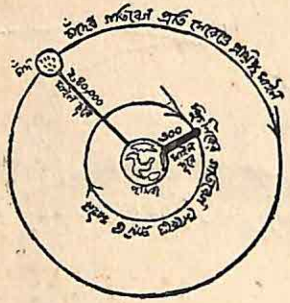
পৃথিবীর ৩০০ মাইল উচ্চতায় তেতলার জ্বালানি যখন নিঃশেষ হল, তার সে খোলটাও নিচে খসে গিয়ে বাকি রইল শুধু স্পুৎনিক। তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে এখন ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বা সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল। হিসেব করে দেখা গেছে, এক সের ওজনের একটি বস্তুকে ৩০০ মাইল দূরে পাঠানোর জন্যে জ্বালানির প্রয়োজন হয় প্রায় ২৫ মণ। তার মানে, আমাদের মধ্যে যাঁরা আয়তনে বেশ মোটা, তাঁরা মহাকাশে যাবার ছাড়পত্র কোনদিন পাবেন কি না সন্দেহ। তাঁদের জন্যে বেশি জ্বালানি অনর্থক খরচা হয়ে যাবে।

পৃথিবী-পরিক্রমা

ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইলের সম্মুখগতি নিয়ে স্পুৎনিকের সোজা মহাকাশের ভিতর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা ঘটবে না। মহাকাশে পাড়ি জমানোর সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বল বা ফোর্স তার ঘাড়ে চেপে বসবে। সে হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিচুটান। দুটি বলের টানা-পোড়েন যদি সমান সমান হয়, তাহলে স্পুৎনিক মাঝামাঝি একটা পথ ধরে পৃথিবীর বাঁকা পিঠের সমান্তরাল ভাবে চারদিকে ক্রমাগতভাবে ঘুরেই চলবে।

নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছনোর পর যদি দেখা গেল যে স্পুৎনিকের সম্মুখগতি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের নিচুটানকে কাটাতে পারছে না,

তাহলে সে খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসতে থাকবে এবং বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরে এসে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পৃথিবী থেকে যতদূরে যাওয়া যাবে, মাধ্যাকর্ষণের টানের জোর ততই কমে আসবে। চাঁদ রয়েছে পৃথিবী থেকে ২,৪০,০০০ মাইল দূরে। অত দূরে পৃথিবীর মাধ্যা-কর্ষণের কম-জোরালো টানকে কাটানোর জন্যে চাঁদের সম্মুখগতি হল ঘণ্টায় মাত্র ১৮০০ মাইল।



সৌরলোকে অতিথি

ঘণ্টায় ১৮০০ মাইল গতিবেগকে বলা হয় প্রথম মহাজাগতিক গতিবেগ। এই গতির সাহায্যে একটি বস্তু পৃথিবীর চারদিকে ক্রমাগত ঘুরেই চলবে। ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বা সেকেণ্ডে সাত মাইলের দ্বিতীয় মহাজাগতিক গতিবেগ যদি একটি বস্তুর দেহে আরোপ করা যায়, তাহলে সে আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে ধরা দেবে না।

১৯৫৯ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে রুশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে একটি রকেটকে ছুঁড়লেন ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল গতি-বেগে। রকেটটি ৩৬ ঘণ্টা বাদে চাঁদের পাশ কাটিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হল সৌরলোকে। মানুষের হাতে গড়া এই গ্রহটি সূর্যের নটা গ্রহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি নতুন গ্রহ রূপে সূর্যকে পরিক্রমা করে চলল, পৃথিবী ও মঙ্গলের সূর্যপরিক্রমা-পথের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে। এরপর আমেরিকান বিজ্ঞানীরা আরো দুটি কৃত্রিম গ্রহকে সৌরলোকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, পৃথিবী ও শুক্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

মানুষের জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আছে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষের জীবনের উপর তার নিজের হাতে গড়া গ্রহগুলোর প্রভাব কী দাঁড়াবে, সেটাও এখন তাঁদের বিচার করে দেখতে হবে।

চাঁদে রকেট

১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর রুশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে একটি মহাজাগতিক রকেটকে ছুঁড়লেন ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে। ৩৬ ঘণ্টা বাদে সে গিয়ে আছড়ে পড়ল চাঁদের জমির উপরে। কাজটা কিন্তু সহজে করা যায় নি। পৃথিবী ঘণ্টায় ৬৬০০০ মাইল গতিবেগে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। চাঁদও ঘণ্টায় প্রায় দু-হাজার-মাইল বেগে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কাজেই পৃথিবী থেকে রকেট ছুঁড়ে চাঁদকে আঘাত করা, একটি চলন্ত মোটরগাড়ির উপর দাঁড়িয়ে একটি উড়ন্ত পাখিকে গুলি করে মারার মত। নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে আধ ডিগ্রি মাত্র সরে গেলে রকেট চাঁদের জমির চার কি পাঁচ হাজার মাইল পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে চলে যেত। সমগ্র রকেটটিকে বীজাণুমুক্ত করে পাঠানো হয়েছিল, যাতে পৃথিবীর কোন বীজাণু চাঁদের দেশে পৌঁছে সেখানকার বীজাণুদের জীবনে কোন বিপর্যয় না ঘটিয়ে বসে।

রুশ বিজ্ঞানীদের রকেটের সাহায্যে চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তোলা ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের চাঁদের দৃশ্য পিঠের ছবি তোলার কথা আগেই বলেছি।

মহাকাশে মানুষ

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে মহাকাশে পাড়ি জমালেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ, রুশ নাগরিক ইউরি গ্যাগারিন। তিনি

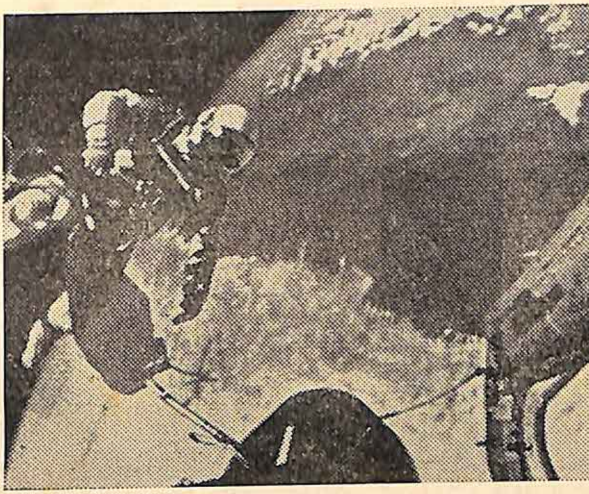
ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল গতিবেগে ৮৯ মিনিটে সমগ্র পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করে নিরাপদে স্বদেশ ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। তাঁর মহাকাশ-যান ভোস্তকের ওজন ছিল সাড়ে চার টন এবং কক্ষপথের চেহারা ছিল উপবৃত্তাকার। কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের দূরত্ব বা অপভূ ছিল ১১৩ মাইল ও সর্বোচ্চ দূরত্ব বা অনুভূ ছিল ২০৫ মাইল।

যাত্রার পাঁচ ছ-মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছনোর পর গ্যাগারিনের মহাকাশ-যানের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে আসে। মুহূর্তের মধ্যে গ্যাগারিন এক আশ্চর্য অনুভূতি উপলব্ধি করেন। তাঁর শরীরটা যেন পালকের চেয়েও হালকা হয়ে এসেছে। শরীরের কোন ওজনই আর তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মহাকাশ-যান কি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের এলাকার বাইরে এসে পৌঁছল? ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। পৃথিবীর যে দূরত্বে গ্যাগারিন পৌঁছেছেন, সেখানে মাধ্যাকর্ষণের নিচুটান হয়ত শতকরা মাত্র পাঁচভাগ কমেছে। বাকি অংশটা থেকেও কোন কারিকুরি খাটাতে পারছে না। কারণ সেই নিচুটানকে কাটিয়ে দিচ্ছে আর একটি বল,—মহাকাশ-যানের ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইলের সম্মুখগতি বা ছুট।

টান ও ছুট—দুটি বল একে অপরের প্রভাব নাকচ করার ফলে মহাকাশ-যান পৃথিবীর জমির সমান্তরাল পথে, সেই জমিকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ক্রমাগত তার চারধারে ঘুরেই চলবে। অবাধে পতনশীল যে-কোন বস্তুরই ওজনের কোন অনুভূতি থাকে না, তাই মহাকাশ-যানের সঙ্গে তার যাত্রী গ্যাগারিন ও আভ্যন্তরীণ সর্ববিধ বস্তু আপন আপন ওজনকে হারিয়ে বসবে। ঠিক একই কারণে আগে যতগুলো স্পুৎনিক ছোঁড়া হয়েছে, তারা সবাই ছিল ওজনবিহীন।

ওজনবিহীন অবস্থায় কী বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। পৃথিবীর মত স্বাভাবিক

আমেরিকান মহাকাশযাত্রী হোয়াইট মহাকাশে বিচরণ করছেন।

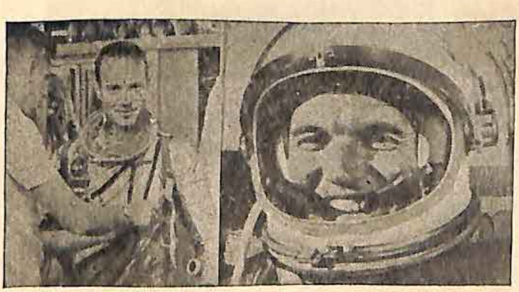


কয়েকজন রুশ মহাকাশযাত্রী



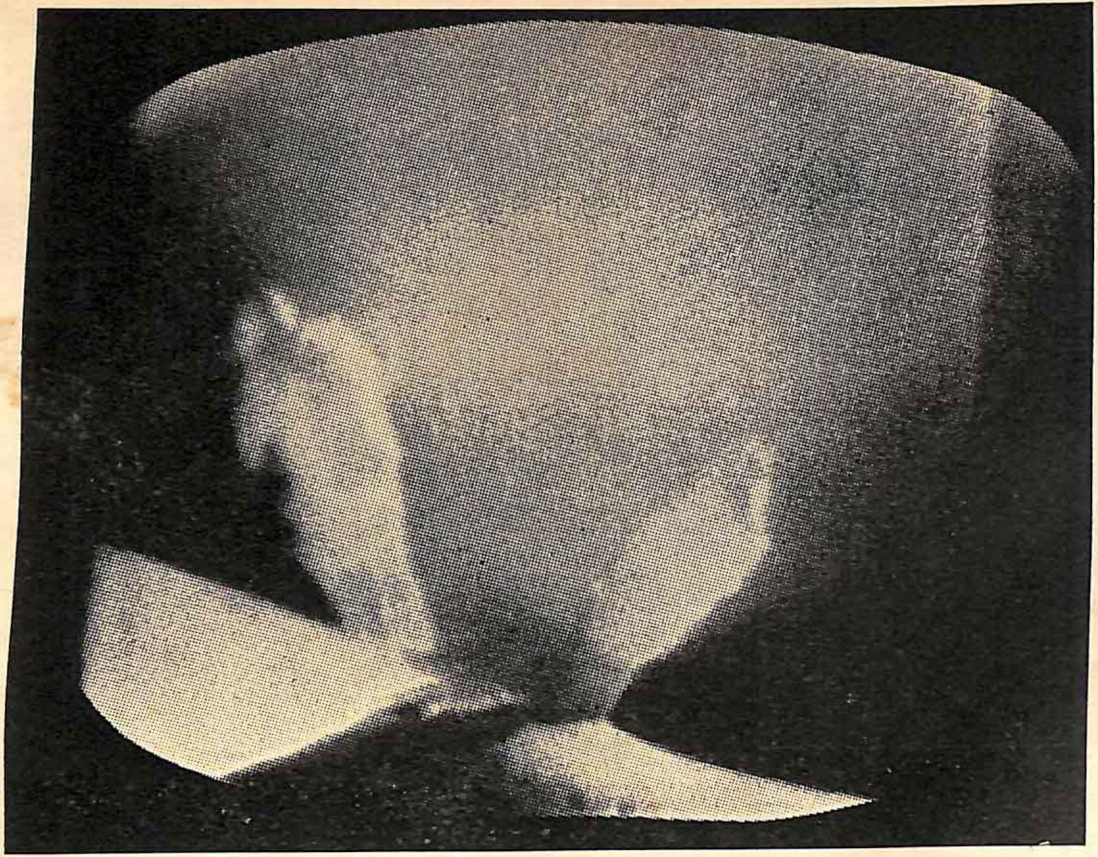
গ্যাগারিন তিতফ্ পপোভিচ্

কয়েকজন আমেরিকান মহাকাশযাত্রী





কার্পেণ্টার কুপার স্কীরা



রুশ মহাকাশযাত্রী লিওনভ্ মহাকাশে বিচরণ করছেন।

ভাবে জল বা খাবার গ্রহণের কোন উপায় থাকবে না। নিচুটান নেই, ফলে গ্লাস-ভর্তি জল উপুড় করে ধরলেও একফোঁটা জল গলা দিয়ে গড়াবে না। উপায় কী? ছোট ছেলের মত বোতলে পুরে চুষে খাওয়া বা খড় দিয়ে টেনে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্লেটের খাবার হাত বা চামচের ঠেলায় ছিটকে বেরিয়ে জাড্য বা ইনার্শিয়ার ঝোঁকে ছুটতে ছুটতে ঘরের দেয়ালে বা ছাদে গিয়ে আটকে থাকতে পারে। খাবার জিনিসকে তরল করে নিয়ে বোতলে পুরে মহাকাশ-যাত্রীদের খাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ওজনবিহীন শরীরটা যেখানে সেখানে ভেসে যাবার রাস্তা বন্ধ করার জন্যে গ্যাগারিন বেল্ট দিয়ে বসবার আসনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। তবে, মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্যে তিনি যে গা-হাত-পা ভাসিয়ে তাঁর ছোট ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ান নি, এমন নয়। ওজনবিহীন অবস্থার বিচিত্র অনুভূতিগুলোর সঙ্গে পরিচয় অবশ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাঁর পূর্বেও অনেকবারই ঘটেছে।

স্বয়ংক্রিয় জগত

মহাকাশ-যান ভোস্তকের বাইরের অঞ্চলটাকে প্রায় মহাকাশ বললেই চলে। সেখানে সূর্যদেহজাত বিভিন্ন রশ্মি ও মহাজাগতিক রশ্মি তাদের প্রাণঘাতী চরিত্রকে ছড়িয়ে রেখেছে। ওই রশ্মিদের সঙ্গে সরাসরি সজ্ঘাতে মানব দেহের সমস্ত জীবকোষের মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে এবং মৃত্যুকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে আসবে। ভোস্তকের ধাতব দেহ কতটা পুরু বা কী উপাদানে তৈরি হলে ঐসব রশ্মির তীব্রতা সম্পূর্ণ কাটানো যায়, ইতিপূর্বে কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীকে মহাকাশ-যানে পাঠিয়ে তার বিস্তারিত তথ্য রুশ বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন। তাই গ্যাগারিনের দৈহিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। গ্যাগারিনের মহাকাশ-কক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন ও বায়ুর চাপও সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

মহাকাশের বুকে পৃথিবী

গ্যাগারিন প্রথম মানুষের চোখ দিয়ে দেখলেন পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি চেহারা। তাঁর চারদিকে মহাকাশের রঙ ছিল নিকষ কালো। পৃথিবীর পাহাড়, বন ও দ্বীপগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দিগন্তের কাছে দিন ও রাতের সঙ্গমস্থলে রামধনুর সাত রঙ যেন হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। বায়ুহীন, শব্দহীন মহাকাশের বুকে কী অতল-স্পর্শী স্তব্ধতা! নক্ষত্রগুলোকে মনে হচ্ছিল অনেক বেশি উজ্জ্বল। সূর্যের আলোকে আড়াল করার জন্যে পৃথিবীর দেহের কালো ছায়াটা মহাকাশের বুকে ৮,৬০,০০০ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে। পৃথিবীকে পরিক্রমার সময় এই ছায়ার মধ্যে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভোস্তকের জীবনে নেমে আসছিল ঘোর অমানিশার কালো রাত্রি। গ্যাগারিনের মহাকাশ জীবনে দিন রাত্রির পরিমাণ ছিল মাত্র ৯০টি মিনিট। তারই মধ্যে তিনি দেখেছেন একটি সূর্যোদয় ও একটি সূর্যাস্ত।

গ্যাগারিনের পর গত চার বছরে এ পর্যন্ত মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছেন এগারজন রুশ ও বারজন আমেরিকান মহাকাশযাত্রী। মহাকাশে এপর্যন্ত সবচেয়ে সুদীর্ঘ সময় যাপন করেছেন রুশ মহাকাশ-যাত্রী ভ্যালেরি বিকভস্কি। তাঁর মহাকাশ চারণের সময়ের পরিমাণ ছিল ১২০ ঘণ্টা। তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন ৮২ বার। ৮২টি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে এবং তিনি মোট পথ অতিক্রম করেছেন ২০,৬০,০০০ মাইল। অপর একটি মহাকাশ-যানে একই সময়ে বিকভস্কির সঙ্গিনী ছিলেন ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা, পৃথিবীর প্রথম মহিলা মহাকাশ-যাত্রী। ইনি মহাকাশে সময় যাপন করেছিলেন ৭১ ঘণ্টা।

চাঁদে অভিযান

মহাকাশ অভিযানের পরবর্তী অধ্যায়ের লক্ষ্যস্থল হল চাঁদ। রাশিয়া এবং আমেরিকা দুই দেশেই সে অভিযানের তোড়-জোড়

আজ শুরু হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আগামী ১৯৭০ সালের মধ্যেই মানুষ চাঁদের জমিতে অবতরণ করবে।

এই স্বপ্নকে কাজে রূপ দেবার জন্যে একদল বিজ্ঞানী একটি চমৎকার পরিকল্পনার কথা ভাবছিলেন। তাঁদের মতে পৃথিবী থেকে সরাসরি চাঁদের দেশে না গিয়ে পৃথিবীর হাজার খানেক মাইল দূরে একটি মহাকাশ স্টেশন তৈরি করা যেতে পারে। এই স্টেশন তৈরির সব মাল মশলা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন রকেটের ঘাড়ে চাপিয়ে ঐ অঞ্চলে তুলে আনা হবে। তারপর বিজ্ঞানীরা সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে মহাকাশে একটি বাড়ি তৈরি করে বসবেন। সেখানে বসে চাঁদের দেশে যাবার রকেট তৈরির কাজে যদি হাত দেওয়া যায়, তাহলে পৃথিবীতে যে সমস্যাগুলো বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—যেমন ওজনের সমস্যা, বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে রকেটের ঘর্ষণে সৃষ্ট তাপের সমস্যা এবং অনেক বেশি গতি তৈরির সমস্যা (মহাকাশ স্টেশনের ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইলের গতিটা তো হাতেই রয়েছে) আর নাকি মাথা তুলে দাঁড়াবে না। পৃথিবী থেকে মাত্র হাজার মাইল পথ পাড়ি জমিয়েই চাঁদের দেশে যাবার বারো আনা সমস্যার সমাধান এভাবে হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে অবশ্য সরাসরি চাঁদে যাবার কথাই ভাবা হচ্ছে। প্রথমবারে পৃথিবী থেকে একটি মহাজাগতিক রকেট চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে তার স্পুৎনিক হয়ে চারপাশে ঘুরতে থাকবে। সেই স্পুৎনিক থেকে চাঁদের জমিতে নামিয়ে আনা হবে ছোট একটি যন্ত্রকে, বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন 'বাগ্' বা ছারপোকা। সেই বস্তুটির পেটে ঠাসা রয়েছে নানাবিধ যন্ত্র। যন্ত্রপাতি-সমেত ওটিকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে বেতারের সাহায্যে চাঁদের জমির বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাবেন। যন্ত্রগুলোও চাঁদ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে বেতার-ঢেউয়ের মাধ্যমে আবার

বিজ্ঞানীদের কাছে ফেরত পাঠাবে। সেই তথ্যগুলো বিজ্ঞানীদের চাঁদে নামার পরিকল্পনাকে আরো নিখুঁত করে তুলবে।

চাঁদে নামার পর

তারপর একদিন মানুষ চাঁদের জমিতে এসে নামবে। রকেটের ভিতর থেকে চাঁদের জমিতে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হবে, সে এক অতলস্পর্শী নিস্তব্ধতার রাজত্বে এসে পৌঁছল। একফোঁটা বাতাস নেই কোথাও, তাই টুঁ শব্দটিও শোনা যাবে না। চারদিকে কোথাও একফোঁটা জল, এতটুকু সবুজের চিহ্ন বা প্রাণের নিদর্শন তার চোখে পড়বে না। সে শুধু দেখবে চারদিকে ছড়ানো রয়েছে কতকগুলো বুড়ো পাথরের দল। একটা মরা জগতে এসে সে পৌঁছেছে।

চাঁদের আকাশের রঙ নিকষ কালো। বাতাসের আবরণ নেই বলে মহাকাশের সমস্ত প্রাণঘাতী রশ্মি সরাসরি চাঁদের জমি পর্যন্ত নেমে আসবে। এদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মহাকাশের উপযোগী পোশাক পরে নিয়ে তবেই মানুষ চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে। তারপর রয়েছে উল্কাদের সমস্যা,—এদের ছোট একটি টুকরোর সঙ্গে সঙ্ঘাত সৃষ্টি হলেও পোশাক ফুটো হয়ে সমস্ত অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে একটি মানুষ মুহূর্তের মধ্যে মারা পড়তে পারে। চাঁদের জমির উপর বিজ্ঞানীরা পায়ে হেঁটে হয়ত বেশি চলাফেরা করবেন না। বরং বায়ুচাপনিয়ন্ত্রিত একটি যানের মধ্যে চেপে সেটিকে চাঁদের জমির উপর চালিয়ে বেড়াবেন।

চাঁদের জমির উপর বসবাসের সমস্যা অনেক—বাতাস নেই, ফলে বায়ুর চাপও নেই। মহাকাশ-রশ্মি ও উল্কার দল সর্বত্র ওত পেতে রয়েছে। এছাড়া চিন্তার কথা হল চাঁদের দিন ও রাতকে নিয়ে। ওখানে একটি দিন পৃথিবীর চোদ্দটি দিনের সমান। তাপমাত্রা চড়তে চড়তে ২০০ ডিগ্রি ফারেনহিটে গিয়ে পৌঁছয়। চাঁদের একটি রাত

হল পৃথিবীর চোদ্দটি রাতের সমান। তাপমাত্রা তখন -২০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় নেমে আসে। তাপমাত্রার এই বিপুল তারতম্যের এলাকায় মানুষের পক্ষে বসবাস করা মুস্কিল হবে। চাঁদে বায়ু না থাকার ফলে দিনের বেলাতেও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাপ ছড়াতে পারে না। ফলে আলো থেকে এক পা পেছিয়ে কোন ছায়ার মধ্যে ঢুকলেই হিমাঙ্কের বহু নিচে এসে দাঁড়াবে তাপমাত্রা।

বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা হল, চাঁদের জমির বিশ-পঁচিশ ফুট তলায় চলে গিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকার ব্যবস্থা করা। সেখানে তাপমাত্রা নাকি সবসময়েই ৪০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের জমির নিচে বিরাট আকারের ঘর তৈরি করে বিজ্ঞানীরা সেখানে যতটা সম্ভব পৃথিবীর পরিস্থিতিকে তৈরি করে ফেলবার চেষ্টা করবেন।

চাঁদের জমির উপর কাঁচের বড় পাত্রের মধ্যে ক্লোরেলা নামে শ্যাওলাজাতীয় গাছের চাষ শুরু করে দিলে একদিকে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন পাবার ব্যবস্থা হবে। তেমনি চাঁদের পাথর গুঁড়িয়ে তার মধ্যে যেটুকু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যাবে, তাদের মিলিত করে জল সরবরাহের একটি আংশিক ব্যবস্থাও হয়ত চালু করা যেতে পারে। অবশ্য পৃথিবী থেকে চাঁদের বাসিন্দাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ রকেটের মাধ্যমে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত চালু রাখতেই হবে।

চাঁদে ওজন কমবে

চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের একাশি ভাগের এক ভাগ মাত্র। সেই অনুপাতে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল হবে পৃথিবীর ঠিক ছ-ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যার ওজন হল দেড় মণ, চাঁদে তার

ওজন দাঁড়াবে মাত্র দশ সের। তবে, তার মাংসপেশীর শক্তি কিন্তু একটুকুও কমবে না। ফলে সে অনায়াসে আরো দশজনকে ঘাড়ের উপর তুলে চমৎকার ব্যায়াম-কৌশল দেখাতে পারবে। তার কারণ প্রত্যেকটি মানুষের ওজনও যে একই অনুপাতে কমে বসে আছে।

পৃথিবীতে যে ছ-ফুট লাফাতে পারে, চাঁদে সে লাফাতে পারবে ৩৬ ফুট। চাঁদের জমির উপর ৩০ কি ৪০ ফুটের এক একটা ফাটল লাফিয়ে পার হওয়া তার পক্ষে মোটেই শক্ত ব্যাপার হবে না। চাঁদে স্বাভাবিকভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোই হবে মুস্কিল। মাটিতে একটু জোরে পা পড়লেই শরীরটা আচমকা হুট্ করে পাঁচ ছ-ফুট উপরে লাফিয়ে উঠতে পারে। নতুন করে হাঁটাই শিখতে হবে চাঁদে। প্রথম-প্রথম বেশ কিছুদিন দুই পকেটে মণ-খানেক পাথর ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলার অভ্যেস করতে হবে। তা না হলেই বিপদ।

চাঁদে শরীরের ওজন কমে যাওয়ার ফলে, রক্তের ওজনও কমে আসবে। ফলে, বুকের মধ্যে বসানো আছে যে হার্ট-রূপী পাম্প যন্ত্রটা, তার উপর রক্তের চাপ পড়বে কম। হার্টের ক্ষয় হবে ধীরে ধীরে, অর্থাৎ কিনা, চাঁদে গেলে মানুষ বুড়ো হবে ধীরে ধীরে। পৃথিবীতে যে মানুষটি বাঁচবে ৬০ বা ৭০ বছর, চাঁদে সে বাঁচতে পারে ১২০ থেকে ১৩০ বছর।

পৃথিবীতে হৃদ্‌যন্ত্রের বা ব্লাড প্রেসারের রোগ থাকার জন্যে শ্রমসাধ্য কাজ করা যাদের বারণ, চাঁদ হবে তাদের কাছে এক স্বর্গরাজ্য। হৃদ্‌যন্ত্রের উপর রক্তের চাপ অনেকটা কমে যাওয়ার ফলে যেকোন কঠিন কাজই তারা করতে পারবে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রোগের দল তাদের শরীর ছেড়ে পালাবে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যেদিন চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারটা দাঁড়াবে আজকের কলকাতা থেকে লণ্ডন শহরে যাবার মত সহজসাধ্য ব্যাপার, সেদিন চাঁদের বুকে গড়ে উঠবে বহু চিকিৎসাগার বা স্যানাটোরিয়াম। সেখানে আমরা দল বেঁধে পাঠিয়ে দেব পৃথিবীর যত হার্টের রোগীদের। তারা সেখানে

বেশ কিছুদিন কাটিয়ে, রোগ সারিয়ে, বয়স কমিয়ে পৃথিবীতে যখন ফিরে এল তখন হয়ত দেখা গেল তাদের ছেলেমেয়েদের চেয়ে তাদের বয়স কম হয়ে বসে আছে।

বিজ্ঞানীদের আশা

চাঁদের দেশে যাবার পেছনে বিজ্ঞানীদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যও রয়েছে। চাঁদে যেহেতু কোন জল নেই, বাতাস নেই, তাই তার কোন ক্ষয়ও নেই। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর মত চিরকাল তাই চাঁদের একই চেহারা। পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম একই কারণে হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। মহাকাশের ধুলো ও গ্যাসীয় কণা এক-জায়গায় জড়ো হয়ে হয়ে আজ থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি বছর আগে পৃথিবী ও চাঁদের দেহকে গড়ে তুলেছিল। কাজেই আজকের চাঁদের দেশে পৌঁছনোর ব্যাপারটা হবে, আজ থেকে পাঁচশো কোটি বছর আগে পৃথিবী যে অবস্থায় ছিল, সেরকম একটা পরিবেশের মধ্যে এসে পড়া। চাঁদে নামার পর পৃথিবীর উৎপত্তি ও পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা কিছু রহস্য আজও গোপন রয়ে গেছে, তার একটি পরিষ্কার সমাধান বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই করতে পারবেন।

চাঁদে বায়ু না থাকার ফলে আকাশের রঙ হবে নিকষ কালো এবং চব্বিশ ঘণ্টাই দূরবীনের সাহায্যে আকাশের গ্রহনক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। তারাগুলোকে দেখাবে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। কেউ মিটমিট করে জ্বলবে না।

চাঁদের আকাশে পৃথিবী একটি বিরাট গোল বলের মত ভেসে থাকবে। পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি, চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে দেখাবে তার চেয়ে বারো গুণ বড় একটি থালার মত। পৃথিবীর জ্যোৎস্না হবে চাঁদের চেয়ে বহুগুণ বেশি উজ্জ্বল। সেই জ্যোৎস্নার আলোয় চাঁদের সর্বাঙ্গ ঝলমল করতে থাকবে। পৃথিবী

এবং মহাকাশ সম্বন্ধে নতুন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি চমৎকার ক্ষেত্র হবে চাঁদ।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান কাটানোর জন্যে পৃথিবীর রকেটের নিষ্ক্রমণ-বেগ সেকেণ্ডে ৭ মাইলে এনে দাঁড় করাতে হবে। চাঁদের ক্ষেত্রে এই নিষ্ক্রমণ-বেগ হবে সেকেণ্ডে মাত্র দেড় মাইল। কাজেই চাঁদ হবে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহলোকে পাড়ি জমানোর পক্ষে একটি চমৎকার মহাকাশ-বন্দর।

বিজ্ঞানীরা দূরবীন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি বসিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে স্পুৎনিক শিগগিরই ছুঁড়বেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘেরাটোপে নক্ষত্রদের দেহজাত বেগনিপারের আলো ও রঞ্জনরশ্মি বন্দী হয়ে পড়ে, কিন্তু মহাকাশে পরিক্রমারত ঐ স্পুৎনিকদের কাছে তার সবটুকুই ধরা পড়বে। ফলে নক্ষত্র গবেষণা এবং জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

চাঁদ ও গ্রহলোকের দিকে অভিযান আজ শুরু হবার মুখে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম চলেছে প্রতিনিয়ত। এ সংগ্রামে মানুষই জয়ী হয়েছে বরাবর। ভবিষ্যতেও যে তারই জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

৮

উপসংহার

মেরিনার-৪

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটি মস্ত বড় ঘটনা ঘটেছে। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা ১৯৬৪ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করে 'মেরিনার-৪' নামে একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশনকে পাঠিয়েছিলেন। ৭½ মাস ধরে পথ চলার পর মেরিনার ১৯৬৫ সালের ১৪ই জুলাই মঙ্গল গ্রহের ৬২০০ মাইল পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সে সময় তার আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করে এবং গ্রহটির জমির ২১টি ছবি তুলে নেয়। সেইসব তথ্য ও আলোকচিত্রের মাধ্যমে মঙ্গল সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে।

ছবিগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গঠন-প্রকৃতির বিচারে পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের সঙ্গে মঙ্গলের মিল অনেক বেশি। মঙ্গলে বোধহয় প্রায় দশ হাজার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ রয়েছে। পৃথিবীতে এদের সংখ্যা তুশোর বেশি নয়।

মঙ্গলের জমির যে চেহারা ছবিগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় মঙ্গলে কোনদিনই যথেষ্ট পরিমাণে জল ছিল না। এর বায়ুমণ্ডলও বর্তমানের চেয়ে কখনো বেশি ঘন অবস্থায় ছিল না। কারণ তাহলে মঙ্গলে জল ও বাতাসের কিছু ক্ষয়কাজের নিদর্শন ধরা পড়ত।

মঙ্গলে কোন খালের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পৃথিবীর মত বিরাট পর্বতশ্রেণী, বিরাট উপত্যকা বা মহাসাগরের খাতও মঙ্গলে নেই বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

মঙ্গলে পৃথিবীর মত কোন চৌম্বকক্ষেত্রের সন্ধান মেলে নি। চৌম্বকক্ষেত্র না থাকার ফলে মঙ্গলের জমি পৃথিবীর তুলনায় সূর্যদেহজাত

বিভিন্ন মারাত্মক রশ্মি প্রায় ৫০ গুণ বেশি পরিমাণে লাভ করে চলেছে। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র এইসব রশ্মিদের আড়াল করে রাখে। তাই মঙ্গলে যদি কোন বীজাণু থাকে, তবে এইসব মারাত্মক রশ্মি এড়ানোর জন্যে তার চামড়া হতে হবে গণ্ডারের মত শক্ত।

মঙ্গলের নতুন খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে মেরিনার এখন সৌরলোকের সদস্য হতে চলেছে। এ হয়ে দাঁড়াবে সূর্যের আর একটি নতুন গ্রহ। এর চলবার রাস্তাটা হবে পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায়।

জোন্দ্‌-৩

রুশ বিজ্ঞানীরা আর একবার চাঁদের উলটো পিঠে তাঁদের দূত পাঠালেন। দূতের নাম জোন্দ্‌-৩, একটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক ষ্টেশন। ষ্টেশনটি ১৯৬৫ সালের ২০শে জুলাই চাঁদের প্রায় ৬৫০০ মাইল পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তার উলটো পিঠের কয়েকটি চমৎকার ছবি তুলে পাঠিয়েছে। সে ছবিগুলো চান্দ্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, সন্দেহ নেই।

মহাকাশের নতুন নায়ক

১৯৬৫ সালের ১৮ই মার্চ মহাকাশে নতুন অতিথি হলেন রুশ মহাকাশযাত্রী লিওনভ ও বেলাইয়েভ। তাঁরা দু-জনে একই মহাকাশ-যানে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কক্ষপথে পৌঁছনোর আধঘণ্টা পরেই লিওনভ মহাকাশের পোশাক পরে তাঁর মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে এসে এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে রূপ দিয়ে বসলেন। তাঁর পায়ের তলায় কোন জমি নেই। মহাকাশে ভেসে রইল তাঁর দেহটা। মহাকাশযানের সঙ্গে একটি বড় বেল্টের সাহায্যে বাঁধা ছিলেন তিনি। তাঁর যানের সঙ্গে লিওনভও ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে দৌড়ে চলছিলেন। তিনি কিন্তু সেই গতি এতটুকুও টের পাচ্ছিলেন না।

পুরো কুড়ি মিনিট তিনি মহাকাশের মারাত্মক রশ্মির পরিবেশে কাটালেন। এর মধ্যে তিনি ছ-হাজার মাইল পথ পাড়ি জমিয়ে বসলেন। মহাকাশের পোশাকের জন্যে মারাত্মক রশ্মিরা তাঁর দেহের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। মহাকাশযানে ফিরে আসার পর আরো প্রায় ২৪ ঘণ্টা পৃথিবীকে পরিক্রমা করে লিওনভ ও তাঁর সঙ্গী নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

এরপরে ১৯৬৫ সালের ২১শে অগস্ট মহাকাশে পাড়ি জমালেন তু-জন আমেরিকান মহাকাশযাত্রী, কুপার ও কনরাড। কুপার পৃথিবী-পরিক্রমাকালীন অবস্থায় লিওনভের মতই মহাকাশ-পোশাক পরে তাঁর মহাকাশযান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। খুব ছোট একটি রকেট-যন্ত্র তাঁর পোশাকের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সেই যন্ত্রটির সাহায্যে তিনি মহাকাশের এপাশে-ওপাশে খানিকটা ঘুরেও বেড়িয়েছিলেন। কুপার ও কনরাড পৃথিবীকে পরিক্রমা করেছেন ১২০ বার। প্রায় ৮ দিন মহাকাশে যাপন করে তাঁরা রুশ মহাকাশযাত্রী বিকভস্কির ৫ দিন মহাকাশে অবস্থানের রেকর্ড ভঙ্গ করলেন।

রাশিয়া ও আমেরিকা এই তুই দেশের বিজ্ঞানীরা অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশে আরো বড় ঘটনাকে রূপ দেবেন। আমরা সবাই সে প্রতীক্ষায় রয়েছি।

বিজ্ঞান চেতনা ১

পৃথিবীর কথা

শঙ্কর চক্রবর্তী

সংশোধন করে নাও

পৃথিবীর কথা

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৪২	২৩	১৯৬০	১৯০৬
৪৩	১০	১৯৬০	১৯০৬

১

মহাদেশের ঘন সবুজ মাটি, মহাসাগরের তরঙ্গায়িত নীল জলরাশি, মেরুপ্রদেশের জমাট-বাঁধা শ্বেতশুভ্র তুষারের মেলা,—রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে পূর্ণ আমাদের এই মাতা বসুন্ধরাকে আমরা সবাই ভালবাসি। এই পৃথিবীকে ঘিরে আমাদের মনে কত প্রশ্নই না জাগে। কেমন করে জন্ম হয়েছিল এই পৃথিবীর? মহাদেশ আর মহাসাগরগুলো গড়ে উঠল কিভাবে? পাহাড়ের দল জমির উপর মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াল কবে? আগ্নেয়গিরি গর্জায় কেন? ভূমিকম্পই বা হয় কেন? পৃথিবীর ভিতরের তাপ কমছে না বাড়ছে? পৃথিবীর পাতালপুরীর চেহারাটা আসলে ঠিক কিরকম? ভূগর্ভে চৌম্বকক্ষেত্রটাই বা তৈরি হয়ে উঠল কিভাবে? পৃথিবী কি প্রতিনিয়ত ক্ষয় পাচ্ছে? এত বরফই বা এল কোথা থেকে? এইসব প্রশ্নের সঠিক জবাব খুঁজতে গিয়ে গড়ে উঠল পৃথিবী-বিজ্ঞান বা ভূ-বিজ্ঞান।

পৃথিবীর সম্বন্ধে আরো কত বড় প্রশ্নের উত্তর আজও সঠিকভাবে জানা হয় নি। পৃথিবীর জলবায়ু সত্যি-সত্যি বদলাচ্ছে কি? সূর্যের আলো ও তেজ পৃথিবীর বাতাস ও সমুদ্র কিভাবে ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে? অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু সত্যিই কি একটি মহাদেশ, না বরফাবৃত কতকগুলো দ্বীপের সমষ্টি? কুমেরু পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করছে কি? মেরু অঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফের স্তূপ কি গলতে পারে কোনদিন? পৃথিবীর সব অঞ্চলের আবহাওয়ার খবর আগে থেকেই সঠিকভাবে বলে দেওয়া কি সম্ভব নয়? মহাদেশগুলো কি আসলে মহাসাগরদের বুকে ভেসে বেড়ায়? বায়ুমণ্ডলের উপরতলায় আয়ন-মণ্ডল গড়ে ওঠার পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে? পৃথিবী কি সূর্যের করোনা বা আবহমণ্ডলের জালে বাঁধা রয়েছে? প্রশ্নের যেন আর শেষ নেই। জন্মদাত্রী,

জন্মধাত্রী এই পৃথিবীকে ভাল করে জানতে গিয়ে মানুষ যেন দিশেহারা হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পৃথিবীর জমি, জল ও আকাশের রহস্যকে ভাল করে জানা ও বোঝবার জন্যে মানুষের চেষ্টাও এগিয়ে চলেছে। এই বইতে আমরা তারই কিছু পরিচয় গ্রহণ করবার চেষ্টা করব।

পৃথিবী বদলাচ্ছে

কোন পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি বা উপত্যকা যখন আমরা দেখি, মনে হয় এরা বুঝি অনন্তকাল ধরে একই চেহারা নিয়ে রয়েছে। এটা শুধু আমাদের মনের ভুল। এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু চোখে পড়বে তারা সবাই বদলায়। কয়েকশো কোটি বছর ধরে চলেছে এই পরিবর্তনের পালা, যার শুরু পৃথিবীর জন্মানোর দিনটি থেকেই। এই মহাবিশ্বে পৃথিবী যতকাল থাকবে, ততকাল তার সর্বাঙ্গ জুড়ে পরিবর্তনের এই খেলার ক্ষান্তি নেই।

পৃথিবীতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে আকস্মিকভাবে। যেমন, একটা আগ্নেয়গিরি হঠাৎ গর্জে উঠল, নদীর বন্যায় দু-পাশের জনপদ গেল ভেসে, ভূমিকম্পে মাটি উঠল কেঁপে। এইসব ঘটনাগুলো আমরা সহজেই টের পাই। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরগতিতে। একটি মরুভূমি তৈরি হতে সময় লেগে যায় পাঁচ থেকে দশ হাজার বছর। একলক্ষ বছর কেটে যাবে একটি উপত্যকা তৈরি হতে, আর একটি পর্বতশ্রেণী গড়ে উঠতে সময় নিয়ে বসবে হয়ত এক কোটি বছর। পৃথিবী তার নিজস্ব মন্থর ধারায় এভাবে সময়কে কাজে লাগিয়ে চলেছে।

ঠিক এই মুহূর্তে সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের অগোচরে কত অজস্র পরিবর্তনই না ঘটছে। জল, বাতাস আর তুষারের সঙ্ঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে চলেছে পৃথিবীর পাহাড়গুলো। এমন একদিন

আসবে, যেদিন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড়গুলো আর থাকবে না।

পৃথিবীর বহু জায়গায় সমুদ্রগর্ভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আজ থেকে বহু যুগ পরে ওরা উঁচু পাহাড় হয়ে মেঘলোক ছুঁতে চাইবে। ওদের বেড়ে ওঠবার দৌড়টা আজ হয়ত বছরে এক ইঞ্চি। কিন্তু পৃথিবীর হাতে সময় তো আর ফুরিয়ে যায় নি।

বহু জায়গায় সাগরের জল এক পা, এক পা করে মহাদেশের জমিকে গ্রাস করবার জন্যে এগিয়ে আসছে। আজ যেখানে জনপদ গড়ে উঠেছে, একদিন হয়ত সেখানে মাছ আর কাঁকড়ার দল সাগর-জলে গা ভাসিয়ে বেড়াবে।

মাত্র দশ হাজার বছর আগেও ইয়োরোপ এবং আমেরিকার সমগ্র উত্তরাংশ বিরাট বরফের স্তূপের তলায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেই বরফ গলে সরে গিয়ে আজ আশ্রয় নিয়েছে গ্রীনল্যাণ্ড ও দুই মেরু অঞ্চলে। দশ হাজার বছর পরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার দেশ গ্রীনল্যাণ্ড আমাদের বাংলার মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হয়ে উঠবে না, তাই বা কে বলতে পারে ?

পাহাড়ের অবশেষ বালি, মাটি এবং পাথর রূপে জলস্রোতে ভেসে গিয়ে সমুদ্রগর্ভে স্তরে স্তরে জমা পড়ে চলেছে। পলির এই জমা পড়বার গড়পড়তা হার প্রতি হাজার বছরে হয়ত মাত্র এক ইঞ্চি করে। ঐ পলিই আবার একদিন শক্ত কঠিন পাথর হয়ে বসবে।

পৃথিবীর গর্ভে প্রচণ্ড তাপ এবং চাপের রাজত্ব। সেখানে চলেছে এক বিচিত্র শক্তির খেলা। চুনো পাথর রূপ পালটে হয়ে দাঁড়াচ্ছে মার্বেল পাথর। মাটি ভোল পালটে অভ্র হয়ে উঠছে, আর মৃত গাছপালার স্তূপ থেকে গড়ে উঠছে কয়লা। পৃথিবীর অন্ধকার পাতালপুরীর সবটাই একটা ল্যাবরেটরি, যার কাজের একটা দিন সময়ের মাপে আমাদের কয়েক লক্ষ বছরের সমান।

যে কলকাতা শহরে বসে তুমি এই বইখানা পড়ছ, আজ থেকে

এক লক্ষ বছর পরে সেই জায়গাটার চেহারা কী দাঁড়াবে, তা কেউ জোর গলায় বলতে পারে কি ? হয়ত এক মাইল বরফের তলায় সমস্ত জায়গাটা ততদিনে চাপা পড়ে গেছে। তা নাহলে সেটা হয়ত একটা যাচ্ছেতাই স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি হয়ে বসে আছে। দশ লক্ষ বছর পরে ঐ জায়গাটাই হয়ত গিয়ে আশ্রয় নিল সমুদ্রগর্ভে, আর মাথার উপরে চলতে থাকল এক মাইল গভীর জলের খেলা। কে জানে, আবার কয়েক কোটি বছর বাদে হয়ত দেখা গেল ঐ একই জায়গা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তুষারাবৃত উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী।

পৃথিবীর সর্বাঙ্গ জুড়ে পরিবর্তনের পালা এমনি বিচিত্র ধারাতেই এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি বছর আগে। সেই শিশু পৃথিবীর চেহারা এবং গঠন কিরকম ছিল, তা আজ শুধু অনুমানই করা যায়। তবে আজকের পৃথিবীর সঙ্গে তার যে অনেক পার্থক্য ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মহাদেশগুলোর আস্তানা তখনো গড়ে ওঠে নি, পাহাড় পর্বত তো দূরের কথা। সমুদ্র এবং বায়ুমণ্ডল তৈরি হতেও বহুদিন সময় লেগেছে। তাছাড়া প্রথম এককোষী প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল সাগরের জলে মাত্র দুশো কোটি বছর আগে,—বিবর্তনের সুদীর্ঘ ধারাপথ বেয়ে যা পরম বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষে এসে আজ পরিণতি লাভ করেছে। প্রকৃতিজগতে এবং প্রাণীজগতে যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, তার সব প্রমাণ এবং সাক্ষ্য পৃথিবী আপন দেহে ধারণ করে রাখছে অতি সযত্নে এবং সঙ্গোপনে।

পৃথিবীর চেহারাটা

নিজেদের পৃথিবী সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। তার সবকিছু খুঁটিয়ে জানবার ইচ্ছে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

পৃথিবীর চেহারাটা প্রায় বর্তুলাকৃতি বা গোলাকার বলে আমরা জানি। পৃথিবী কিন্তু পুরো গোল হয়ে উঠতে পারে নি। তার দুটো মেরুপ্রদেশ কমলালেবুর মত খানিকটা চাপা। নিরক্ষরেখা-বরাবর পৃথিবীর পেটের কাছটায় আবার খানিকটা স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস তার মেরুপ্রদেশীয় বা এক মেরু থেকে আর এক মেরু পর্যন্ত ব্যাসের তুলনায় ২৭ মাইল বেশি। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় এভারেস্ট (উচ্চতা ২৯,০০০ ফুট) ও সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর জায়গার (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছে ম্যারিয়ানাস্ ট্রেঞ্চ নামে সমুদ্রের একটি স্থান ; গভীরতা ৩৭,৮০০ ফুট) মধ্যেকার খাড়া দূরত্ব ১২ মাইলের কিছু বেশি। পৃথিবীর প্রায় ৮,০০০ মাইল ব্যাসের এই সামান্য অংশটুকুর সঙ্গেই আমাদের সরাসরি পরিচয় রয়েছে।

মধ্যযুগ পর্যন্তও সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবীর চেহারাটা থালার মত গোল এবং আকাশটা যেন উপর থেকে ঝোলানো রয়েছে। মানুষের মনে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি চেহারার ধারণা কয়েকটি ঘটনা থেকে ক্রমে ক্রমে রূপ গ্রহণ করেছে। প্রথমত, সমুদ্রযাত্রী কোন জাহাজকে দিগন্তের কাছে ধীরে ধীরে দৃষ্টির আড়ালে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর যে ছায়াটা চাঁদের থালাটার উপর পড়ে, তার আকারটা গোল। তৃতীয়ত, উত্তর গোলার্ধের বিভিন্ন জায়গা থেকে আকাশে ধ্রুবতারার দিকে তাকালে ঐ তারাটির উচ্চতা কম বেশি হতে দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য মহাকাশ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তোলা ছবিতে পৃথিবীর বর্তুলাকৃতি চেহারা পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব হচ্ছে।

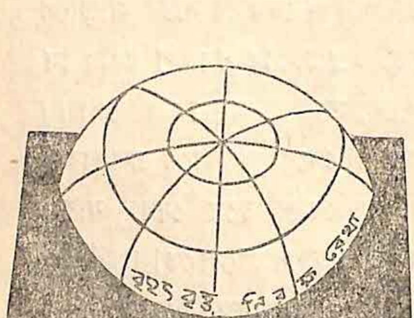
পৃথিবীর পরিমাপ

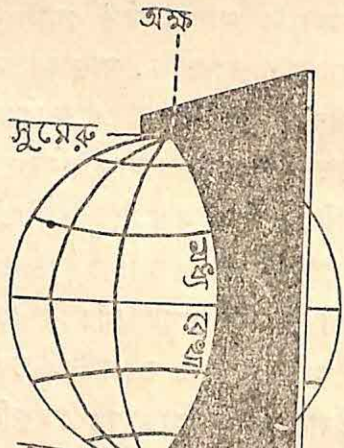
পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস হল ৭,৯২৭ মাইল এবং মেরুপ্রদেশীয় ব্যাসের পরিমাণ ৭,৯০০ মাইল। এই ২৭ মাইলের ব্যবধানটুকু

পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের সামান্য স্ফীতির জন্যে ঘটেছে। নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর পরিধির পরিমাণ হল ২৪,৯০০ মাইল। পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের ক্ষেত্রফল প্রায় ১৯·৭ কোটি বর্গ-মাইল। পৃথিবীর শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে মহাসাগরগুলোর আস্তানা। বাকি শতকরা মাত্র ২৯ ভাগ জায়গা জুড়ে স্থলভাগ। পৃথিবীর ঘনফল ২৫০ কোটি ঘন-মাইলের চেয়ে সামান্য বেশি। পৃথিবীর ভর বা মোট বস্তুর পরিমাণ হল ৬,৬০০ কুইন্টিলিয়ন টন, অর্থাৎ ৬৬ $\times$ ১০^{২০} বা ৬৬র পর ২০টি শূন্য বসালে যে সংখ্যা দাঁড়ায়, তত টন।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা

তোমরা সবাই গ্লোব নিশ্চয়ই দেখেছ। গ্লোব হচ্ছে পৃথিবীরই একটি ক্ষুদে সংস্করণ, যার উপর মহাদেশ, সাগর, উপসাগর, পর্বতশ্রেণী, নদ নদী সবই আঁকা রয়েছে।





গ্লোবের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে একটি রেখা গ্লোবটিকে পুরো একপাক ঘুরে এসেছে, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। এটিই হল

নিরক্ষরেখা (ইকোয়েটর)। এই রেখার উত্তর বা দক্ষিণদিকে দূরত্বের পরিমাণকে অক্ষাংশের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সমাক্ষরেখাগুলো (লাইন্‌স্‌ অব্‌ ল্যাটিচিউড) টানা হয় নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে এবং দূরত্বের পরিমাপ করা হয় ডিগ্রির মাধ্যমে। পৃথিবীর সমগ্র পরিধি ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত। অতএব, এক ডিগ্রি অক্ষাংশের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ হবে পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস বা ২৪,৯২৭ মাইল ÷ ৩৬০ অর্থাৎ ৬৯'২ মাইল।

একটি গ্লোবের পরিধি জানা মোটেই শক্ত নয়। ইঞ্চি বা সেন্টিমিটারে মাপ করা একটা ফিতে ওটার চারধারে জড়ালে সে তথ্যটুকু পাওয়া যাবে। কিন্তু পৃথিবীকে তো আর ঐভাবে মাপা সম্ভব নয়! তার জন্যে অন্য উপায় খুঁজে বার করতে হয়েছে।

গ্লোবের উপর আর একটি ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করছ কি? অনেকগুলো রেখা দুই মেরুর মধ্যে সংযোগ সাধন করছে। এগুলো হল দ্রাঘিমা (লন্‌জিচিউড) রেখা। পৃথিবীর প্রধান দ্রাঘিমা রেখাকে বলা হয় মধ্যরেখা বা মেরিডিয়ান। এই রেখাটি উত্তর মেরু থেকে লণ্ডন শহরের কাছে গ্রীনউইচ জায়গাটির উপর দিয়ে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতিটি দ্রাঘিমারেখা একটি বৃহৎ বৃত্তের অর্ধাংশ। কোন জায়গার দ্রাঘিমা বলতে হলে তা মধ্যরেখার পূর্বে না পশ্চিমে, তা উল্লেখ করতে হয়। দ্রাঘিমা রেখারা যেহেতু পরস্পরের সমান্তরাল নয়, তাই এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার দৈর্ঘ্য সব জায়গায় সমান হতে দেখা যায় না। নিরক্ষরেখার কাছে এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার দৈর্ঘ্য ৬৯'২ মাইল, কিন্তু উত্তর বা দক্ষিণ মেরুতে এই দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়াবে শূন্যের কোঠায়।

সহজেই বুঝতে পারছ তোমরা, অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমারা নেহাতই কতকগুলো কাল্পনিক রেখা। এই রেখাগুলো দিয়ে পৃথিবীর সর্বাঙ্গকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার পেছনে উদ্দেশ্যটা হল, ভূপৃষ্ঠের যে কোন জায়গার অবস্থানকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা।

পৃথিবীর গতি

আমাদের পৃথিবী একই সঙ্গে গোটাকয়েক গতির মালিক হয়ে বসে আছে। পৃথিবীর আপন অক্ষের উপরে পাক খাওয়ার গতিটিকে আমরা বলি আহ্নিক গতি। নিরক্ষরেখার উপর এই গতির পরিমাণ ঘণ্টায় প্রায় ১,০৩৭ মাইল। মেরু অঞ্চলে অবশ্য এই গতি প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ায়। সূর্যকে কেন্দ্র করে আপন মেরুদণ্ডের উপর এক পাক ঘুরে আসতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তা আমাদের একটি দিন ও রাতের পরিমাণের সমান।

আপন অক্ষের উপর আবর্তনের সময় পৃথিবী আর একটি গতি তৈরি করে থাকে, যাকে বলা হচ্ছে অয়ন চলন (প্রিসেশন্)। পাক খাওয়ার সময় একটি লাটিমের মাথা যেমন খানিকটা এপাশে ওপাশে দুলতে থাকে, পৃথিবীর এই গতিটিও অনেকটা তারই সঙ্গে তুলনীয়।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আপন কক্ষপথে প্রতি সেকেণ্ডে গড়-পড়তা ১৮½ মাইল বেগে ঘুরে চলেছে। ৩৬৫¼ দিনে তার একবার সূর্যপরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়। সময়ের পরিমাপের আর একটি মাপকাঠি এখান থেকে আমরা লাভ করছি—তা হল সৌর বছর।

পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমা-পথ উপবৃত্তাকার হওয়ার ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে। পৃথিবীর অক্ষ আবার তার নিরক্ষীয় তল (ইকোয়েটোরিয়াল প্লেন) থেকে ২৩½ ডিগ্রি হেলে রয়েছে। পৃথিবী যখন সূর্যের কাছাকাছি জায়গায় অবস্থান করে, উত্তর গোলার্ধের মাথাটা সে সময় সূর্যের উলটো দিকে ফেরানো থাকে। সেই গোলার্ধে তাই শীতের রাজত্ব। দক্ষিণ গোলার্ধের উপর সূর্য তখন লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে, কাজেই সেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। আবার পৃথিবী যখন সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করে, উত্তর গোলার্ধের মাথাটা সে সময় সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে। সূর্য সেই অঞ্চলের উপর তখন

লম্বভাবে কিরণ দেয়। উত্তর গোলার্ধের ক্ষেত্রে সময়টা তাই গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণ গোলার্ধের মাথা সে সময় উলটো দিকে ফেরানো, সেখানে তাই শীতকাল।

সূর্য থেকে দূরত্বটা কম বেশি হওয়ার জন্যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই, উত্তর গোলার্ধে শীতকালটা হয় মৃদুভাবাপন্ন, গ্রীষ্মটা হয় ঠাণ্ডা। দক্ষিণ গোলার্ধে আবার শীতকালটা হয় খুবই ঠাণ্ডা, গ্রীষ্মটা হয় খুবই গরম। কুমেরুতে শীতের সময় যে বরফ জমে, সুমেরুতে শীতকালে জমা বরফের তুলনায় তার পরিমাণও তাই বেশি হতে দেখা যায়।

২

পৃথিবীর উপাদান

এই বিরাট পৃথিবীর মহাদেশগুলির জমি এবং মহাসাগরের খাতগুলো কী দিয়ে গড়ে উঠেছে? আমরা জানি, সেই গড়ার উপাদানটি হল শিলা। শিলা কিন্তু আমরা সব জায়গাতে (যেমন, আমাদের এই বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে) দেখতে পাই না। সে সব জায়গায় শিলা ঢাকা থাকে মাটি দিয়ে। মাটি বড়জোর কয়েক ফুট পুরু হয়। কোন অঞ্চলের মাটি গড়ে ওঠে সেখানকার শিলা-ক্ষয়ে-যাওয়া মিহি কণা এবং গাছ ও জন্তু-জানোয়ারের দেহাবশেষের সমবায়ে।

একটি শিলা আবার গড়ে ওঠে বিভিন্ন খনিজ বা মিনারেলের সমবায়ে। যেমন, পৃথিবীর জমিতে বহুল পরিমাণে যে শিলাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সেই গ্র্যানাইটের মূল উপাদান হল দুটি খনিজ—কোয়ার্জ ও ফেল্‌ড্‌স্‌পার।

পৃথিবীর জমি বা শিলার রাজ্যে আমরা যত বৈচিত্র্যই দেখি না কেন, তার মূলে রয়েছে গুটিকয়েক রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের খেলা। পৃথিবীর উপরের অংশ, যাকে আমরা বলি ভূত্বক (পৃথিবীর গঠন-প্রকৃতির আলোচনায় আমরা পরে আসব), সেখানে সবচেয়ে সহজলভ্য মৌলিক পদার্থটি হল অক্সিজেন। আমরা সবাই জানি, অক্সিজেন হল একটি গ্যাস। হাইড্রোজেনের সঙ্গে এর মিলনে জল তৈরি হয়। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনকে আমরা মৌলিক অবস্থায় দেখতে পাই। পরিমাণে এটি ভূত্বকের শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ, এবং অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

ভূত্বকে অক্সিজেনের পর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে মৌলিক পদার্থটি পাওয়া যায় সে হল সিলিকন—পরিমাণে শতকরা ২৮ ভাগ। অ্যালুমিনিয়ামের স্থান তৃতীয়,—পরিমাণ শতকরা ৮·১৩

ভাগ। চতুর্থ পদার্থটি হল লোহা—পরিমাণে শতকরা ৫ ভাগ। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম হল যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম স্থানাধিকারী। মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি মৌলিক পদার্থ, যেমন, সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনাম, সীসে, দস্তা এবং তামা অতি সামান্য পরিমাণে ভূত্বকে রয়েছে। শতকরা হিসেবে তারা অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের কোঠায় গিয়ে পড়ে।

খনিজ

পৃথিবীর বিবর্তনের কোন এক ধাপে ভূত্বক তপ্ত গলিত লাভার (আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় যা বেরিয়ে আসে) অবস্থায় ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। সেই লাভার প্রধান উপাদান ছিল অক্সিজেন, ও ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যাদের পাওয়া যায় সেই সাতটি মৌলিক পদার্থ। এছাড়া অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। তপ্ত লাভা যত ঠাণ্ডা হতে থাকল, অক্সিজেন ও অন্য সাতটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগও তত বেশি ঘটতে থাকল। এর ফলে গড়ে উঠল প্রথম যৌগিক পদার্থ—যাদের নাম দেওয়া হয়েছে অক্সাইড। অক্সিজেন ও সিলিকন মিলে তৈরি হল সিলিকন ডাই-অক্সাইড বা সিলিকা। লোহা এবং অক্সিজেন মিলে গড়ে উঠল আয়রন অক্সাইড।

পরবর্তী ধাপে রাসায়নিক সংযোগ ঘটতে থাকল সিলিকা এবং অন্যান্য অক্সাইডদের মধ্যে—যেমন, সিলিকার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড মিশ্রিত হয়ে 'সিলিকেট অব্ অ্যালুমিনিয়াম' নামে যৌগিক পদার্থটি গড়ে উঠল।

ভূত্বকের গলিত লাভার স্রোত একদিন তাপ হারিয়ে যথেষ্ট শীতল অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল। তখন ঐ বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের দল তরল অবস্থা থেকে জমাট বেঁধে কিছু শিলা তৈরি করে বসল। লাভাজাতীয় অগ্নিময় পদার্থ থেকে জন্মানোর ফলে এইজাতীয়

শিলার নাম দেওয়া হয়েছে আগ্নেয় শিলা। এইজাতীয় একখণ্ড শিলা নিয়ে পরীক্ষা করলে তুমি দেখতে পাবে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি যৌগিক পদার্থ ক্রিস্ট্যাল বা কেলাস রূপে পরস্পরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। এই যৌগিক পদার্থগুলোই খনিজ নামে পরিচিত।

পৃথিবীতে যদিও হাজার হাজার খনিজের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, ভূত্বকের বেশির ভাগ শিলা কিন্তু গড়ে উঠেছে মাত্র গুটিকয়েক খনিজের সমবায়ে। এই প্রধান খনিজগুলো সংখ্যায় মাত্র ন-টি।

ভূত্বকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে খনিজটি আমরা পাই সে হল কোয়ার্জ। কোয়ার্জ গড়ে উঠেছে সিলিকন ও অক্সিজেন এই দুটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে। একটি কোয়ার্জ ক্রিস্ট্যালের রঙ খুব স্বচ্ছও হতে পারে, আবার কখনো কখনো কালোও হতে দেখা যায়। কোয়ার্জ এত শক্ত যে ইস্পাতের গায়ে দাগ বসাতে পারে। অথচ এই বস্তুটি আবার ভঙ্গুরও বটে।

পরিমাণে খুব বেশি পাওয়া যায় দ্বিতীয় যে খনিজটি সে হল ফেলড্‌স্পার। এটি গড়ে উঠেছে সিলিকা, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং সোডিয়াম, পটাসিয়াম অথবা ক্যালসিয়াম জাতীয় অক্সাইডদের সমবায়ে। ক্যালসাইট (চুনো পাথর এবং মার্বেলের প্রধান উপাদান) এবং অভ্রের স্থান সবচেয়ে বহুললভ্য খনিজদের তালিকায় তৃতীয় এবং চতুর্থ।

তিন জাতের শিলা

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, শিলা বিভিন্ন খনিজের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। শিলা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত। ভূপৃষ্ঠ এই তিন শ্রেণীর শিলা নিয়েই গড়ে উঠেছে।

আগ্নেয় (ইগ্‌নিয়াস্‌) শিলা

ভূপৃষ্ঠ বিবর্তনের পথে যখন তপ্ত অবস্থা থেকে শক্ত কঠিন রূপ ধারণ করেছিল, তখন তা সম্পূর্ণভাবে আগ্নেয় শিলা দিয়েই গড়ে ওঠে। ভূতত্ত্ববিদরা মনে করেন, একেবারে গোড়ায় ভূপৃষ্ঠের চেহারাটা



কিরকম ছিল, তার কোন নজির আজ আমরা কোথাও খুঁজে পাব না। কারণ ভূপৃষ্ঠ সর্বত্রই পরিবর্তিত হয়ে বসে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে জ্বলন্ত লাভার স্রোত বাইরে বেরিয়ে আসে, তারা ঠাণ্ডা অবস্থায় জমাট বেঁধে গিয়ে এখনো আগ্নেয় শিলা গড়ে তুলছে।

লাভা শীতল হয়ে ভূগর্ভের অন্য শিলাস্তরের নিচেও আবার এইসব আগ্নেয় শিলা তৈরি করে চলেছে। এইজাতীয় একটি আগ্নেয় শিলা হল গ্র্যানাইট। কোয়ার্জ, ফেলড্‌স্‌পার ও অভ্র, এই তিনটি খনিজের সমবায়ে গ্র্যানাইটের সৃষ্টি। গ্র্যানাইট খুব শক্ত এবং মজবুত পাথর। আমরা কথায় কথায় বলি, 'শক্ত যেন গ্র্যানাইটের মত'।

আর একটি আগ্নেয় শিলা হল ব্যাসল্ট। ভূত্বকের অনেকখানি অংশ এই শিলাটি দ্বারা গড়ে উঠেছে। ব্যাসল্ট সাধারণত হয় কালো অথবা ধূসর বর্ণের। গ্র্যানাইটের চেয়ে এই শিলাটির ঘনত্ব বেশি। তাই সাধারণত গ্র্যানাইটের স্তরের নিচে এই শিলাস্তরের সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্তমানে বিভিন্ন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসে তা প্রায় সবটাই ব্যাসল্ট শিলার গলিত রূপ। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে আগ্নেয়গিরি থেকে তরল রূপে বিপুল পরিমাণে ব্যাসল্ট শিলা নিক্রমণের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। এ-জাতীয় বৃহত্তম ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে, যার ফলে ঐ সমগ্র প্রদেশটি দু-মাইল গভীর ব্যাসল্ট শিলাস্তরের নিচে ঢাকা পড়ে যায়।

পাললিক (সেডিমেন্টারি) বা স্তরীভূত শিলা

মহাদেশের জমির বেশির ভাগ অংশই এই পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। এই জাতীয় শিলার দেহে বিভিন্ন স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলা হয়ে থাকে। আগ্নেয় শিলা থেকেই পাললিক শিলার জন্ম। জল, বাতাস, বরফ এবং ঠাণ্ডায় গ্র্যানাইটের মত শক্ত, কঠিন আগ্নেয় শিলাও ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়ে বালি এবং মাটিতে পরিণত হয়। এই পলি-জাতীয় বস্তু বাতাসে এবং নদীর জলে বয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে অথবা হ্রদের তলায় স্তরে স্তরে জমা পড়তে থাকে। উপরের স্তরের চাপে নিচের স্তর সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাদের ভিতরে যেটুকু জল ছিল তাও বাইরে বেরিয়ে আসে। উপরের শত-শত ফুট সঞ্চিত স্তরের চাপে নিচের স্তরের বস্তু একদিন ঘনীভূত হয়ে শক্ত কঠিন শিলার রূপ নেয়।

ভূত্বকে আলোড়নের ফলে কোথাও নিচের স্তর উপরে উঠে আসছে, আবার উপরের স্তর কোথাও নিচে বসে যাচ্ছে। এই

ওঠানামার মধ্যে দিয়েই অনেক নিচে যে শিলার দল জন্ম পেয়েছিল, তারাই একদিন আলোর রাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে পাললিক শিলা বা স্তরীভূত শিলা।

পলি কালক্রমে অন্য আরও উপায়ে কঠিন শিলায় পরিণত হতে পারে। ছিদ্রযুক্ত ঘন বালির স্তরের মধ্যে জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে নানা ধরনের খনিজ ঢুকে পড়ে। বালির কণাগুলোকে ঐ খনিজেরা এক জায়গায় আঠার মত জুড়ে দিয়ে বেলেপাথর তৈরি করে বসে।

চুনো পাথর আর-এক জাতের পাললিক শিলা। এর প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বনেট। প্রাচীন কালে সমুদ্র অথবা নদীর জলে যে-সব গাছপালা বা প্রাণী বাস করত, এ হল তাদেরই দেহের প্রস্তরীভূত অবশেষ। চক বা খড়িমাটি আর-একটি বিশেষ ধরনের চুনো পাথর।

পাললিক শিলার মধ্যেই গাছপালা এবং প্রাণীদেহের প্রস্তরীভূত অবশেষ বা জীবাশ্ম (ফসিল) খুঁজে পাওয়া যায়। যে প্রচণ্ড তাপের মধ্যে আগ্নেয় শিলাকে জন্মাতে হয়, তার ফলে ঐ শিলাস্তরের মধ্যে উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের যে-কোন অবশেষই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাললিক শিলা তৈরি হবার সময় খুব বেশি তাপযুক্ত অবস্থার মধ্যে এসে পড়ে না। তাই এই শিলার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভূবিদরা পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের প্রাণীদের জীবাশ্মকে খুঁজে পেয়েছেন, যার ফলে প্রাণীজগতে বিবর্তনের একটি কালানুক্রমিক ধারাকে তৈরি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

রূপান্তরিত (মেটামর্ফিক) শিলা

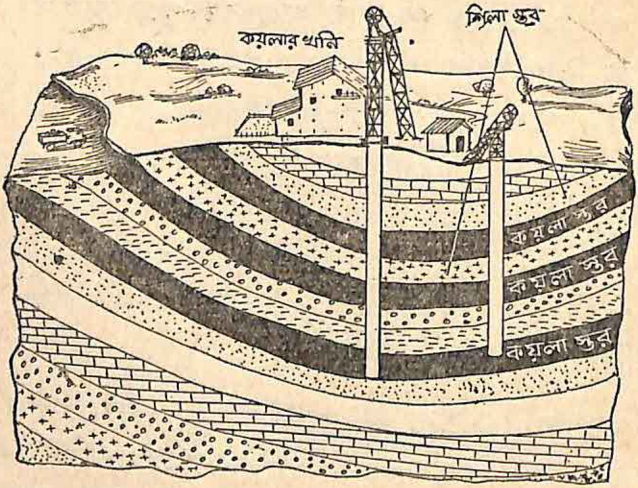
আগ্নেয় বা পাললিক শিলা প্রচণ্ড চাপে এবং তাপে বদলে গিয়ে রূপান্তরিত শিলা তৈরি করে। ভূত্বকে আন্দোলনের ফলে ঐ দুই শিলাস্তরের কোন-কোন অংশে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। জ্বলন্ত লাভাস্রোতের সংযোগে এসে কোন শিলাস্তর হয়ত তরল

রূপ পেল এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে ক্রিস্ট্যালাইজ.ড্ (কেলাসিত) হয়ে উঠল। প্রচণ্ড চাপ বা তাপের পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে এভাবে চক বা চুনো পাথর রূপান্তরিত হয় মার্বেল পাথরে, শেল রূপান্তরিত হয় স্লেট পাথরে এবং গ্র্যানাইট রূপান্তরিত হয় নাইসে।

রুক্ষ, কঠিন শিলাস্তর আপন দেহ চূর্ণ করে জন্ম দিচ্ছে মৃত্তিকার। পৃথিবীর সেই মাটির শ্যামল সবুজ শোভায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। মাটির কথাই আমরা মনে রাখি, কঠিন পাষাণকে যাই ভুলে।

কয়লা .

কয়লাকে বা পেট্রোলিয়ামকে আসল খনিজ বলা চলে না, কারণ তাদের কোন নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন নেই। তবে, যেহেতু মাটি থেকে তাদের পাওয়া যায়, তাই তাদের খনিজ সম্পদ বলা হয়ে থাকে। জীবাশ্মরূপ জ্বালানি নামেও তাদের একটা পরিচয় আছে।



কারণ যে শক্তি তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা সুদীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক কাল ধরে শিলাস্তরের মধ্যেই সঞ্চিত হয়ে ছিল।

পৃথিবীতে কার্বনিফেরাস যুগটা এসেছিল বর্তমান যুগের প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি বছর আগে। এই যুগে পৃথিবীর এক বিপুল পরিমাণ জায়গা অরণ্যে ভরে ওঠে। কয়লার জন্ম হয়েছিল এ সময়েই। কয়লা প্রধানত কার্বন দিয়ে তৈরি। কার্বন, আমরা জানি, গাছপালার গঠনে প্রধান উপাদান। কয়লার উৎপত্তিও গাছপালা থেকেই হয়েছে।

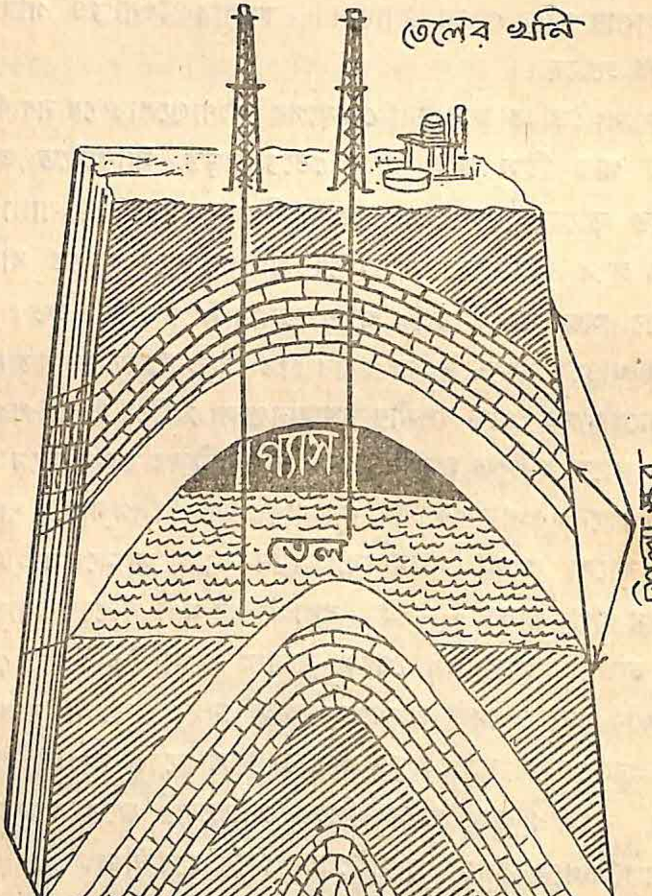
কয়লা তৈরির কারখানা সে যুগের অরণ্যগুলোয় যে সব বিরাট বিরাট গাছ ছিল তারা যখন ভেঙে পড়ত, স্যাঁতসেঁতে জলময় মাটিতে তাদের দেহগুলো যেত তলিয়ে। মরা গাছপালাগুলো মাটির ক্ষুদে বীজাণুদের আক্রমণে আংশিকভাবে গলতে থাকত। তারপর অন্য পলির চাপে আরো তলায় গিয়ে হাজির হত। এই পলিই গাছকে সম্পূর্ণ উৎসন্ন হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখত।

গাছের দেহ থেকে গ্যাসীয় উপাদানগুলো বেরিয়ে যাবার পর তার কার্বন আরো ঘনীভূত হয়ে দাঁড়াল। সেই ঘনীভূত কার্বন ক্রমে ক্রমে কয়লা গঠনের প্রথম পর্ব পিট, ধূসরবর্ণের কয়লা লিগ্‌নাইট, সাধারণ নরম কালো কয়লা বিটুমিনাস, কঠিন কয়লা অ্যানথ্রেসাইট এবং সর্বশেষ ধাপ গ্রাফাইট—এই অবস্থাগুলোর মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে চলল। গাছপালা থেকে এভাবে কয়লা তৈরি হতে যে বহু লক্ষ বছর সময় লেগেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কয়লা সাধারণত শেল এবং বেলেপাথর এই দুই জাতীয় শিলাস্তরের মধ্যেই পাওয়া যায়। কয়লার স্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছনোর জন্যে কয়লাখনির গভীরতা কখনো কখনো দু-মাইলেরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

পেট্রোলিয়াম

এই খনিজ সম্পদটিকে আমরা সাধারণত পাললিক শিলাস্তরের মধ্যেই পেয়ে থাকি। অসংখ্য সামুদ্রিক গাছপালা এবং প্রাণীদেহের অবশেষ থেকেই এই খনিজ তেলটির উৎপত্তি। ঐসব অবশেষ

প্রাচীনকালে হ্রদ বা অগভীর সমুদ্রের তলায় গিয়ে জমতে থাকত। সেখানকার বীজাণুদের আক্রমণে ঐ দেহাবশেষ একদিন গলে গিয়ে তাদের দেহের কার্বন ও হাইড্রোজেনকে মুক্তি দিল। স্তরে স্তরে সঞ্চিত পলির চাপে আরো তলিয়ে গিয়ে ঐ দেহাবশেষ

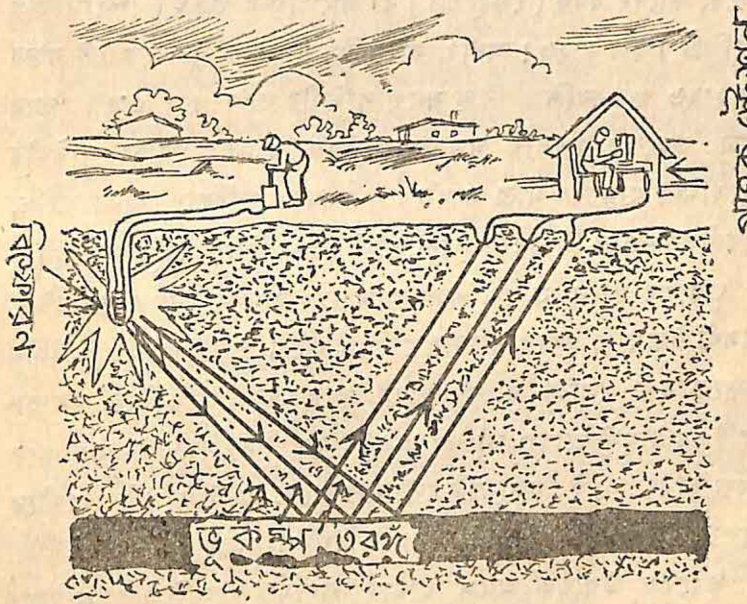


এক জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল এবং একদিন তেল এবং গ্যাসে পরিণতি লাভ করে বসল।

উপরকার শিলাস্তরের চাপে ঐ তেল এবং গ্যাস কালক্রমে নিচেকার ছিদ্রযুক্ত এক শিলাস্তরে গিয়ে জমা হতে থাকল।

শিলাকণাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র স্থানগুলো তেল এবং গ্যাসের বাসভূমি তৈরি হয়ে বসল এবং উপরের শিলাস্তর এদের বেরিয়ে আসবার সব পথ দিল রুদ্ধ করে। সুদীর্ঘকালের জন্যে ভূগর্ভে আত্মগোপন করল বিপুল এক গ্যাস এবং তেলের সম্পদ।

শিলাস্তরে তেলের সন্ধান্-কাজে ভূবিদরা বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কৃত্রিম ভূমিকম্প তৈরি করেন। ভূমিকম্প-তরঙ্গ ভূত্বকের শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে



আসে। এদের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঐ শিলার মধ্যে যদি আদৌ তেল থাকে, তা ধরা পড়ে যাবে। তখন লম্বা কূপ নামিয়ে তেল তুলে আনার ব্যবস্থা চলতে থাকে।

উপকূলের কাছাকাছি অগভীর সমুদ্রের তলায় শিলাস্তরের মধ্যেও তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। কিছুকাল আগে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কাম্বে উপসাগরের তলায় খনন-কাজ চালিয়ে আমাদের ভূবিদরা তেলের সঞ্চয় খুঁজে পেয়েছেন।

৩

পৃথিবীর ভিতরটা

পৃথিবীর ভিতরে কী আছে এবং কী ব্যাপারটাই বা ঘটছে, এ সম্বন্ধে জানার কৌতূহল কার নেই বল? ভূপৃষ্ঠে গোটা পৃথিবীর যেটুকু অংশ দেখবার সুযোগ আমরা পাই, তা হল কিছু শিলাস্তর, পাহাড়, মাটি প্রভৃতি। এরা ভূগর্ভের রহস্যের বিশেষ কিছু খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। ভূত্বক যেসব বস্তু নিয়ে গড়ে উঠেছে, তাদের ঘনত্ব (ডেন্‌সিটি) বা আপেক্ষিক গুরুত্ব (স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি) হল ২·২৬। অর্থাৎ, সমপরিমাণ জলের তুলনায় এই বস্তুর ভর ২·২৬ গুণ বেশি। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর ঘনত্ব হল ৫·৫। তার মানে ভূত্বকের শিলার গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব গোটা পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের মাত্র অর্ধেক। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর ভিতরে নিশ্চয়ই আরো ভারি কোন শিলা মজুত রয়েছে।

ভূত্বকের গঠনে যে সব শিলা অংশগ্রহণ করেছে, যেমন গ্র্যানাইট, ব্যাসল্ট ইত্যাদি, এদের তুলনায় লোহা আরো ভারি বস্তু। পৃথিবীর ভিতরে যদি লোহা থাকে তবেই তার এই অতিরিক্ত ঘনত্বের একটি মোটামুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভূত্বকের শিলা পরীক্ষা করে অবশ্য ভূবিদরা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছচ্ছেন যে, যতই পৃথিবীর গভীরে যাওয়া যাবে, ততই শিলার মধ্যে লোহার পরিমাণ হবে বেশি।

ভূত্বকের উপরের অংশে রয়েছে প্রধানত পাললিক বা স্তরীভূত শিলা। তার তলায় গ্র্যানাইট শিলাস্তর, যা হল সমস্ত মাটির ভিত্তি-স্বরূপ। গ্র্যানাইটের এই স্তরের গভীরতা ৬ থেকে ৯½ মাইলের মধ্যে। এর নিচে রয়েছে কালো ব্যাসল্ট শিলার স্তর। এই শিলাস্তরের মধ্যে লোহার অংশটা গ্র্যানাইট এবং পাললিক শিলার চেয়েও বেশি।

ভূপৃষ্ঠের কোন-কোন জায়গায় অনেক নিচে থেকে উঠে আসে এক জাতের অতি কঠিন শিলা, দেহের উপাদানে লোহার পরিমাণ যাদের আরো বেশি।

মহাকাশের একটি সৌখিন ভ্রমণকারী পৃথিবীর কেন্দ্রের গঠন সম্বন্ধে কিছু খবর ভূবিদদের হাতে এনে তুলে দিচ্ছে। সেই সন্দেশ-বাহকটি হল উল্কা। সৌরজগতে মঙ্গল এবং বৃহস্পতি,—এই গ্রহদুটির কক্ষপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আরো একটি গ্রহ সূর্যপরিক্রমা করত বলে অনেকের বিশ্বাস। সেই গ্রহটি কোন কারণে ভেঙে গিয়েই নাকি উল্কার সৃষ্টি করেছে। সৌরজগতের সমস্ত সদস্যের জন্ম একই ঘটনা থেকে, সে কথা আমরা জানি। কাজেই উল্কার গঠনপ্রকৃতির অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গঠনপ্রকৃতির কিছু রহস্যের সমাধান মিলে যেতেও পারে।

উল্কা প্রধানত লোহা-পাথর বা লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরি। পৃথিবীর অন্যান্য শিলার চেয়ে এই শিলাটি বেশি ভারি এবং এদের গঠনে লোহার পরিমাণও তুলনায় অনেক বেশি। খুব সম্ভবত লোহা-পাথরের তৈরি উল্কাপিণ্ডের মত বস্তু দিয়েই পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলটি গড়ে উঠেছে।

তাপ ও চাপের বোঝাপড়া

পৃথিবীর পাতালপুরীর সবচেয়ে যে গভীরে মানুষ এ পর্যন্ত তার তেলের কূপ নামাতে পেরেছে, তা হল মাত্র চার মাইল। পৃথিবীর কেন্দ্র হল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার মাইল ভিতরে।

কয়লাখনিতে কখনো নেমেছ কি? যদি নেমে থাক, তাহলে নিশ্চয়ই অনুভব করেছ, নিচের দিকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাপের মাত্রাও বেড়ে উঠতে থাকে। প্রতি ৬০ ফুট নামলে তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহিট করে বাড়তে দেখা যায়। এই হারে যদি বেড়ে চলে, তাহলে ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৩০ মাইল নিচেই তাপের পরিমাণ দাঁড়াবে ২,৭০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। এই তাপে ভূপৃষ্ঠে যে-কোন শিলাই গলে যাবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎদ্গারের সময় যে জ্বলন্ত লাভাস্রোত বাইরে বেরিয়ে আসে, তারা জন্মায় ভূপৃষ্ঠের

প্রায় ২৫ মাইল নিচে। তাদের তাপমাত্রা হল ২,২০০ ডিগ্রি ফারেনহিট।

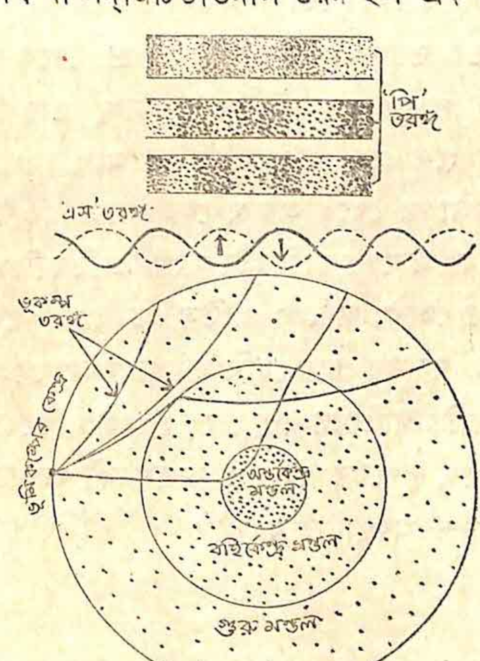
তাহলে সিদ্ধান্তটা কি এই দাঁড়াবে যে ভূপৃষ্ঠের ৩০ মাইল নিচে বা আরো গভীরে সব শিলাস্তরই রয়েছে তরল অবস্থায়? আসলে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। অন্য সব পদার্থের মত শিলাও তরল অবস্থায় প্রসারিত হয়। প্রসারণের জন্যে বাড়তি জায়গার দরকার। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের অনেক নিচে শিলা প্রচণ্ড গাদাগাদি অবস্থায় রয়েছে। সেখানে দরকার হলেও তপ্ত শিলার জন্যে বাড়তি জায়গার ব্যবস্থা করা যাবে না। গায়ের জোর খাটিয়ে চারপাশের শিলাস্তরকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, একমাত্র তাহলেই কাজটা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের ৩০ মাইল নিচে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি শিলার উপর চতুর্দিকের চাপের পরিমাণ দাঁড়াবে ২০২,৫০০ পাউণ্ডের মত। পৃথিবীর জমির উপর প্রতি বর্গ-ইঞ্চি পরমাণ ক্ষেত্রে বায়ুর চাপ হল মাত্র ১৪ পাউণ্ড। এই বিপুল পরিমাণ চাপের পরিবেশে প্রচণ্ড তাপযুক্ত হয়েও তপ্ত শিলা তরল রূপ ধারণ না করে কঠিন অবস্থাতেই থেকে যায়। (পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপসৃষ্টির কারণ নিয়ে আমরা অন্য জায়গায় আলোচনা করব।)

ভূকম্প-ঢেউ

আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিপর্যয় দেখা দিলে চিকিৎসকেরা মাঝে মধ্যে রঞ্জনরশ্মির সাহায্য নিয়ে থাকেন। শরীরের হাড়ের কাঠামোর যে এক্স-রে ছবিটি এভাবে পাওয়া যায়, রোগ নির্ণয়ে তা অনেকখানি সাহায্য করে। পৃথিবীর পাতাল-পুরীর এ-জাতীয় একটি এক্স-রে ছবি তোলার ব্যবস্থা যদি করা যেত, তাহলে মন্দ হত না। পৃথিবী অবশ্য নিজেই সে ব্যবস্থাটি করে রেখেছে, আমরা যাকে বলি ভূমিকম্প। ভূমিকম্প কেন হয়, সে আলোচনা পরে আসবে।

কোথাও ভূমিকম্প হলে মাটি প্রচণ্ড বেগে কাঁপতে থাকে। ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট সবকিছুর মধ্যেই একটা ওলটপালটের ব্যাপার শুরু হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ফলে অন্য যে ব্যাপারটা ঘটে, তাই নিয়েই বিজ্ঞানীদের বেশি আগ্রহ, সে হল ভূকম্প-তরঙ্গ। ভূকম্পনের কেন্দ্রে সৃষ্টি হয়ে এই তরঙ্গ ভূগর্ভের মধ্য দিয়ে চতুর্দিকে পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। যাত্রাপথে কোন্ শিলাস্তরে তাদের গতিপথ কতটুকু বেঁকে গেল, কতটুকু সময় ধরে তারা ছুটল, এ সব খবরাখবর নিয়ে তারা এসে পৌঁছয় সারা পৃথিবী জুড়ে অপেক্ষমান গবেষণা-স্টেশনগুলোতে। ভূমিকম্পের খবর তারা যেমন যথাস্থানে পৌঁছে দেয়, তার সঙ্গে ভূগর্ভের যে অঞ্চল দিয়ে তারা পাড়ি জমিয়েছে, সেখানকার গঠনবিন্যাসের মোটামুটি একটি ছবিও স্রেফ বিনা খরচায় তারা বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দিতে ভোলে না।

ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে দেখা যাক। ভূকম্প-তরঙ্গ দু-জাতের হয়। লম্বালম্বি বা লন্‌জিটিউডিনাল তরঙ্গ হল এক জাতের। এদের



বলা হচ্ছে 'প্রাইমারি'। এরা শব্দজনিত বাতাসের তরঙ্গের মত। এদের চাপে শিলাদেহের কণাগুলোর মধ্যে সামনে এবং পেছনে ছু-দিকেই দৌড় শুরু হয়ে যায়। কঠিন এবং তরল, ছু ধরনের পদার্থের মধ্য দিয়েই এই তরঙ্গ তার রাস্তা তৈরি করে নিতে পারে। এর চলার গতিবেগ হল সেকেণ্ডে ৫ থেকে ৮½ মাইলের মধ্যে।

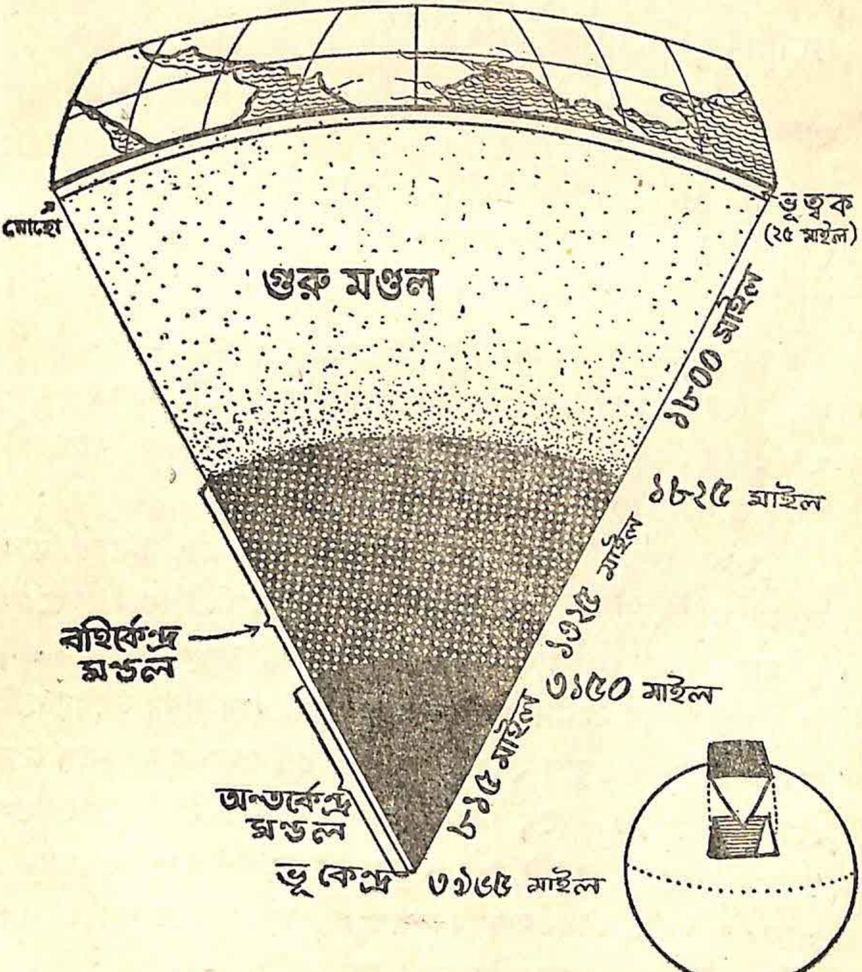
দ্বিতীয় জাতের তরঙ্গ তির্যকধর্মী বা ট্র্যান্‌স্‌ভার্স। একে বলা হচ্ছে সেকেণ্ডারি। শিলাদেহের কণিকা এই তরঙ্গের চলার পথের উপরে নিচে বা আড়াআড়িভাবে কাঁপতে থাকে। একটা দড়ির একটা পাশ বেঁধে আর একপ্রান্ত থেকে যদি সেটাকে ঝাঁকানো যায়, তাহলে সেটা উপরে নিচে কাঁপতে থাকে। তির্যক তরঙ্গের প্রভাবে শিলার কণিকাদের মধ্যে ঠিক এ-জাতীয় কম্পনের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গের গতিবেগ থাকে সেকেণ্ডে ৩ থেকে ৪½ মাইলের মধ্যে। এ জাতের তরঙ্গ শুধু কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়েই চলতে পারে। তরল পদার্থের মাঝে রাস্তা তৈরির ক্ষমতা এর নেই।

এই ছু-জাতের তরঙ্গ ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে রওনা হয়ে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়তে কতখানি সময় নিল, তার হিসেব থেকে ভূগর্ভের বিভিন্ন অংশে এদের গতিবেগের পরিমাপটা পাওয়া যেতে পারে। এক শিলাস্তর থেকে অন্য ঘনত্বের আর একটি শিলাস্তরে প্রবেশ করবার সময় তরঙ্গের খানিকটা অংশ প্রতিফলিত হয় স্তর-ছুটির সংযোগক্ষেত্র থেকে, বাকিটা প্রতিসরিত হয়ে পড়ে। আরো দেখা যায়, কম ঘনত্বের চেয়ে বেশি ঘনত্বের শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তরঙ্গটির গতিবেগ যায় বেড়ে। এই গতিবেগের হিসেব থেকে জানা যাবে, ভূগর্ভের বিভিন্ন অংশে কী ধরনের বস্তু রয়েছে এবং তাদের সাধারণ অবস্থাটাই বা কী।

ভূত্বক

নানা খবরাখবরের মধ্যে ভূকম্প-তরঙ্গ ভূবিদদের কাছে যে চমকপ্রদ তথ্যটি পৌঁছে দিয়েছে তা হল এই যে, পৃথিবীর সমগ্র অভ্যন্তরভাগ কয়েকটি বিশেষ স্তরে বিভক্ত হয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম স্তর হল তার ত্বক বা ক্রাস্ট্। মহাদেশের জমি বা পর্বতের নিচে এই ভূত্বক ২০ থেকে ৩০ মাইল পুরু। মহাসাগরের গর্ভে এই ত্বকের গভীরতা ৩ থেকে ৫ মাইলের মধ্যে। পৃথিবীর



চেহারার মাপে তার ত্বকের মাপটা, ডিমের খোসাটার সঙ্গে পুরো ডিমটার মাপের সঙ্গে তুলনীয়। মহাদেশ এবং মহাসাগরের খাত, এই নিয়ে হল ভূত্বক।

ভূত্বকের প্রথম ৬ থেকে ৯ মাইল অংশ হল গ্র্যানাইট শিলাস্তরের আস্তানা। এই অংশে মৌলিক পদার্থ সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে। এর ঠিক নিচেই অবস্থান করছে ব্যাসল্ট শিলাস্তর, ১০ থেকে ৪০ মাইল গভীরতা পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। এখানকার প্রধান রাসায়নিক উপাদান হল সিলিকন ও ম্যাগনেসিয়াম।

গুরুমণ্ডল

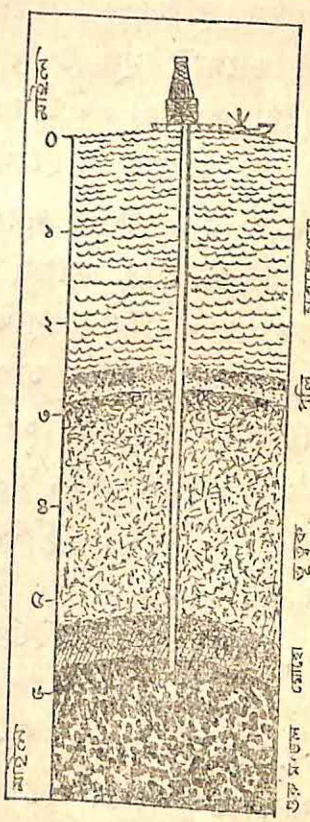
ভূত্বকের নিচে হল পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান স্তর, গুরুমণ্ডল (ম্যান্টল্)। এই স্তরটির ব্যাস ১,৮০০ মাইল। গুরুমণ্ডলের মধ্যে আবার তিনটি ছোট স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রচণ্ড তাপ এবং চাপের রাজত্ব এখানে। তাপের পরিমাণ প্রায় ৫,০০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। চাপের পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের তুলনায় দশ লক্ষ গুণ বেশি। এই বিপুল চাপে শিলাস্তর যে কী শক্ত আর কী কঠিন রূপে রয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

গুরুমণ্ডলের উপরের অংশে ব্যাসল্ট শিলা এবং নিচের দিকে রয়েছে পেরিডোটাইট, প্যালেসাইট-জাতীয় ভারি শিলা। ভূত্বকের তুলনায় এখানে লোহা ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণও বেশি। এই শিলামণ্ডলটি খুব নমনীয় (প্ল্যাস্টিক)। হঠাৎ কোন অসম চাপের সৃষ্টি হলে এ বেঁকে বা দুমড়ে যাবে। এমনকি রুটির মণ্ডের মত নড়ে চড়ে বেড়ানোর চেষ্টাও করবে, কিন্তু কিছুতেই ভাঙবে না। গুরুমণ্ডল আগ্নেয়গিরির লাভারূপী তপ্ত গলিত বস্তুর খোরাক জুগিয়ে থাকে। আবার পৃথিবীর তীব্রতম ভূমিকম্পগুলো, যা অতীতে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে তাদের তৈরির কারখানাটিও এখানেই।

মোহোল

ভূত্বক এবং গুরুমণ্ডলের সংযোগক্ষেত্র যুগোস্লাভ আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে 'মোহোরোভিকিক্ ডিস্‌কন্‌টিন্যুইটি (অসমতা) বা সংক্ষেপে মোহো নামে পরিচিতি লাভ করেছে। মোহো থেকে কিছু ভূকম্প-তরঙ্গ প্রতিফলিত হতে দেখে ঐ বিজ্ঞানী প্রথম এর অস্তিত্ব টের পান। ভূত্বকের তুলনায় গুরুমণ্ডলে শিলার ঘনত্ব প্রায় ডবল বলে, ভূকম্প-তরঙ্গের গতিবেগও ঐ জায়গায় দু-গুণ বেড়ে যায়।

গুরুমণ্ডলের কিছু নমুনা সংগ্রহের জন্যে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে 'মোহোল' নামে একটি পরিকল্পনা খাড়া করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে কিছু দূরে পুয়েটো-রিকোর কাছে একটি জাহাজ থেকে এই পরীক্ষাকার্যের প্রথম অংশ পরিচালনা করা হয়েছিল। জাহাজ থেকে সমুদ্রগর্ভের দূরত্ব ছিল দুই মাইলের মত। সাগরগর্ভ থেকে আবার মোহো পর্যন্ত ভূত্বকের শিলাস্তর এখানে ছিল মাত্র আড়াই মাইল পুরু। ভূত্বক এত পাতলা হওয়ার জন্যে শিলা খুঁড়তে সুবিধে হবে বলেই বিশেষ করে এই জায়গাটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। মহাদেশের তুলনায় সাগরগর্ভে ভূত্বক যে অনেক কম পুরু, সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।



মোহোল

সাগরের তলদেশ খোঁড়ার জন্যে হিরে-বসানো ড্রিল যন্ত্রটা লম্বা পাইপের সাহায্যে প্রথমে সাগরের

জলে নামানো হল। তারপর ভূত্বকের শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে সেটা গুরুমণ্ডলে গিয়ে পৌঁছল। সেখানকার কিছু ব্যাসল্ট শিলার নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে ওই যন্ত্রটিকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা হল। ভূবিদ্যার ইতিহাসে এই পরীক্ষাকার্যটি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে, সন্দেহ নেই।

কেন্দ্রমণ্ডল

গুরুমণ্ডলের নিচে রয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডল। এই মণ্ডলের ব্যাস প্রায় ৪,৩০০ মাইল। এর মধ্যে আবার দুটি অংশের সন্ধান পাচ্ছেন ভূবিদরা। একটি বহির্ভাগ, অপরটি অভ্যন্তরভাগ। দুটি ভাগেরই মূল উপাদান হল লোহা ও নিকেল। লোহার পরিমাণ শতকরা ৯০ ভাগ।

কেন্দ্রমণ্ডলের বহির্ভাগ ১৩২৫ মাইল পুরু। প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে ঐ অঞ্চলের সকল উপাদান তরল অবস্থায় রয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের অংশের ব্যাস ১,৬৩০ মাইল। পৃথিবীর এই কেন্দ্রস্থলটির উপর চারপাশের বস্তুভারের এক বিপুল চাপ তৈরি হচ্ছে। এর পরিমাণ ভূপৃষ্ঠে বায়ুর চাপের তুলনায় ৪০ লক্ষ গুণ বেশি। এই অঞ্চলের বস্তুর রূপ নাকি আবার শক্ত, কঠিন। পৃথিবীর কেন্দ্রবস্তুর গড়পড়তা ঘনত্ব হল প্রায় ১২½। পৃথিবীর মোট ঘনত্বের মূলে তার কেন্দ্রের অবদান সবচেয়ে বেশি।

কেন্দ্রমণ্ডলের বহির্ভাগে বিপুল পরিমাণ চাপের পরিবেশে লোহা এবং নিকেল কিভাবে তরল রূপে রয়েছে, বহু বিজ্ঞানীর কাছে সেটা এক পরম বিস্ময়। এই ধারণা আদৌ সত্য কি না, সে সম্বন্ধেও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এই ধারণার সপক্ষে অবশ্য কয়েকটি যুক্তি আছে। প্রথমত, বহির্কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্য দিয়ে তির্যকজাতীয় ভূকম্প-তরঙ্গের যাবার ক্ষমতা নেই। তরল পদার্থের

মধ্য দিয়ে এ শ্রেণীর তরঙ্গ যেতে পারে না বলেই তো আমরা জানি। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কেন্দ্রে তরল পদার্থের একটি মণ্ডল যদি না থাকত তাহলে ভু-চৌম্বকক্ষেত্র আদৌ তৈরিই হয়ে উঠতে পারত না। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের আলোচনায় আমরা পরে আসব।

তৃতীয় যুক্তিটি একটু অন্য ধরনের। সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রের জলে যে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, কখনো-কখনো তা ৫০ ফুটের মত উঁচু হয়ে ওঠে। ঐ আকর্ষণের প্রভাবে মহাদেশের জমিতেও জোয়ার জাগে, তবে তার পরিমাণ কখনো পাঁচ ইঞ্চির চেয়ে বেশি হতে দেখা যায় না। মাটির এই ওঠা-নামা সমগ্র পৃথিবীর দেহে কম্পনের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর কেন্দ্রভাগেও একই ওঠা-নামার সন্ধান পাবার পর সেখানকার তরল অবস্থা সম্বন্ধে আরো একটি যুক্তি ভূবিদদের মিলে গেল। একটি তরল কেন্দ্রের অধিকারী না হলে মাটির জোয়ারের সঙ্গে পৃথিবী নাকি তাল মিলিয়ে কিছুতেই নড়াচড়া করতে পারত না। ফলে, তার সমগ্র দেহ জুড়ে ধ্বংসের তাণ্ডব শুরু হয়ে যেত।

পৃথিবীর কেন্দ্রের আসল চেহারা নিয়ে তর্কের জের বহুদিন চলবে। পাতালপুরীর গর্ভে একটা লম্বা ডুব দিয়ে টুক করে ভূকেন্দ্রের এলাকাটা একবার দেখে আসতে পারলেই হত সবচেয়ে ভাল। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়! তবে বিজ্ঞানের উন্নতি যেভাবে ঘটছে, তাতে ভূগর্ভের সব রহস্যের সমাধান বার না করে কি আর বিজ্ঞানীরা ছাড়বেন ?

পৃথিবীর তাপ

ভূগর্ভের তাপের কথা ইতিপূর্বে আমরা কয়েক-বারই বলেছি। মহাদেশ, মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল ও পর্বতের গড়ে ওঠা এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত-জাতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে রূপ

দেবার জন্যে পৃথিবীর ইতিহাসের সমস্ত অধ্যায় জুড়ে কী বিপুল পরিমাণ শক্তিই না অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যয় হয়েছে! এই শক্তির সবটাই ছিল তাপীয়। ভূগর্ভে এই তাপের সৃষ্টি কী করে হল, তা মস্ত একটা প্রশ্ন, সন্দেহ নেই।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে একটি ধারণা চলতি ছিল। সেটি হল এই যে, পৃথিবী এবং অন্য গ্রহগুলো সূর্যের তপ্ত দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে-আসা একটি গ্যাসীয় পিণ্ড থেকেই কালক্রমে জন্ম নিয়েছিল। জন্মলগ্নের সেই বিপুল তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হবার মত সময় নাকি আমাদের পৃথিবীর ভাগ্যে আর মোটেই জোটে নি। এই ধারণাটি অবশ্য আজ বিজ্ঞান-জগতে সম্পূর্ণভাবেই বাতিল হয়ে গেছে। বর্তমানে যে মতটি স্বীকৃত, তার বক্তব্য হল, মহাকাশে ঠাণ্ডা ধুলো এবং গ্যাসীয় কণা এক জায়গায় জোট বাঁধার মধ্য দিয়েই সূর্য এবং অন্য গ্রহগুলো একদিন গড়ে উঠেছিল।

পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণরূপী বলের দ্বারা আপন দেহের বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করবেই। ফলে, ভূগর্ভে যে তাপ তৈরি হয়ে উঠছিল, তারই প্রভাবে হয়ত পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল একদিন তপ্ত অবস্থা লাভ করে বসেছিল।

ভূগর্ভে বর্তমানে যে পরিমাণ তাপের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তা পৃথিবীর জন্মের সময় থেকেই মজুত হয়ে রয়েছে কি না, এরকম একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। ভূত্বকের শিলাস্তরের মধ্যেই তাপের আর একটি বিপুল উৎস রয়েছে। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় বস্তুদের আস্তানা এই ভূত্বকেই। এইসকল বস্তুরা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের খুইয়ে চলেছে। আপন-আপন দেহের ভরকে শক্তিরূপী বিভিন্ন রশ্মির আকারে রূপান্তরিত করার কাজে এদের কোন বিরাম নেই।

এই রশ্মিরাই ভূত্বকে তাপের স্রষ্টা। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়

পদার্থ ভূত্বকের মত, পৃথিবীর কেন্দ্রভাগেও যদি একই পরিমাণে থাকত, তাহলে সমগ্র পৃথিবী ঐ পদার্থদের বিকীরিত তাপে একটি প্রচণ্ড তপ্ত বস্তুতে পরিণত হত। আদতে সেরকম কিছু ঘটে নি। অতএব, ধরে নিতে হবে যে পৃথিবীর কেন্দ্রভাগে তেজস্ক্রিয় বস্তু নেহাতই বিরল। দেখাও যাচ্ছে যে ভূগর্ভের নিচুতলার বাসিন্দা ব্যাসল্ট শিলা উপরকার গ্র্যানাইট শিলার তুলনায় অনেক কম তেজস্ক্রিয়। এক টন গ্র্যানাইট শিলায় সাধারণত ৯ গ্রাম ইউরেনিয়াম এবং ২০ গ্রাম থোরিয়াম থাকে। অথচ সমপরিমাণ ব্যাসল্ট শিলায় এই দুটি বস্তুর পরিমাণ হল যথাক্রমে ৩·৫ ও ৭·৭ গ্রাম।

মহাকাশে যে ধুলোকণারা একজোট হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি করল, তেজস্ক্রিয় বস্তু গোড়া থেকে নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে ছিল। তাই যদি হয়, তাহলে ভূকেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ, সর্বত্র ঐ সকল বস্তু সমপরিমাণেই থাকবার কথা। তা যখন নেই, তখন বিশেষ কোন ঘটনা হয়ত পৃথিবীর ভিতরকার বেশির ভাগ তেজস্ক্রিয় বস্তুকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে একেবারে উপরতলায় জমা করে দিয়েছিল।

একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে আমাদের পায়ের তলার জমিতে যে তাপ তৈরি হচ্ছে, তা প্রায় বিনা বাধায় ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। ঘটনাটা এভাবে না ঘটলেই ছিল বিপদ। তাপ কোথাও জমে গিয়ে মাটিটাই গলতে শুরু করে দিত। শিলার তাপ পরিবহনের ক্ষমতা কিন্তু খুবই সামান্য। ফলে ভূত্বক এবং ভূগর্ভের আরো গভীর অংশে যে তাপ আগে জন্মেছিল এবং এখনো জন্মাচ্ছে, তার বেশির ভাগ অংশটা ভিতরেই থেকে যাচ্ছে। সে তাপের খুব সামান্য অংশই ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে বাইরে ছড়িয়ে যেতে পারছে।

পৃথিবীর অনেক নিচুতলার শিলাস্তরের তাপ তাই ধীরে-ধীরে

বেড়েই চলেছে। শিলাদেহের এই তাপের মাত্রা যদি বছরে $\frac{১}{১০০০}$ ডিগ্রি ফারেনহিট করেও বেড়ে চলে, তাহলে দশ লক্ষ বছরে তা বেড়ে দাঁড়াবে এক হাজার ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায়। পৃথিবীর জীবনে দশ লক্ষ বছর আর কতটুকু সময়! পৃথিবীর তাপ যদি এভাবে বেড়েই চলতে থাকে, তাহলে কবে কোনদিন কী বিপদ ঘটবে, কে জানে!

মহাদেশগুলো আবার কেন

পৃথিবীর মহাদেশের জমির উপরে আমরা বাস করি। কিন্তু এই মহাদেশগুলো আদৌ তৈরি হয়ে উঠল কিভাবে, এ প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু খুব সহজে পাওয়া যায় না। এদের জন্মানোর ইতিহাসটা এখনো অনেকটাই দুর্বোধ্য হয়ে আছে।

আমাদের পায়ের তলার জমিটা ভূত্বকের অংশ। পৃথিবীর সমগ্র দেহে পাতলা চামড়ার মত বসানো এই ভূত্বক সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই সঠিকভাবে জানি। এর উপরিভাগের মহাদেশ আর মহাসাগরগুলো জরিপ করে তাদের মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের পাহাড়গুলোর উচ্চতাও মাপা হয়েছে। বিভিন্ন সাগরগর্ভের গভীরতার পরিমাপও আজ আর অজানা নেই। কিন্তু ভূত্বকের যে চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয়, চিরকাল সে কিন্তু অমনিভাবেই ছিল না। কত আলোড়ন, কত পরিবর্তন ঘটেছে তার দেহে। ভূত্বক কিন্তু তার আগেকার অবস্থাগুলোর যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন, সব লোপাট করে দিয়েছে। কাজেই ভূত্বকের ইতিহাস রচনায় নেমেছেন যে ভূবিদ, তাঁর কাজটা হবে খুবই শক্ত। পাতি-পাতি করে খুঁজে তবেই যদি কোথাও কিছু নিদর্শন তাঁর ভাগ্যে জুটে যায়।

মহাদেশ আর মহাসাগরগুলোর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। পৃথিবীর কোন গ্লোব যদি ভাল করে দেখ, তাহলে একটি ব্যাপার তোমাদের নজরে পড়বেই। বেশির ভাগ স্থলভাগ রয়েছে যে-দিকটায়, তার ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে পৃথিবীর বেশির ভাগ জলভাগ। অর্থাৎ ইয়োরোপ, আফ্রিকা আর এশিয়া—পৃথিবীর এই $\frac{৩}{৪}$ ভাগ স্থল একদিকে, আর একদিকে হল পৃথিবীর বৃহত্তম জলভাগ প্রশান্ত মহাসাগর। মহাদেশগুলোর চেহারার মধ্যে আর একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি? উত্তর এবং দক্ষিণ

আমেরিকা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে পশ্চিমদিকে যদি এগিয়ে আসতে পারত, তাহলে একটা 'জিগ্-স' পাজ্লের মত ইয়োরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে তারা দিব্যি জুড়ে যেত। এ থেকে যে চমৎকার ধারণাটি তৈরি হয়েছে, তার কথায় আমরা খানিক পরেই আসব।

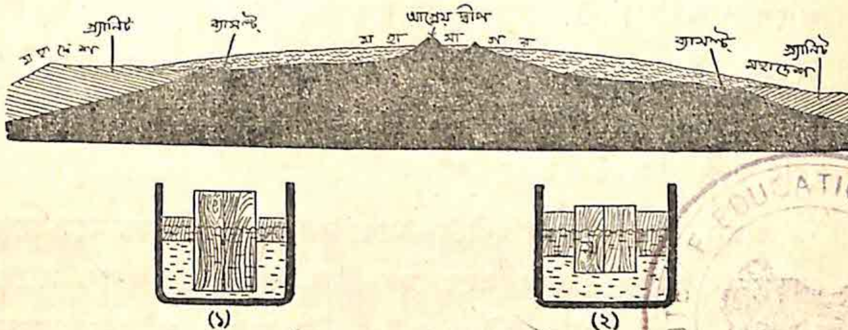
ভূত্বকের উপরতলাকে আমরা মোটামুটি দুটো অংশে ভাগ করতে পারি। একটি হল তার মহাদেশের অংশ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর যার গড় উচ্চতা ৩,০০০ ফুট। আর একটি তার মহাসাগরীয় অংশ, সাগরের গা ঘেঁষে গড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৩,০০০ ফুট নিচে পর্যন্ত যা বিস্তৃত। তাহলে কথাটা হল, মহাদেশগুলো আরো নিচে বসে গিয়ে ভূত্বকের গোটা অংশটাকেই একটি সমান মাত্রায় এনে দাঁড় করাচ্ছে না কেন? মহাদেশগুলোর বস্তুভার তো আর কম নয়। যে বহু কোটি বছর ধরে তারা জন্মেছে, সেই দীর্ঘকালের চাপটা নিচের তলার বস্তুর ঘাড়ের উপর জমা হচ্ছে। তার ফলে ঐ জাতীয় একটি ঘটনা ঘটাই তো স্বাভাবিক ছিল।

সমস্থানিকতা (আইসস্টেসী)

মহাদেশের জমির ভারটা তাহলে বহন করছে কে? মনে কর দুটো কাঠের টুকরোকে আমরা দুটি জলপূর্ণ বড় পাত্রে ভাসিয়ে-দিলাম। বড় টুকরোটা যেমন ছোটটার চেয়ে বেশি উঁচু হয়ে ভাসতে থাকবে, তেমনি জলের নিচেও ওর অংশটাই থাকবে বেশি।

কল্পনা করা যাক, ভূত্বক যেন তার চেয়ে ঘনত্বে বেশি গুরুমণ্ডলের উপর ভেসে রয়েছে। তাহলে, বিভিন্ন মাপের কাঠের টুকরোর জলে ভেসে থাকার সঙ্গে তার একটা তুলনা খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গা হল তার পর্বত এবং মালভূমিগুলো। ওরাও তাহলে নিশ্চয়ই তাদের শিলারূপ শেকড়কে ভূত্বকের অনেক নিচে চালিয়ে দিয়ে বসে আছে। আসলে ব্যাপারটা ঘটছেও ঠিক তাই।

এটা আবিষ্কার হবার পর কিছু ভূবিদ বহুদিন আগেই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, সমগ্র ভূত্বকটাই ভেসে রয়েছে। জলে-ভেসে-থাকা কাঠের টুকরোগুলোর মত ভূত্বকের উঁচু-নিচু, অসমান গঠনগুলোও



হালকা গ্র্যানাইট শিলার মহাদেশ যেন 'ভারি' ব্যাসল্ট শিলার উপর ভেসে রয়েছে। (১) ও (২)—দুটো বিভিন্ন মাপের কাঠের টুকরো জলে ভেসে রয়েছে।

যেন পরস্পরের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে। সমতার এই অবস্থা বা তার দিকে এগোনোর চেষ্টাকে বলা হয়ে থাকে সমস্থানিকতা বা 'আইসস্টেসী'।

জমি জেগে উঠল

বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর অবস্থাটা তো আর আজকের মত শান্ত ছিল না। সারা পৃথিবীর দেহটা জুড়ে তখন শুধু পরিবর্তনের খেলাই চলেছে। কোথাও কোথাও নমনীয় শিলার বিরাট বিরাট স্তূপ তেজস্ক্রিয়তায় তপ্ত হয়ে হাজার মাইল তলার গুরুমণ্ডল থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসত। এ জাতীয় ব্যাপার অতীত পৃথিবীতে বহুবার ঘটেছে এবং আজও ঘটছে।

অনেকে মনে করেন, সমগ্র ভূপৃষ্ঠ জুড়ে একদিন একটি ভারি ব্যাসল্ট শিলার আস্তরণ তৈরি হয়ে বসেছিল। তপ্ত হাল্কা গ্র্যানাইট শিলার প্রবাহ মাঝে-মাঝে নিচে থেকে উপরে উঠে আসত। তাদের ধাক্কায়

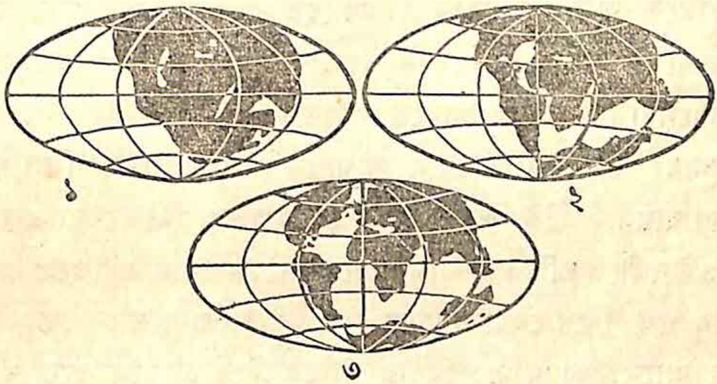
ব্যাসল্ট শিলার সরটা ভেঙে সরে গিয়ে কয়েকটি জায়গায় গ্র্যানাইটের একজোট হওয়ার কাজ শুরু হল। বহু কোটি বছর পরে ভূপৃষ্ঠের উপর বেশ বড় কয়েকটা গ্র্যানাইটের পিণ্ড এভাবে গড়ে উঠল। আশেপাশের ব্যাসল্ট শিলার তুলনায় তারা ছিল হালকা। ফলটা দাঁড়াল এই, তারাই উঁচু হয়ে ভেসে থাকল এবং গড়ে তুলল পৃথিবীর মহাদেশগুলো। যারা নিচে রইল, ভবিষ্যতে মহাসাগরের খাত হবার জন্যে তারা তৈরি হতে থাকল।

অমন শক্ত কঠিন পৃথিবীটার মধ্যে তরল পদার্থের মত নড়ে-চড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা কেমন করে দেখা দিল, তা ভাবতে অবাক লাগে বই কি। তবে, এই জাতীয় একটি অঘটন আদৌ ঘটানোর জন্যে পৃথিবী যে প্রচুর সময় পেয়েছিল হাতে, সেকথাটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। ভূত্বকের কোন অংশ যদি ৫০ কোটি বছরে ৫০০ মাইল পথও চলে বেড়িয়ে থাকে, তাহলে এক বছরে তার নড়বার দরকার ছিল মাত্র $\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি। মানব সভ্যতার ইতিহাস যদি ৬,০০০ বছর প্রাচীন হয়, তাহলে এই সময়টুকুর মধ্যে ভূত্বকের ঐ অংশটা চলে বেড়িয়েছে মাত্র ৩০ ফুট।

মহাদেশগুলো কি চলমান

কথাটা শুনে নিশ্চয়ই তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। মহাদেশগুলোর আবার পা গজাবে কেমন করে? কোন-কোন ভূবিদ কিন্তু সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন যে বিরাট চেহারার সব হিমশৈল (আইসবার্গ) যেমন মেরুসাগরের জলে ভেসে বেড়ায়, তেমনি মহাদেশগুলোও এখনো পৃথিবীর চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় যে, আজ থেকে বহু কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ নাকি একজায়গায় জড়ো হয়ে ছিল। আটলান্টিক মহাসাগরের তখন কোন অস্তিত্বই ছিল না। তারপর একদিন তপ্ত শিলার এক প্রবাহ ভূগর্ভ থেকে উঠে এসে সমস্ত স্থলভাগটাকে বিপুল

বেগে নাড়া দিল। ভূত্বক চিড় খেল সেই নাড়ায়। সেই ফাটল ক্রমেই চওড়া হতে শুরু করল। ফাটলটা চওড়ায় এবং গভীরতায় একশো বছরে হয়ত মাত্র কয়েক ফুট করে বাড়ছিল।



'চলমান মহাদেশ' তত্ত্ব। মহাদেশগুলো নাকি ধীরে ধীরে একে অপরের কাছ থেকে সরে আসছে

টুকরো-হয়ে-যাওয়া ফুটো স্থলভাগের মাঝখানকার ঐ ফাটলটায় মহাসাগরের জল ঢুকে পড়ে দিব্যি একটা খাড়ি বানিয়ে বসল। ২০ থেকে ৩০ কোটি বছরের মধ্যে চলমান স্থলভাগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঐ খাড়ি ক্রমে চওড়া হতে হতে আজকের আটলান্টিক মহাসাগরের মত বিরাট রূপ ধারণ করতে পারে। হয়ত আটলান্টিক মহাসাগর এজাতীয় একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে কিভাবে 'জিগ্-স পাজ্লের' মত ইয়োরোপ এবং আফ্রিকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়, সেকথা আগেই বলেছি। চলমান মহাদেশের তত্ত্ব যারা জানেন, তারা বলেন আটলান্টিকের দুই পারের স্থলভাগের ভূপ্রকৃতির মধ্যে নাকি অনেক মিল রয়েছে। উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম ইয়োরোপ—এই দু-জায়গারই প্রাচীন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে কয়লা-স্তরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল খুব প্রাচীন একটি হিমবাহের দ্বারা যে আচ্ছন্ন ছিল, তার প্রমাণ

এখনো সেখানে রয়েছে। হিমবাহটা তো আর হামাগুড়ি দিয়ে আটলান্টিকের জল থেকে উঠে আসে নি! দক্ষিণ আমেরিকাই একদিন আফ্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। যার জন্যে দক্ষিণ-আফ্রিকার উচ্চভূমিতে সৃষ্টি হয়ে কোন হিমবাহের সেখানে পৌঁছনোর জন্যে সাগর-পাড়ি জমানোর কোন দরকার ছিল না। জমির উপর দিয়েই সেটা দিব্যি চলে আসতে পারত।

ভূমধ্য এবং ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যেও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দুটিই প্রায় চারপাশে স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা এবং বহু দ্বীপ ও উপদ্বীপে ভর্তি। চলমান মহাদেশ তত্ত্বের কথায় এরা হচ্ছে একটি প্রাচীন স্থল দিয়ে ঘেরা সমুদ্রের পূর্ব এবং পশ্চিমাংশ। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা যদি পৃথিবীর পশ্চিম দিকে চলমান হয়ে থাকে, তাহলে আটলান্টিক মহাসাগরকে বয়সের বিচারে নবীন বলাই ঠিক হবে। সাগরটির বিস্তারও তাহলে ক্রমাগত বেড়েই চলছে। প্রশান্ত-মহাসাগরকে বয়সের বিচারে তাহলে প্রাচীন বলতে হয়। আটলান্টিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর বিস্তৃতি ধীরে ধীরে ছোট হবার কথা।

উত্তর আমেরিকা যদি ৩০ কোটি বছরে ইয়োরোপ থেকে ৩,০০০ মাইল পথ পশ্চিমে সরে এসে আটলান্টিকের সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে এক বছরে ঐ ভূভাগটির গতিবেগ ছিল মাত্র এক ইঞ্চি। উত্তর আমেরিকা এবং ইয়োরোপের মধ্যেকার দূরত্বকে সাধারণত মাইলেই প্রকাশ করা হয়। তাকে সঠিক ইঞ্চি বা ফুটের মাপে প্রকাশ করবার মত সূক্ষ্ম পরিমাপ-ব্যবস্থা এখনো তৈরি হয় নি। যেদিন তা হবে, তার পর থেকে প্রতি বছরই ঢাকঢোল পিটিয়ে পৃথিবীর লোককে জানিয়ে দেওয়া হবে, আমেরিকা ইয়োরোপ থেকে আরো কতটা দূরে সরে গেল।

চলমান মহাদেশ তত্ত্বের যে কথাগুলো এতক্ষণ বলা হল, তার সঙ্গে কিন্তু অনেক ভূবিদই আবার একমত নন। তাদের কথাটা

হল এই, মহাদেশগুলোকে ঐ রকমভাবে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা তাকে জোগালো কে? এ তো আর জলে কাঠের নৌকো ভাসানো নয়! গুরুমণ্ডলে শক্ত কঠিন শিলাস্তরের রাজত্ব। তার উপর দিয়ে মহাদেশরূপী ভূত্বকের চলাফেরার জন্যে কোন সুযোগ সুবিধে সে হঠাৎ করে দিতে যাবেই বা কেন? খুব বেশি শক্তি নিয়ে ঠেলাঠেলি করতে গেলে মহাদেশের জমির দুমড়ে বেঁকে যাবার কথা। পর্বত তৈরি হবার মূলে ঐরকম একটি কারণই নাকি রয়েছে।

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন প্রাণীজগতের মধ্যে বিবর্তনের ধারা কেন প্রায় একই সময়ে ঘটতে দেখা যায় এবং গত ৫০ কোটি বছরে পৃথিবীর জলবায়ুর মধ্যেই বা কেন এত বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, চলমান মহাদেশ তত্ত্বে তার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছিল। সেই তত্ত্বকে বাদ দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব আর কিভাবে দেওয়া যেতে পারে?

আটলাণ্টিকের রহস্য

কোন-কোন ভূবিদ আবার আর একটি নতুন ধারণা উপস্থিত করলেন। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত আটলান্টিক মহাসাগরের তলা দিয়ে একটি বিরাট পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত হয়ে আছে। একদিকে ইয়োরোপ এবং আফ্রিকা, অন্যদিকে দুই আমেরিকা মহাদেশ—এদের ঠিক মাঝামাঝি জায়গা ধরে এ পর্বতটির অবস্থান। পর্বতটি জলের উপর কোথাও-কোথাও মাথা তুলে কয়েকটি আগ্নেয়-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে, যেমন, অ্যাজোরস্, অ্যাসেন্‌সিয়ন, ত্রিস্তান দা কান্‌হা ইত্যাদি। কিন্তু এর বেশির ভাগ অংশের অবস্থান জানবার জন্যে গভীর-সমুদ্র গবেষণার যন্ত্রপাতির সাহায্য নিতে হয়েছে। ঐ পর্বতের আশেপাশে সমুদ্রগর্ভের পলিতে টাটকা জলের বাসিন্দা

ডাই-এ্যাটমদের জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে। এ থেকে সিদ্ধান্তটা এই দাঁড়ায় যে কোন-না-কোন সময়ে এই জায়গাগুলো নিশ্চয়ই সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে ছিল। ডাই-অ্যাটমেরা সেইসব জায়গার পুকুর বা হ্রদের টাটকা জলেই বাস করত।

মহাদেশ তৈরির নতুন ধারণার রচয়িতারা বলছেন, সমগ্র মধ্য-আটলান্টিক পর্বতশ্রেণী একদিন মহাসাগরের উপরে ছিল। ঐ পর্বতের দেহটা সেদিন পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত একটা বিরাট স্থলরূপী বাধার প্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছিল। পর্বতটা সেই সময়ে উপসাগরীয় স্রোতের পথ দিয়েছিল রুদ্ধ করে। তার ফলে ঐ স্রোতের উষ্ণ জলের প্রবাহ সুমেরু পর্যন্ত পাড়ি জমাতে পারছিল না। পর্বতের অন্যদিকে দক্ষিণাভিমুখী একটি সামুদ্রিক স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই সমুদ্রস্রোতের সাহায্যে তৈরি হল একটি মৃদুমন্দ এবং আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ। এ বায়ুপ্রবাহ উত্তর আফ্রিকা ও আইবেরীয় উপদ্বীপের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেই অঞ্চলগুলি সবুজ শ্যামল রমণীয়তায় ভরিয়ে তুলল।

আজকের সাহারা মরুভূমিও সেদিন ছিল রমণীয় একটি স্থান। অবশ্য ঐ সময় সর্বাধুনিক তুষার যুগটির আবির্ভাবে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার উত্তরাংশ বরফে ঢাকা পড়ে যায়।

তারপর আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে, মধ্য-আটলান্টিক পর্বতশ্রেণী হঠাৎ নিচে বসে যেতে শুরু করল। আটলান্টিকের জলের তলায় তলিয়ে গেল বিরাট পর্বতটা। উপসাগরীয় স্রোত অবাধে বয়ে চলল উত্তরদিকে। ঐ স্রোতের উষ্ণতার স্পর্শে মেরু অঞ্চলের হিমবাহ গলে গিয়ে উত্তর ইয়োরোপের আবহাওয়া মৃদুভাবাপন্ন করে তুলল। উপসাগরীয় স্রোতের পাশাপাশি দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বয়ে চলল ঠাণ্ডা ক্যানারি স্রোত। গ্রীষ্মমণ্ডলে পৌঁছে ঐ স্রোতের বরফ-গলা জল তপ্ত হয়ে উঠবে। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে উত্তর আফ্রিকার জলবায়ুতে যে পরিবর্তন

ঘনিয়ে এল, তার প্রভাবে একদিনের সবুজ সাহারা বিরাট মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায়।

সমগ্র আটলান্টিক মহাসাগরটার মধ্যে এক অতলান্ত রহস্যের উঁকিঝুঁকি। সেই রহস্যের কিনারা যেদিন হবে, সেদিন মহাদেশগুলো তাদের ভুলে-যাওয়া জন্ম-ইতিহাস আবার হয়ত ফিরে পাবে।

ভূমিকম্প

প্রকৃতির কত রূপের সঙ্গেই না মানুষের পরিচয় ঘটে। কিছু তার পরম রমণীয়, কিছু ভয়ঙ্কর। কত প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা বশীভূত করেছে। কিন্তু ভূমিকম্পের কাছে সে পরম অসহায়। প্রকৃতির এই সর্বনাশা বীভৎস তাণ্ডবটিকে আজও সে আপন আয়ত্তে আনতে পারে নি।

পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ভূমিকম্প প্রতি দিন, প্রতি ঘণ্টায় ঘটছে। খুব ছোট কম্পনগুলোকে যদি আমরা হিসেবের মধ্যে ধরি, তাহলে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে হয়ত প্রায় দশ লক্ষের মত ভূমিকম্প ঘটতে দেখা যাবে। তার মধ্যে গড়ে প্রতি বছর ডজন-খানেকের মত বড় আকারের ভূমিকম্প ঘটে। গোটা-দুয়েক আবার খুবই জোরালো মাপের হয়ে দাঁড়ায়। খুব সৌভাগ্যের কথা হল এই যে, বেশির ভাগ ভূমিকম্প লোকালয়ের কাছাকাছি ঘটে না। তা যদি ঘটত, তার পরিণতি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এখন কথা হল, ভূমিকম্প বলতে আমরা কী বুঝি? ভূমিকম্প হলে মাটিই বা কেঁপে ওঠে কেন? প্রাকৃতিক এবং মানুষের হাতে গড়া সব বস্তু মাটিতে আছড়ে ফেলার মত বিপুল শক্তিই বা ভূমিকম্পকে জোগায় কে?

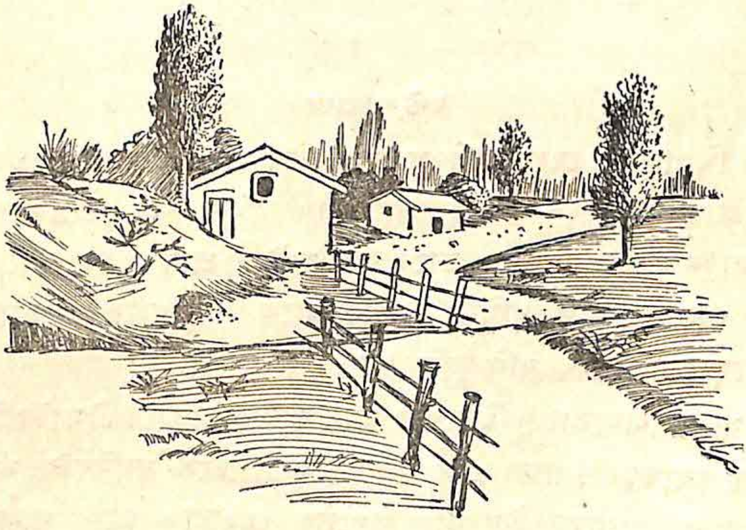
সান অ্যাণ্ড্রিয়াস্ রিফ্‌ট্

ভূমিকম্পের সময় ভূত্বকের মধ্যে কী ধরনের আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, কিছুকাল আগে পর্যন্তও তা খুব ভালভাবে জানা ছিল না। গত ৭৫ বছর ধরেই ভূবিদরা কিন্তু নানারকম উপায়ের মাধ্যমে এবিষয়ে সঠিক তথ্য হাতে পাবার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৬০ সালের ১৮ই এপ্রিল সান্‌ফ্রান্সিসকোতে যে ভূমিকম্পটি হয়, তার ফলাফল পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নতুন অনেক কিছুই

জানা গেল। ভূমিকম্পটি ভূত্বকের মধ্যেই যে কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছিল, তার কিছু নাটকীয় সাক্ষ্য আমাদের পরীক্ষার জন্যে রেখে যেতে সে ভোলে নি।

সান্‌ফ্রান্সিসকো হল আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের একটি শহর। ঐ শহরটির কাছাকাছি জায়গায় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের উপর একটি লম্বা ফাটল দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এ কতগুলো ফাটলেরই সমষ্টি। এর নাম রাখা হয়েছে সান অ্যাণ্ড্রিয়াস রিফ্‌ট্‌। এই ফাটলটি অবশ্য বহুদিন ধরেই রয়েছে, কিন্তু তাকে নিয়ে এতদিন কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় নি।

১৯৬০ সালের ভূমিকম্পের পর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, ঐ ফাটলটির পশ্চিমদিকের ভূভাগ পিছলে উত্তর দিকে চলে এসেছে, পুবদিকের ভূভাগ আবার সরে গেছে দক্ষিণদিকে। এই

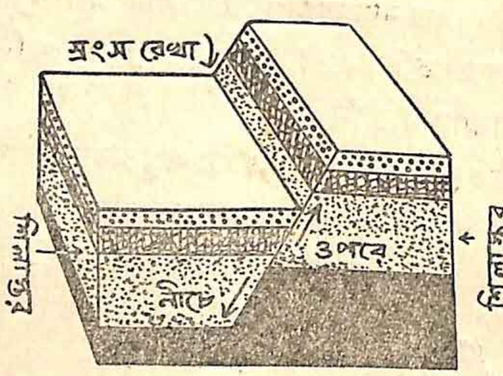


'সান অ্যাণ্ড্রিয়াস্ রিফ্‌ট্‌'। সোজা রাস্তা দু-টুকরো হয়ে একে অপরের কাছ থেকে সরে এসেছে।

নড়াচড়ার ফলে যে সব রাস্তা বা কাঠের বেড়া ফাটলটা পার হচ্ছিল, তাদের একপাশের অংশকে দেখা গেল, কেউ যেন ঘাড়

ধরে আগেকার জায়গা থেকে ১২ বা ১৫ ফুট দূরে এনে বসিয়ে দিয়েছে। রাতারাতি যেন এক ভোজবাজি ঘটে গেছে সেখানে।

আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল কী? আমরা জানি, ভূত্বকের শিলার উপর সব সময় নানা ধরনের চাপ তৈরি হচ্ছে। ঐ জাতীয় চাপের প্রভাবে ভূত্বকের শিলাস্তূপ একে অপরের গা ঘেঁষে বিপরীত দিকে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু চাপের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে



ফল্ট্ বা স্রংস

যখন শিলাস্তূপের দেয়ালে বিপুল বেগে সঙ্ঘাতের সৃষ্টি করে, তখন সে আর তা ধারণ করতে পারে না। শিলা তখন ভেঙে যায়। যে লাইন ধরে তারা ভাঙে, তাকে বলে ফল্ট্ বা স্রংস। শিলাদেহের এই ভাঙনের ফলে পৃথিবী কাঁপতে থাকে। পৃথিবীর এই হঠাৎ-নড়াচড়াকেই আমরা বলি ভূমিকম্প।

সান্‌ফ্রান্সিসকোর ভূমিকম্পের সময় তার কাছাকাছি ঐ ফাটলটির তলায় ভূত্বকের শিলাস্তর একে অপরের গা পিছলে খানিকটা সরে গিয়েছিল। তাদের উপরকার ভূপৃষ্ঠের চেহারাও তাই পালটে যায়। এক্ষেত্রে শিলাস্তরের নড়াচড়াটা ঘটেছিল আনুভূমিকভাবে (হরাইজণ্টালি)। তা না হয়ে সেটা খাড়া (ভারটিকালি) বা কোনাকুনি যে-কোনভাবেই ঘটতে পারত।

১৮১৯ সালের ১৬ই জুন ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তে কচ্ছের রান

অঞ্চলে একটি ভূমিকম্প হয়। তার ফলে যে ফল্ট তৈরি হল, তার এক পাশ বরাবর সব শিলা দিব্যি ২০ ফুট খাড়া উঠে গেল। আর-একপাশে তারা ১০ ফুট নিচে নেমে এসে ৩০ ফুট উঁচু একটি ছোট্ট পাহাড় বানিয়ে বসল।

১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে ভূমিকম্পের সময় সেখানকার একটি উপসাগরের উপকূলভাগ খাড়া ৪৭½ ফুট উপরে উঠে এসেছিল।

ৎস্যুনামি

ভূপৃষ্ঠের ¾ অংশ জুড়ে জল, মহাসাগরের এলাকা। সেইজন্যেই পৃথিবীর বেশির ভাগ ভূমিকম্প মহাদেশের তুলনায় মহাসাগরের গর্ভেই ঘটে থাকে। সমুদ্রগর্ভে যে-সব ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়, তাদের মূলেও রয়েছে ভূত্বকের শিলাস্তরের একই ধরনের নড়াচড়া। এই-জাতীয় একটি ভূমিকম্প থেকে মাঝে-মাঝে পর্বতপ্রমাণ রাক্ষুসে ঢেউ তৈরি হতে দেখা যায়। এদেরই বলে ৎস্যুনামি।

ৎস্যুনামির শুরুতে উপকূল থেকে সমুদ্রের জল হঠাৎ পিছিয়ে যেতে শুরু করে। বিরাট ঢেউয়ের আকারে সমুদ্র আবার যখন ফিরে আসে, তখন সেই ঢেউয়ের মাথা ৫০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৫৫ সালের নভেম্বর মাসে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহর একটি মারাত্মক ভূমিকম্পে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির তলায় চাপা পড়ে ৬০,০০০ লোক মারা যায়। অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বন্দরের জাহাজঘাটায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। ভূমিকম্প শুরু হবার কয়েক মিনিট পরে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে একটি ৎস্যুনামি ছুটে এসে তাদেরও ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। ৎস্যুনামি তৈরি করে যে সব ভূমিকম্প তারা সাধারণত জন্মায় সমুদ্রের তলাকার গভীর ফাটলের মধ্যে।

অতীতকালে পৃথিবীতে যে সব ভূমিকম্প ঘটেছে, অনেক পর্বত

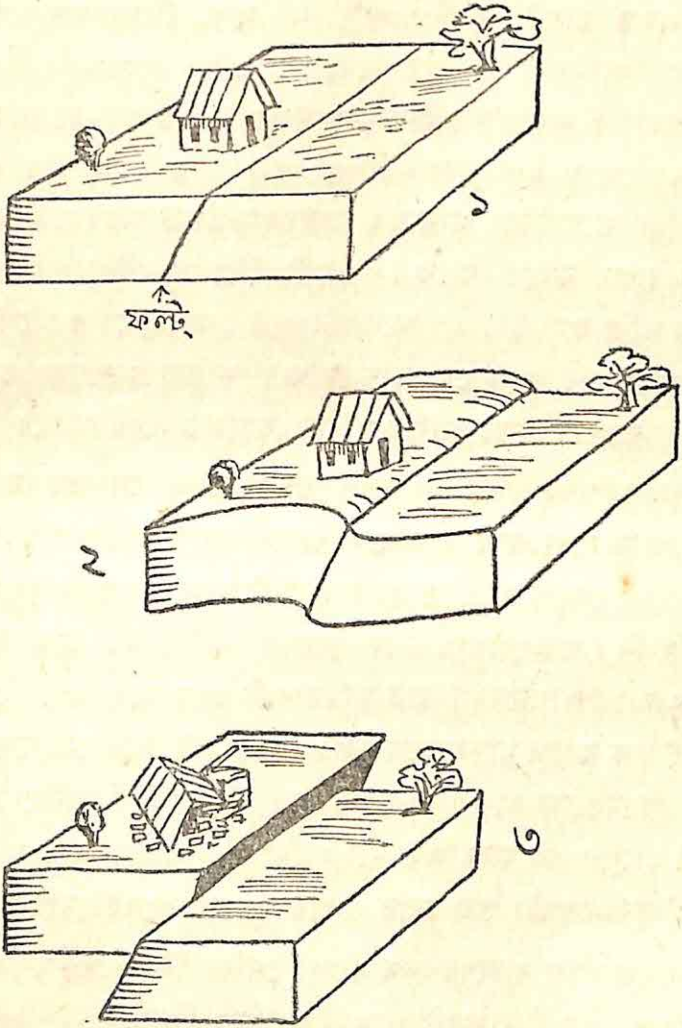
তার স্মৃতিচিহ্ন আপন-আপন দেহ জুড়ে সাজিয়ে রেখেছে। কোথাও হয়ত আমাদের চোখে পড়ল একটি চিড় (ক্র্যাক)। সুন্দরভাবে স্তরীভূত একটি পর্বতের শিলাদেহের উপর থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে সেটি। চিড়ের এক পাশটায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে, স্তরগুলোর নিজের-নিজের লাইন আর সোজা নেই। তফাতটার মাপ বেশ কয়েক ফুট। এ থেকে পরিষ্কার প্রমাণ মিলছে, শিলাস্তরের গঠন কোন সময়ে ভেঙে গিয়েছিল! শিলাস্তূপ দু-টুকরো হয়ে ফল্ট বা ভাঙা জায়গা বরাবর বিপরীত দিকে নড়াচড়া করতে বাধ্য হয়েছে। এই নড়াচড়ার সময়ে যে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাটি কাঁপে কেন

একটি ভূমিকম্পের সময় কত হাজার হাজার মাইল জুড়েই না শিলাস্তর নড়াচড়া করতে থাকে! নড়াচড়াটা হয় এত হঠাৎ এবং প্রচণ্ডভাবে যে খুব সহজেই মনে হতে পারে, নিশ্চয়ই কোন বিপুল বিস্ফোরণ তার মূলে রয়েছে। কিন্তু একটা বড় জাতের ভূমিকম্প ঘটানোর মত তাকত রাখে, এমন কোন বিস্ফোরক শক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎদগারের সময়ে যে কম্পনের সৃষ্টি হয়,তার জোরটা টের পাওয়া যায় আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি জায়গাতেই। কিছুটা দূরে সেই প্রভাব যায় মিলিয়ে।

ভূমিকম্প হঠাৎ এবং প্রচণ্ডভাবে ঘটবার কারণ হল, এই শিলা বিপুল পরিমাণ শক্তি আপন দেহে সঞ্চয় করে নিয়ে তার সবটাই একসঙ্গে মুক্তি দিতে পারে। মনে কর, কোন শক্তির বহুদিনের টানা পোড়েনে ভূত্বকের কোথাও চাপের সৃষ্টি হল। যারা এতদিন পরম শান্তিতে পাশাপাশি বাস করছিল, সেইসব শিলাস্তর চাপের প্রভাবে বিপরীত দিকে নড়াচড়া শুরু করে দিল। এ ধরনের

নড়াচড়ার কথা আমরা আগেই বলেছি। নড়াচড়ার সময় শিলা-দেহের দু-পাশের প্রান্তভাগ বেঁকে যেতে থাকে। এই বিকৃতি



(১) শিলাস্তরে ফল্ট্ দেখা দিল

(২) ইলাস্টিক ঈল্ড্

(৩) ভূমিকম্পের পর

কাটিয়ে উঠবার জন্যে শিলার একমাত্র উপায় হল চাপের পেষণে নিজের দেহটাকে খুব নমনীয়ভাবে সঁপে দেওয়া (ইংরেজিতে যে

অবস্থাটাকে বলে প্ল্যাস্টিক ঈল্ড্)। প্রায় জলের মত বয়ে যাওয়ার সঙ্গেও এই অবস্থাটির তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সমস্ত চাপটা কাটিয়ে ওঠা না যায়, শিলা তখন নিজের দেহকে খানিকটা ছড়িয়ে দেয়। এই ছড়ানোটা একটি 'স্থিতিস্থাপক অবস্থা'র (ইলাস্টিক্ ঈল্ড্) সঙ্গে তুলনীয়। চাপের প্রভাব থেকে মুক্ত হলেই শিলা তার বিকৃতি ঘুচিয়ে আবার স্বাভাবিক রূপে ফিরে আসবে। এইরকম একটি অবস্থায় শিলা-দেহ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। একটা স্প্রিংকে বেঁকালে তার মধ্যে যেমন শক্তি জমা হয়, এও অনেকটা তাই। আরো বেশি চাপে শিলা যদি ভেঙে যায়, তখন সে তার সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে চাপমুক্ত একটা স্প্রিংয়েরই মত আবার পুরনো চেহারায় ফিরে আসবে।

ভূত্বক খুবই কঠিন। বেশ বড় চাপেও সে শুধু মচকাবে, কিন্তু তার মধ্যে ফল্ট বা ভাঙন ধরাতে গেলে সেই চাপটাকে হতে হবে প্রচণ্ড জোরালো। ভাঙবার মুহূর্তটি যখন এল তখন খুব সামান্য একটুখানি চাপও বোঝার উপর শাকের আঁটির মত হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৩ সালে জাপানের বিরাট ভূমিকম্পটি যখন ঘটে তখন সেখানে বিরাট এক ঝড়ের মাতন চলেছিল। স্বভাবতই, জাপানের উপর সে সময় বায়ুমণ্ডলের চাপ ছিল খুবই কম। জাপানী বিজ্ঞানীদের মতে বায়ুর চাপের এই অবনতিই নাকি 'বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবার মতন' ভূমিকম্পটা শুরু হবার বন্দোবস্ত পাকা করে দিয়েছিল।

অসহ্য চাপ ধারণের শেষ সীমায় পৌঁছে শিলা-দেহ যখন ভেঙে যায়, তখন সে ঠিক একটা ভাঙা ইস্পাতের স্প্রিঙের মতনই কাঁপতে থাকে। শিলা যেখানে ভাঙল, সেই প্রান্তদুটো আবার দু-টুকরো-হয়ে-যাওয়া স্প্রিঙেরই মত ছিটকে ফিরে আসে। ঠিক এরই জন্যে মাটিতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কোন জায়গায় শিলাস্তরের কম্পন এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অন্য শিলাস্তরের মধ্যেও ভাঙন ঘটাতে পারে। ফলে অবিচ্ছিন্নভাবে কম্পন তৈরি হয়ে চলে। সমগ্র অঞ্চলটা হয়ত

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো বা দিনের পর দিন ধরে কাঁপতে থাকে। অবশেষে ভূত্বকের শিলা যখন চাপের পেষণ থেকে মুক্তি পায়, নিজেদের ঘরসংসার তারা আবার আগের মত সামলে নেয়। অস্থির অশান্ত মাটির বুকে আবার ফিরে আসে পরম শান্তি।

কয়েকশো মাইল দীর্ঘ শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, তা বহুদূর পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠকে কাঁপিয়ে তোলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ মাইল গভীরে যে ভূমিকম্প তৈরি হয়, তার কোন প্রভাব জমির উপর অনুভূত হয় না। ওই লম্বা রাস্তা পাড়ি জমাতে গিয়ে ভূমিকম্পের সবটুকু শক্তি মাঝপথেই খোয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের একেবারে কাছাকাছি যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি, তার জোরালো কম্পন এক বিস্তীর্ণ জায়গাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে তুলতে পারে।

কয়েক হাজার অ্যাটম (পারমাণবিক) বোমা একসঙ্গে ফাটিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায়, একটা বড়জাতের ভূমিকম্পের শক্তির সঙ্গে অনায়াসে তার তুলনা চলতে পারে।

'পি' ও 'এস' তরঙ্গ

ভূমিকম্পের ফলে মাটিতে যে দু-জাতের কম্পন তৈরি হয় তাদের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তাদের সাহায্যে কিভাবে ভূগর্ভের গঠনপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে সে কথাও আলোচনা করা হয়েছে। বেশি জোরে দৌড়োয় যে, সে হল প্রাইমারি বা 'পি' তরঙ্গ। আর যে আস্তে দৌড়ে পরে এসে পৌঁছয়, সে হল সেকেণ্ডারি বা 'এস্' তরঙ্গ। দুটি তরঙ্গের গতিবেগ জানা রয়েছে। কাজেই এক জায়গা থেকে দৌড় শুরু করে 'পি' 'এস' তরঙ্গের চেয়ে কত আগে গ্রাহকযন্ত্রে এসে পৌঁছল, সেই ছোট্ট হিসেবটুকুর মধ্য দিয়ে ভূমিকম্পের কেন্দ্রের দূরত্ব চট করে বেরিয়ে পড়বে। যদি 'পি' 'এস্'-এর ২০ সেকেণ্ড আগে এসে পৌঁছয়, তাহলে এই দূরত্ব হবে ১০০ মাইল,

আর যদি ২ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড আগে পৌঁছয় তাহলে ঐ দূরত্ব দাঁড়াবে ১,০০০ মাইল। এভাবে ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে অন্য যে-কোন দূরত্বই জেনে ফেলা যায়।

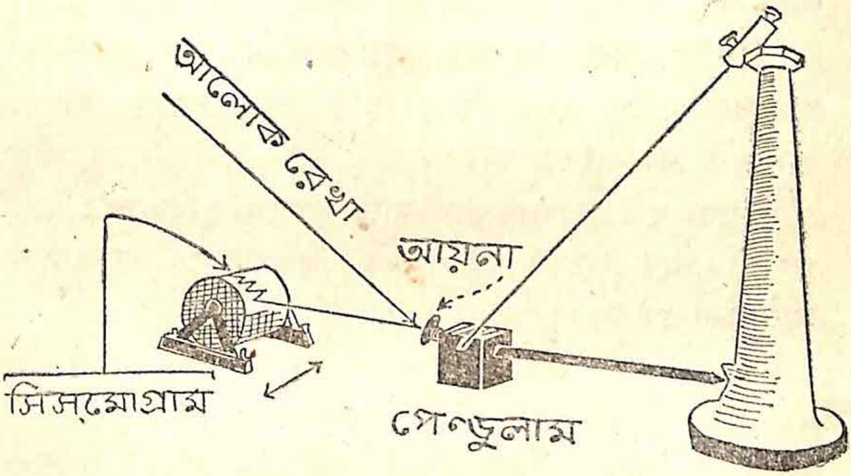
সিস্‌মোগ্রাফ বা ভূকম্পন যন্ত্র

সারা পৃথিবী জুড়ে ভূকম্প-তরঙ্গদের ধরা এবং লিপিবদ্ধ করে রাখবার জন্যে ফাঁদরূপী যে যন্ত্রটি ভূবিদরা ব্যবহার করছেন, সেটি হল সিস্‌মোগ্রাফ। এই যন্ত্রটির একটি অত্যন্ত সাধারণ নমুনার কথাই ধরা যাক। এর মধ্যে স্থিরভাবে ঝোলানো রয়েছে একটি পেণ্ডুলাম বা দোলক। কোন ভূমিকম্পের তরঙ্গ হয়ত এসে মাটিকে কাঁপিয়ে তুলল। পায়ের তলার জমিটা যখন ডানদিকে কাঁপবে তখন দোলকটি কিন্তু জাড্যের (ইনারশিয়া) ফলে স্থির অবস্থায়ই থাকবে। কোন পর্যবেক্ষকের চোখে কিন্তু মনে হবে, দোলকটি যেন বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। আবার নিচের মাটি যখন বাঁ দিকে কাঁপবে তখন দোলকটি ডান দিকে সরে যাচ্ছে বলে তার মনে হবে। দোলকটির মধ্যে কিন্তু জাড্যের ফলে কোন গতিসৃষ্টি হয় নি।

দোলকের প্রান্তে একটি কলম লাগানো রয়েছে। মাটির কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে কলমটি একটি চলন্ত ফিতে বা কাগজের উপর তরঙ্গায়িত দাগ কেটে চলবে। এভাবে যে রেখাচিত্রের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সিস্‌মোগ্রাম।

একটি আধুনিক সিস্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে পেণ্ডুলাম বা দোলকরূপী ওজনটি একটি অনুভূমিক (হরাইজন্টাল) দণ্ডের প্রান্তে বসানো থাকে। দোলকটি তারের সাহায্যে আর-একটি খাড়া দণ্ডের উপর প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। মুখোমুখি একটি ছোট ড্রাম বসানো আছে। ঘড়িজাতীয় যন্ত্র-ব্যবস্থার সাহায্যে ঐটিকে ঘোরানো হয়। ড্রামটির গায়ে ছবি তোলার ফিল্ম জড়ানো। দোলকটির উপরে

বসানো একটি আয়না থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ফিল্মের উপর এসে পড়ছে। ড্রামটি যতক্ষণ স্থির থাকবে, ফিল্মের উপর আলোর রশ্মির ছবিটা হবে সরলরেখার মত। ভূকম্প-তরঙ্গের ধাক্কায় দোলকটি জাড্যের জন্যে এতটুকুও নড়বে না। কিন্তু মাটির



সিস্‌মোগ্রাফ

সঙ্গে সঙ্গে ড্রামটিও উঠবে কেঁপে। ড্রামের ফিল্মের উপর আলোর এক তরঙ্গায়িত রেখাচিত্র তৈরি হতে থাকবে। এই রেখাচিত্র বা সিস্‌মোগ্রাম বিশ্লেষণ করে ভূবিদরা ভূমিকম্প-সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন।

কিছু কিছু ভূমিকম্প পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটে। কিন্তু বেশির ভাগ ভূমিকম্পকে বিশেষ কয়েকটি মণ্ডলের মধ্যেই ঘটতে দেখা যায়। এর মধ্যে বৃহত্তম মণ্ডলটি প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে রয়েছে। পৃথিবীর শতকরা আশিভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি এখান থেকেই। প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশে নতুন নতুন পর্বত সৃষ্টি হচ্ছে। সাগর-গর্ভ কোথাও নিচের দিকে বসে যাচ্ছে। ফলে ভূত্বকে প্রচণ্ড চাপ এবং পেষণ তৈরি হয়ে চলেছে। ভূত্বকে এই প্রচণ্ড চাপে শিলাস্তর ভেঙে গিয়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

আর-একটি মণ্ডল ভূমধ্যসাগর এবং হিমালয় পর্বতের মধ্য দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমদিকে প্রসারিত। ভূপৃষ্ঠে এমন জায়গা খুব কমই আছে ভূকম্প-তরঙ্গের প্রভাব যেখানে অনুভূত হয় নি বা ভবিষ্যতে জোরালো ভূকম্প-তরঙ্গের ধাক্কায় যার মাটি আবার কেঁপে উঠবে না।

পৃথিবীর যে-সব জায়গায় ভূপৃষ্ঠের গঠনের মধ্যে কিছু-কিছু পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়, ভূমিকম্পের সম্ভাব্য জায়গার তালিকায় তারা সর্বাগ্রে স্থান পাবে।

পর্বতের সৃষ্টি এবং তার জীবন-নাট্যের সঙ্গে ভূমিকম্পের একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। এই পর্বতের ইতিকথা নিয়ে এবারে আমরা আলোচনা শুরু করব।

৬

পর্বতের কথা

পৃথিবীর এক বিরাট ঐশ্বর্য তার সমুন্নত পর্বতগুলো। তুষারাচ্ছন্ন পর্বতের মহিমা এবং সৌন্দর্য সবাইকেই মুগ্ধ করে। এই শিলার দৈত্যগুলো কবে কেমন করে পৃথিবীর জমির উপর জাঁকিয়ে বসল, তোমাদের নিশ্চয়ই তা জানতে ইচ্ছে করে। অমন শক্ত, কঠিন ভূত্বকের উপর ভাঁজের পর ভাঁজ শিলাদেহ প্রসারিত করে দিয়ে পর্বতের রাজত্ব চলছে। এ ঘটনাটির আগে পরস্পরের মধ্যে শক্তির একটি বোঝাপড়াও কি কখনো হয় নি?

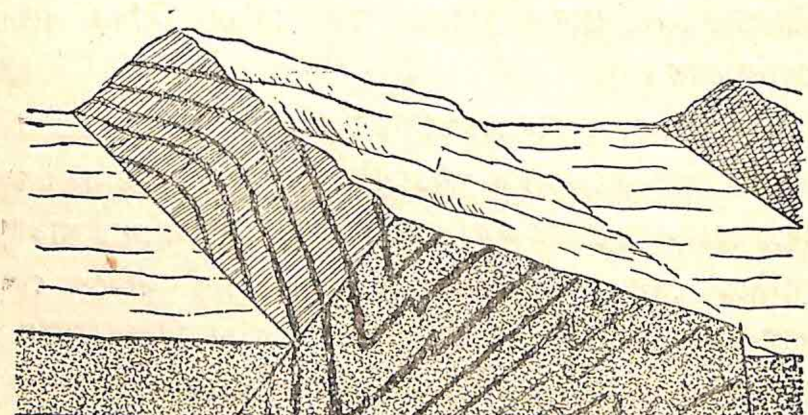
দেড়শো কোটি বছর আগের কথা বলছি। পৃথিবীতে পর্বতের সৃষ্টি তখনো হয় নি। মহাদেশের জমি তখন ছিল খুব নিচুতে। স্থলভাগের মধ্যে অগভীর সমুদ্র এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছিল অনেক। সমুদ্রগুলো মহাদেশের জমির উপর বৃষ্টিপাত এবং তাপ সমভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছিল। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র, এমনকি সুমেরু এবং কুমেরু মহাদেশেও জলবায়ু ছিল মৃদুভাবাপন্ন। আজকের গ্রীনল্যাণ্ড এবং সুমেরু কুমেরুর বুকেও সেদিন নিবিড় অরণ্য শোভা পেত।

তারপর একদিন মহাদেশগুলোর নিচু জমি উঁচুতে উঠে এল। ভূপৃষ্ঠের উপর ধীরে ধীরে পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়াল। স্থল দিয়ে ঘেরা সমুদ্রগুলোর জল কিছুটা গড়িয়ে, কিছুটা বাষ্পের আকারে পালিয়ে গেল। স্থলভাগের উঁচু হওয়া এবং জমিতে ঘেরা সাগরগুলোর অন্তর্ধান, এই দুটি কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় জলবায়ু যেমনি ঠাণ্ডা, তেমনি শুকনো হতে থাকল। কোন-কোন জায়গায় মরুভূমি দেখা দিল। পর্বতের উপর বরফ জমতে শুরু করল। ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি জায়গা এবং সমগ্র কুমেরু মহাদেশ বরফের স্তরের তলায় চাপা পড়ে গেল।

আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি, যখন পর্বত গড়ার কাজ চলেছে জোর গতিতে। এই পর্বতগুলো নিজেরা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মরুভূমি, হিমবাহ এবং চরম শীত ও গ্রীষ্মের আবহাওয়াও গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। এই ঘটনাগুলোর দ্বারা আবার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য ও বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

মহাদেশের জমির উপরে বা সাগরগর্ভে, পৃথিবীর সব পর্বতই মোটামুটি চার ধরনের হয়ে থাকে। কিছু পর্বত, যেমন ভিস্যুভিয়াস এবং ফুজিয়ামা, লাভার সমবায়ে গড়ে উঠেছে। এরা হল আগ্নেয় পর্বত। আবার কোন সমতল উচ্চ ভূমিকে নদী ক্ষয় করতে করতে কালক্রমে উপত্যকা এবং কতকগুলো উঁচু জায়গায় ভাগ করে ফেলে। এই শৈলশিরাগুলোকে (রিজ্) এক ধরনের পর্বত বলা যেতে পারে। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক প্রদেশের ক্যাটস্কিল পর্বত এ-জাতীয় একটি দৃষ্টান্ত।

আবার কোথাও ভূত্বকের শিলাস্তরের কতকগুলো স্তূপ (ব্লক) উপরে নিচে ওঠানামা করে স্তূপ-পর্বত গড়ে তুলতে পারে।



স্তূপ পর্বত

ভারতবর্ষের কচ্ছের রান-এ ভূমিকম্পের সময় এ-রকম একটি

ছোট স্তূপ-পর্বত তৈরি হবার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু পৃথিবীর বেশির ভাগ এবং দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী—যেমন, হিমালয়, অ্যাণ্ডিজ, রকি, আপালাসিয়ান, আল্পস প্রভৃতি সবাই যে দলে পড়ে, তা হল ভঙ্গিল বা বলিত (ফোল্ডেড্) পর্বত। ভূত্বকের উপরটা যেন ভাঁজ পড়ে গিয়ে এরা সৃষ্টি হয়েছে।

এই চার ধরনের পর্বতের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল দেখতে পাওয়া যায়। এরা সবাই প্রধানত পাললিক শিলা দিয়ে তৈরি।

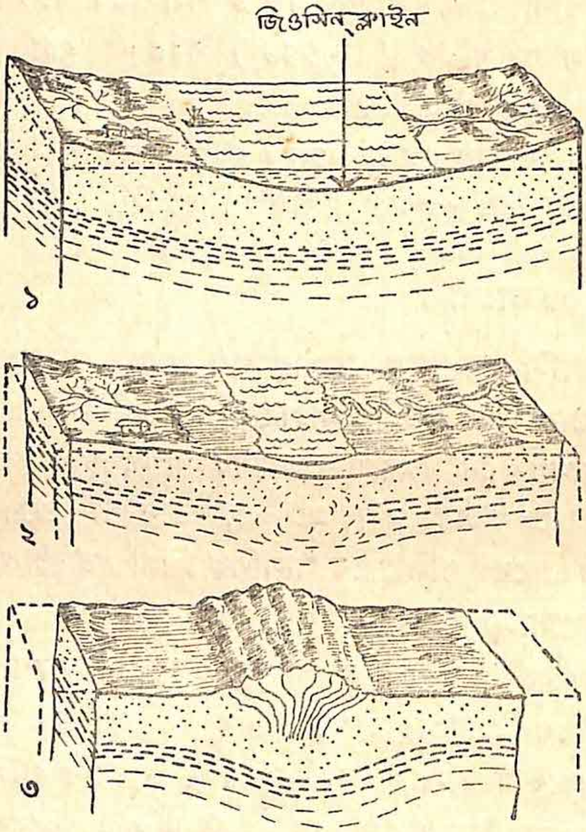
পর্বত তৈরির কারখানা

আমরা জানি, পাললিক শিলার জন্ম হয়েছে সমুদ্রের তলায়। বৃষ্টি, বাতাস এবং তুষারের সঙ্ঘাতে আগ্নেয় শিলার দেহ ক্ষয় পেয়ে চলে। সেই ক্ষয়ের অবশেষ বালি, চুন এবং অন্যান্য বস্তুর আকারে প্রধানত নদীর জলে বয়ে এসে পলি রূপে জমা পড়ে সাগরগর্ভে। সেই পলি থেকে পাললিক শিলা তৈরির কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

পর্বতগুলো আজ যে জায়গা জুড়ে রয়েছে ভূত্বকে, সেগুলো একদিন ছিল বিরাট গভীর গর্ত (ট্রাফ্)। ভূবিদ্যায় এদের নাম দেওয়া হয়েছে জিওসিন্ক্লাইন। নদীর জল তাদের পলির বোঝা এনে এদের মধ্যেই মুক্ত করে দিত। এইসব পলির স্তরের মধ্যে যে-সব উপাদান এবং জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া যায়, সাধারণত অগভীর জলে তাদের থাকবার কথা। তাহলে সোজা কথাটা দাঁড়াল এই, পর্বত তৈরির ঐ আদি কারখানা বা জিওসিন্ক্লাইন একদিন ছিল ছোটখাট কতকগুলো সমুদ্র। ওদের গভীরতা হয়ত হাজার-খানেক ফুটের চেয়ে বেশি ছিল না।

জমির উপর পর্বতের শিলাস্তর কোথাও কোথাও কয়েক মাইল পুরু। অথচ তাদের সর্বাঙ্গ জুড়ে অগভীর জলের পলির সমাবেশ। এ বিচিত্র ব্যাপারটা ঘটল কিভাবে? তার একমাত্র ব্যাখ্যাটা

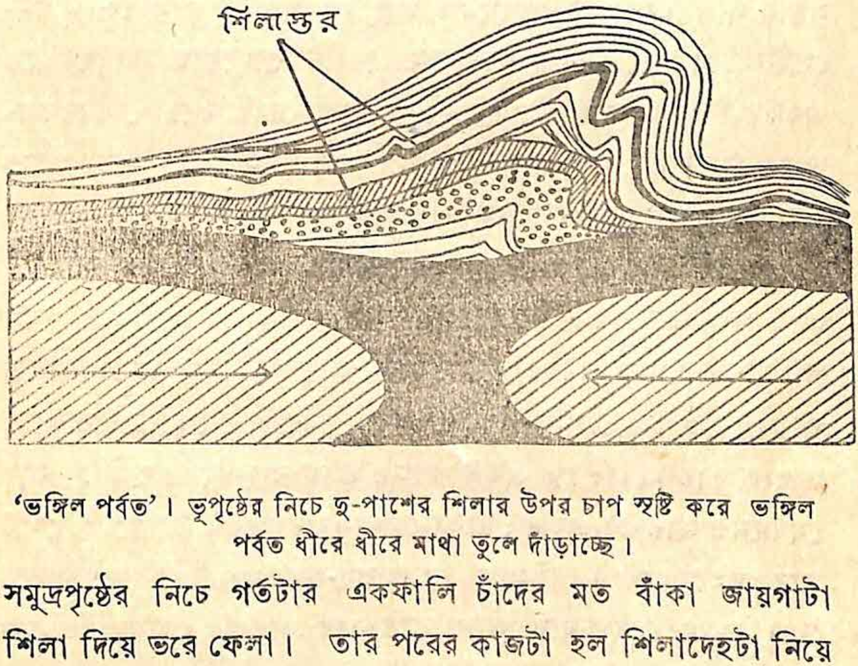
বোধহয় এই যে, পলি যেমন জমা পড়ছিল, তার চাপে ঐ জিওসিন্‌ক্লাইনরূপী সমুদ্রগুলোর তলাটা ক্রমেই নিচের দিকে বসে যাচ্ছিল।



(১) জিওসিন্‌ক্লাইন তৈরি হয়ে রয়েছে।
(২) জিওসিন্‌ক্লাইনের মধ্যে নদী স্তরে স্তরে পলি এনে জমা করছে।
(৩) জিওসিন্‌ক্লাইনের মধ্যে পাললিক শিলার পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

পলি জমা পড়তে থাকা এবং সাগর-গর্ভ বসে যাওয়া, এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোথাও একটি চমৎকার সামঞ্জস্য নিশ্চয়ই বজায় ছিল। ফলে অগভীর সমুদ্রগুলোয় জলের মাত্রার বিশেষ উনিশ-বিশ হয় নি, অথচ ভূপৃষ্ঠের নিচে পর্বতের ভবিষ্যৎ দেহের মাপটা ক্রমেই বেড়ে উঠছিল।

জিওসিন্‌ক্লাইনরূপী গর্তটার মধ্যে শিলাস্তরের চেহারা ক্রমে নিচের দিকে বেঁকে যেতে থাকে। বহু লক্ষ বছর গেল পেরিয়ে। নতুন শক্তির খেলা শুরু হল এবারে। এই শক্তির ঠেলায় জিওসিন্‌ক্লাইনের সমগ্র এলাকাটি উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। কোন্ ঘটনা যে এর মূলে ছিল, ভূবিদরা এখনো তার কোন সঠিক কিনারা করে উঠতে পারেন নি। প্রথম দফায় কাজটা ছিল



'ভঙ্গিল পর্বত'। ভূপৃষ্ঠের নিচে দু-পাশের শিলার উপর চাপ সৃষ্টি করে ভঙ্গিল পর্বত ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচে গর্তটার একফালি চাঁদের মত বাঁকা জায়গাটা শিলা দিয়ে ভরে ফেলা। তার পরের কাজটা হল শিলাদেহটা নিয়ে আস্তে আস্তে সমুদ্রপৃষ্ঠের তল পর্যন্ত পৌঁছনো। সর্বশেষের কাজটা ছিল শিলাদেহটার আবার উপরের দিকে উঁচু হয়ে বাঁকতে শুরু করা। এতগুলো কঠিন কাজ করবার মত শক্তি পাললিক শিলাকে জোগালো কে, সে প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়।

পর্বতের ভাঁজ

শিলারূপী কুঁজটাকে উঁচুতে ঠেলে তুলতে হলে জিওসিন্‌ক্লাইনের দু-পাশের সীমানা ছাড়িয়ে দেহটাকে ছড়িয়ে দিতে হয়।

কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কারণ দু-পাশে যে-সব শিলা ছিল তাদের ঘনত্বের মাপ এবং গায়ের জোরটা পাললিক শিলার চেয়ে ছিল অনেক বেশি। এ যেন শিলার বন্দী জীবন যাপন। জায়গা কম, অথচ অনেক বেশি পরিমাণ শিলার থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সমস্যার সমাধানের উপায়? আমাদের স্নায়ুকেন্দ্রটির গঠনের মধ্যে সে উপায়ের একটি ছোটখাট নমুনার সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানেও অল্প জায়গার (প্রায় ১৬০০ ঘন-সেন্টিমিটার) মধ্যে প্রায় দু-হাজার কোটি স্নায়ুকোষ দলবদ্ধ হয়ে একটির উপর আর একটি, এভাবে বহু ভাঁজ তৈরি করে কোনরকম-ভাবে নিজেদের থাকবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। অত অজস্র ভাঁজের জন্যেই মানব-মস্তিষ্কের এত জটিলতা।

পাললিক শিলাও উঁচু হয়ে ওঠবার জন্যে ভাঁজের আকারে একে অপরের উপর ছড়িয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করে নিল। কম পরিমাণ জায়গায় থাকার জন্যে এছাড়া আর কীই বা তারা করতে পারত! একটা টেবিল-ঢাকনিকে যদি দু-পাশ থেকে ঠেলতে থাক, তাহলে তার মধ্যেও কি একই ধরনের ভাঁজ বা কুঞ্চনের সৃষ্টি হয় না? সেখানেও কারণটা একই; ঢাকনির থাকবার জায়গাটা ক্রমেই ছোট করে দেওয়া হচ্ছে। হিমালয় বা আল্পস-জাতীয় ভঙ্গিল পর্বতগুলোয় কেন ভাঁজ দেখা যায়, আশা করি তার কারণটা তোমরা এবারে বুঝতে পেরেছ।

পর্বতের ভাঁজ তৈরি হওয়া সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্তও অনেকে একটি ভুল ধারণা পোষণ করতেন। পৃথিবীর ভিতরটা ক্রমাগত ঠাণ্ডা হবার ফলে ভূপৃষ্ঠ নাকি কুঁচকে যাচ্ছে। সঙ্কুচিত ভূগর্ভের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর জন্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগও ক্রমাগত কুঞ্চিত ও ভঙ্গিল হয়ে উঠছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার হবার পর পৃথিবীর ঠাণ্ডা হবার তত্ত্ব আর মানা চলছে না। বরং ভূগর্ভ তেজস্ক্রিয় বস্তুদের দেহজাত তাপে ক্রমে তপ্ত হয়ে উঠছে,

এই ধারণার পেছনেই যুক্তি অনেক বেশি। এই তাপের খুব সামান্য অংশই যে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছচ্ছে, সে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

জিওসিন্‌ক্লাইনের মধ্যে পাললিক শিলা একটির উপর আর একটি ভাঁজ তৈরি করে বেশ পুরু হয়ে উঠছিল। দু-পাশের সীমানার শিলার তুলনায় তারা ছিল হালকা। কাজেই দুই প্রান্তে চাপ দিয়ে উঁচু হয়ে উঠতে তাদের কোন অসুবিধে হয় নি। এ যেন অনেকটা প্যারালাল বারের হাতলদুটোয় চাপ দিয়ে শরীরটাকে ঠেলে উপরে তোলবার মত একটা ব্যাপার।

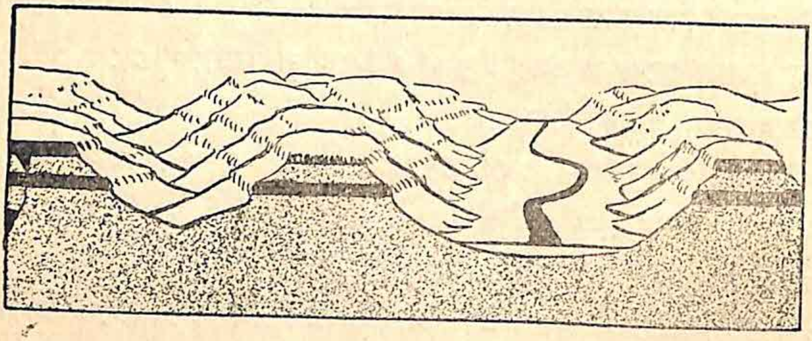
পাললিক শিলার ঠেলে উপরে ওঠা এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-রূপী নিচু টান, এই দুটির মধ্যে এবারে শুরু হয়ে গেল এক টানাটানির লড়াই। এই লড়াইতে উপরের দৌড়টারই জিত হল। পর্বতের শিলাদেহ এবারে ভাঁজ বা বলিরূপী অলঙ্কারে ভরে উঠতে থাকল। অগভীর সমুদ্রগুলোর জল কিছুটা উপছে বেরিয়ে এল। বাকিটা বাষ্প হয়ে উড়ে পালালো। যে-সব শিলা একদিন ছিল সমুদ্রগর্ভে, আজ তারাই পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় নিজেদের বিরাট দেহকে মেলে ধরল। মাটির তলায় শিলাদেহের খানিকটা অংশ রইল শেকড়ের আকারে।

এবার ক্ষয়ের পালা

পর্বতগুলোকে নিয়ে এবার শুরু হল আর এক নতুন খেলা। এ খেলার নায়ক হল জল আর বাতাস। সমুদ্রের উপর মাথা তোলবার পরমুহূর্ত থেকেই পর্বতের শিলাদেহের উপর এদের ক্ষয়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। শিলার উপাদান নদীর জলে মিশে সাগরের দিকে পাড়ি জমায়। পর্বতের শিলাদেহ যত ক্ষয় পেতে থাকে, তত সে যেন হালকা হয়ে উপরের দিকে ঠেলে ওঠে। নদীগুলোর ঢাল আরো বৃদ্ধি পায়। তাদের গতিবেগ বেড়ে ওঠে এবং

শিলাস্তরের মধ্যে গভীর উপত্যকা কাটার কাজ তাদের আরো এগিয়ে চলে।

গঙ্গার একটি শাখানদী হল অরুণ। সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকে ২২,০০০ফুট উঁচু পার্বত্য ভূমিতে এর প্রবাহের সৃষ্টি। নদীটির প্রবাহ এক জায়গায় একটি বিরাট গিরিখাতের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে নিয়েছে। সেই গিরিখাতের একদিকে এভারেস্ট (২৯,০০০ ফুট উঁচু), আর



দুপাশে পর্বত, মাঝখানে নদী গিরিখাত কেটে চলেছে।

একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮, ১১০ ফুট উঁচু)। সুদূর অতীতে এই দুটি পর্বত যে একটানা লম্বা একটি পর্বতশ্রেণীর অংশ ছিল, তার ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব নেই। অতএব, ঐ গিরিখাতটি অরুণ নদীর কীর্তি। কিন্তু পর্বতদুটি যদি বরাবর তাদের বর্তমান উচ্চতাতেই থাকত, তাহলে নদীর আর গিরিখাত কাটা সম্ভব হয়ে উঠত না। গোড়ার দিকে ওরা নিশ্চয়ই আরো অনেক নিচুতে ছিল। শিলাদেহ ক্ষয় করে নদী তার খাত যত গভীর করে চলছিল, দু-পাশে পর্বতের দেহ যেন তত হালকা হয়ে ধীরে ধীরে উপরের দিকে ঠেলে উঠছিল।

পর্বত প্রতিমুহূর্তেই ক্ষয় পাচ্ছে, কিন্তু তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। উঁচু হয়ে ঠেলে ওঠার কাজটা পর্বতের ক্ষয়টাকে পূরণ করে চলে। ফলে পর্বত যেমন উঁচু ছিল, তেমনিই থেকে যায়। কিন্তু পর্বতের জীবনে এই উঁচু হয়ে ঠেলে ওঠার শক্তি একদিন স্তিমিত হয়ে আসে। পৃথিবীর কিছু খুব প্রাচীন পর্বত, যেমন—ক্যানাডার

লরেন্সিয়ান হাইল্যাণ্ডস্ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপালাসিয়ানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, তাদের উপরে ঠেলে উঠবার জোর আজ সব ফুরিয়ে এসেছে। এর পর থেকে জল এবং বাতাসের সজ্ঘাতে দ্রুতগতিতে তারা ক্ষয় পেয়ে চলবে। তারপর এমন দিন আসবে, যেদিন তাদের সর্বাঙ্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

আমাদের ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত বয়সে কিন্তু খুবই নবীন। এর বেশির ভাগ বৃদ্ধিটাই ঘটেছে গত দশ লক্ষ বছরে। উপরে ঠেলে ওঠার ব্যাপারটা এর এখনও চলেছে। পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন পর্বতগুলোর বয়স হবে একশো থেকে দেড়শো কোটি বছর। হিমালয়ের শিলাদেহ খুব বেশি ভাঁজের দ্বারা রেখাঙ্কিত নয়। ভেঙে-যাওয়া শিলাস্তর প্রায়ই প্রতিবেশী স্তরগুলোর উপর ছড়িয়ে গিয়ে ফাটলগুলো বুজিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এইজন্যেই ম্যাগ্‌মা বা গ্যাসযুক্ত লাভা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছবার পথ বিশেষ কোথাও খুঁজে পায় নি। তাই হিমালয় পর্বতে আগ্নেয়গিরি গড়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু শিলাস্তরে ফল্ট বা ভাঙনের পরিমাণ এখানে খুবই বেশি, তাই সময়ে সময়ে ছোট বড় বহু ভূমিকম্প ঘটতে দেখা গেছে এখানে।

জিওসিন্‌ক্লাইনের জন্মকথা

পর্বতের শিলা তৈরির উপাদান পলি নদীর জলে বয়ে এসে জমা পড়ছিল যে বিরাট পাত্রটিতে, সেই জিওসিন্‌ক্লাইন-রূপী কারখানাটি কে তৈরি করল, এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু এখনো খোঁজা হয়নি। ভূপদার্থবিদরা বলেন, ভূগর্ভের শিলাস্তর যেহেতু নমনীয় এবং যেহেতু তার বিভিন্ন জায়গায় তাপের তারতম্যও হয়ে থাকে, তাই তার মধ্যে খুব মন্দগতি বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এক বছরে ঐ বিদ্যুৎস্রোত হয়ত মাত্র এক ইঞ্চি পথ পাড়ি জমাবে। সাধারণ যে বিদ্যুৎপ্রবাহ আমরা ব্যবহার করি, তার গতিবেগ অবশ্য এর তুলনায় বহুগুণ বেশি। এই মন্দগতি বিদ্যুৎ-

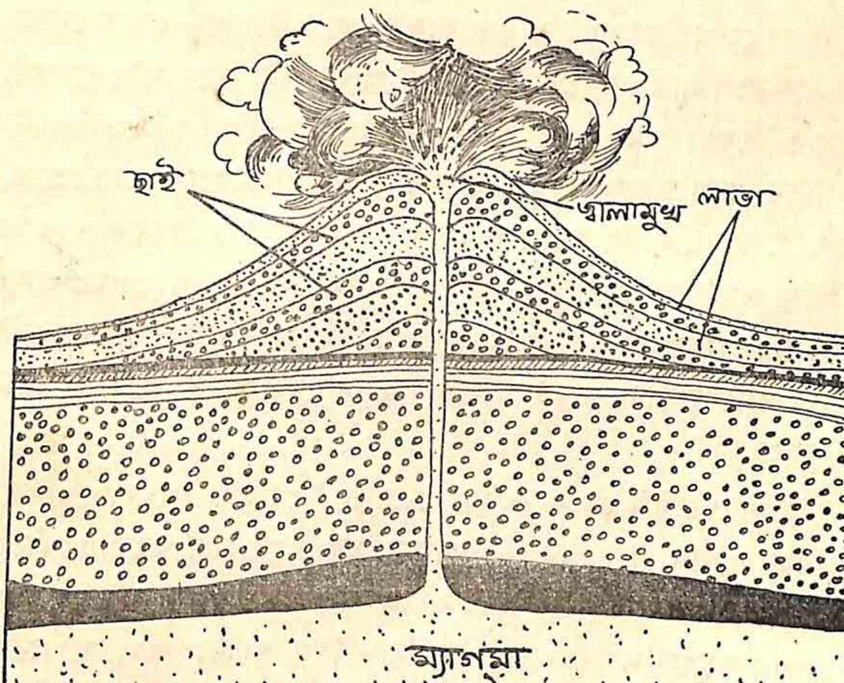
প্রবাহ ভূপৃষ্ঠকে নিচের দিকে টানতে থাকবে, যার ফলে ভূত্বক ধনুকের ছিলার মত বেঁকে নিচের দিকে বসে পড়বে ও সৃষ্টি করবে একটি জিওসিন্‌ক্লাইনের।

পৃথিবীর গভীরে তাপীয় অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সরাসরি কোন ধারণা নেই। তবে আভ্যন্তরীণ কোন শক্তির দ্বারাই যে জিওসিন্‌ক্লাইনের সৃষ্টি হচ্ছে, এটা ভালভাবেই আন্দাজ করা যায়। এর একটি চমৎকার নজিরও সম্প্রতিকালে পাওয়া গেছে। জাভার দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে একটি লম্বা, সরু এবং গভীর গর্ত বহুদিন ধরে তৈরি হয়ে আছে। একজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন, ঐ গর্তের মধ্যে অভিকর্ষের (গ্র্যাভিটি) মাপ পাওয়া যাচ্ছে কম। অথচ তার চারপাশের এলাকায় অভিকর্ষের মাপটা অনেক বেশি। এ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ঐ গর্তটি গড়ে উঠেছে কম ঘনত্বের শিলা নিয়ে। আর তার প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর গঠনে বেশি ঘনত্বের শিলা অংশগ্রহণ করেছে। একটা রহস্যের সমাধান কিন্তু হল না। গর্তটার বস্তু হালকা হয়েও তুলনায় ভারি বস্তুর মধ্যে বসে গিয়ে নিচের দিকের গভীরতা আরো বাড়িয়ে তুলছে কেন? ওদের তো উপরের দিকে উঠে আসাই উচিত ছিল। ব্যাপারটা যখন সেরকম ঘটছে না তখন ধরে নিতে হবে, নিশ্চয়ই কোন আভ্যন্তরীণ শক্তি ওদের নিচের দিকে টানছে।

জাভার কাছে সাগরগর্ভের এই গর্তটিকে আমরা স্বচ্ছন্দে একটি জিওসিন্‌ক্লাইন নাম দিতে পারি। ভূগর্ভের বিরাট বিপুল শক্তির খেলা চলেছে ঐখানে। হয়ত আজ থেকে পাঁচ কি ছ-কোটি বছর পরে ঐ গর্তটির জায়গায় সাগরগর্ভে এক বিরাট পর্বতশ্রেণী গড়ে উঠবে। পৃথিবীর বিরাট মহাসাগরগুলোর গর্ভে আরো কত জায়গায় এ-জাতীয় পর্বত তৈরির কারখানা চালু রয়েছে, কে তার হিসেব রাখে!

৭
আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি গর্জায় কেন? মানুষ বিভিন্ন যুগে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে। তোমরা সবাই জান, ১৮৭৯ সালে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ইটালির দুটি শহর হারকিউ-লেনিয়াম ও পম্পিয়াই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের পৃথিবীতে গত চারশো বছরে প্রায় পাঁচশো আগ্নেয়গিরির



আগ্নেয়গিরি

অগ্ন্যুৎদ্গার ঘটেছে। এর ফলে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় লাখ-দুই লোক। সবচেয়ে মারাত্মক অগ্ন্যুৎপাতটি ঘটেছিল ১৮১৫ সালে, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তাম্বরো আগ্নেয়গিরিতে। ঐ একটি ঘটনায় ৫৬,০০০ লোক মারা পড়ে। আগ্নেয়গিরি মানুষের মনে

কেন যে আতঙ্কের ভাব জাগিয়ে তোলে, তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ।

ভূমিকম্পের মতই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভের অস্থির, অশান্ত রূপটিই প্রকাশ পাচ্ছে। আগ্নেয়গিরি বলতে আসলে কী বোঝায় এবং তারা কিভাবে তৈরি হল, এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক। পর্বত সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা জেনেছিলাম, আগ্নেয়গিরি হল এক জাতের পর্বত। কিন্তু অন্য পর্বতের সঙ্গে তাদের চেহারার বিচারে মস্ত একটি তফাত রয়ে গেছে। এদের বেশির ভাগেরই মাথার কাছটা মস্ত একটা থালার মত গোল। একে বলে জ্বালামুখ (ক্রেটার)। এই জ্বালামুখটা থেকে লম্বা সুড়ঙ্গের মত একটা পথ নেমে গেছে পাতালপুরীর দিকে। সেই পথটা দিয়ে বড়জাতের অগ্ন্যুৎপাতের সময় উঠে আসে জ্বলন্ত লাভার স্রোত, ছাই, কাদা, গ্যাস, পাথরের টুকরো। কাছাকাছি জনপদ থাকলে তার আর রক্ষে নেই। জ্বলন্ত লাভার তলায় চাপা পড়বে ঘর বাড়ি মানুষ জন সবকিছু। লাভার তলায় চাপা পড়বার আগে ছাই ও গ্যাসের দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বহু মানুষই হয়ত প্রাণ হারিয়ে বসবে।

আগ্নেয়গিরি থেকে ধোঁয়া বেরোলেই যে তার বিস্ফোরণ ঘটবে, এমন কোন কথা নেই। বছরের পর বছর হয়ত অল্প-সল্প ধোঁয়া ছড়ালো, খানিকটা লাভা বের করার কাজ চলতে থাকল। আবার কোন আগ্নেয়গিরি এভাবে কিছুদিন জীবন্ত থাকার পর বহুদিনের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল। একদিন আবার সে ঘুম ভেঙে গর্জেও উঠতে পারে। কিংবা তার সে ঘুম আর কোনদিন নাও ভাঙতে পারে।

পৃথিবীর গর্ভটিকে যদি একটা বিরাট কারখানা ধরি, তাহলে আগ্নেয়গিরি হল যেন তার চিমনির মত। কোন্ চিমনিটা কবে নিভে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসবে, তা আগে থেকে হিসেব করে বলা মুস্কিল।

আগ্নেয়গিরির আস্তানা

পৃথিবীর বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরি কতকগুলো লম্বা বলয়ের আকারে যেন নিজেদের সাজিয়ে নিয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে এরকম একটা বিরাট বলয়ের সন্ধান আমরা পাচ্ছি। অ্যাণ্ডিজ, ক্যাসকেডস, অ্যালিউসিয়ান্‌স্‌, জাপান এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (ঈস্ট ইণ্ডিজ) আগ্নেয়গিরি এ দলের সদস্য।

জীবন্ত আগ্নেয়গিরির আস্তানাগুলোর খুব কাছাকাছি খুঁজে পাই আবার পৃথিবীর প্রধান ভূমিকম্পের বলয়গুলোকে। পৃথিবীর যে-সব জায়গায় ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৬০ মাইল নিচে জন্ম নেয়, বিশেষ করে সেই এলাকাগুলোয় দল বেঁধে জাঁকিয়ে বসবার একটা প্রবণতা আগ্নেয়গিরিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভূগর্ভের ঐ অঞ্চলের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে আগ্নেয়গিরির একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

পৃথিবীর যে সব জায়গায় নতুন নতুন পর্বত রয়েছে, তাদের বলয়ের কাছাকাছি আবার পৃথিবীর বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরিদের দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য সব নবীন পর্বতের মধ্যে আগ্নেয়গিরি থাকবে এমন কোন কথা নেই। আল্‌প্‌স্‌ এবং আমাদের হিমালয় নবীন পর্বত হলেও কোন আগ্নেয়গিরির জন্ম ওদের মধ্যে হয় নি। এই ছুটি পর্বতের শিলাস্তর খুবই পুরু। তাই ভিতরের ম্যাগ্‌মা ঠেলে বেরোবার মত পথ কোথাও খুঁজে পায় নি। খুব বেশি ভঙ্গিল পর্বতশ্রেণীর শিলাস্তর পাতলা হয় বলে ম্যাগ্‌মাও সহজে বেরিয়ে আসতে পারে। আগ্নেয়গিরিও তাই ঐ সব পর্বতের মধ্যেই বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

মহাদেশের তুলনায় সাগরগর্ভে পর্বতশ্রেণীদের মধ্যে আগ্নেয়গিরি সংখ্যায় নিশ্চয়ই অনেক বেশি রয়েছে। কিন্তু তাদের অগ্ন্যুৎপাত কখন কোথায় ঘটল, তা সহজে জানার কোন উপায় এখনো তৈরি হয় নি। তবে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা যাচ্ছে, সাগরগর্ভে

নাকি মাঝে-মাঝে বিপুল পরিমাণে লাভা নিক্রান্ত হয়ে থাকে। আগ্নেয়গিরি ছাড়া এরা আর কোথা থেকে জন্মাবে? আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ সাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী রয়েছে। এইসব পর্বতের সমগ্র দেহটাই নাকি লাভা দিয়ে তৈরি। চেহারার মাপে এরা আমাদের হিমালয়কেও অনেক সময় লজ্জা দিতে পারে।

সাম্প্রতিক কালেও আগ্নেয় প্রক্রিয়া থেকে জন্ম নিচ্ছে বিরাট আকারের সব পর্বত। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়জনক সৃষ্টিটি হল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনা লোয়া। এই আগ্নেয়গিরিটির ভিত রয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৬,০০০ ফুট নিচে। এর জ্বালামুখটি আবার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪,০০০ ফুট উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মোট উচ্চতা তাহলে দাঁড়াল ৩০,০০০ ফুট—আমাদের এভারেস্টকেও হার মানায়।

ম্যাগ্‌মা

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে যে জ্বলন্ত লাভাস্রোত বেরিয়ে আসে, তারা হল শিলার তরল গলিত রূপ। এই লাভার তাপ যন্ত্রের সাহায্যে মেপে দেখা যাচ্ছে প্রায় ২২০০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কাছাকাছি।

ভূগর্ভে নিচের দিকে নামার সঙ্গে সঙ্গে তাপ যে বেড়ে ওঠে, তা আমরা জানি। মাত্র ৩০ মাইল নিচেই এই তাপের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ২৭০০ ডিগ্রি ফারেনহিটে। এত প্রচণ্ড তাপেও শিলা গলে যায় না। তার কারণ সেখানে প্রতি বর্গ-ইঞ্চি শিলাদেহের উপর চারপাশ থেকে সমান মাপের এক বিপুল পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় এই, শিলা তরলই বা হচ্ছে কিভাবে, আবার লাভারূপে ভূপৃষ্ঠে পাড়িই বা জমাচ্ছে কোন্ উপায়ে?

চারপাশের চাপ যতক্ষণ সমান থাকবে, ততক্ষণ শিলার নড়াচড়ার কোন উপায় নেই। নড়াচড়া করার সব পথ বন্ধ বলেই প্রচণ্ড তাপেও শিলা কঠিন রূপটা ছেড়ে তরল হতে পারছে না। মনে করা যাক, ভূত্বকের শিলাদেহ ভূপৃষ্ঠের নিচে কোথাও দুমড়ে বা বেঁকে গেল। নতুন পর্বত গড়ে উঠছে যে সব জায়গায়, সাধারণত সেখানেই এ-জাতীয় একটি ঘটনা ঘটতে পারে।

দুমড়ে বা বেঁকে গেলে শিলাদেহের গঠন দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন নিচের দিকে শিলার চাপটাও খানিকটা কমে আসে। একই সঙ্গে উপরের দিকের চাপটা খানিকটা বেড়ে ওঠে। সেই বাড়তি চাপের দৌলতে তপ্ত শিলার দল আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাত্রা ঘটায়। ঘাড়ের উপর চাপটা যেই আর-একটু কম হয়ে দাঁড়ায়, অমনি শিলাদেহের প্রসারণ ঘটে। গা হাত পা ছড়াবার মত খানিকটা জায়গা পেয়ে তপ্ত শিলা অবশেষে তরল রূপ নেবার সুযোগ পায়।

ভূপৃষ্ঠের নিচে শিলার এই তরল মূর্তির নাম হল ম্যাগ্‌মা। ম্যাগ্‌মা ও লাভার মধ্যে একটি তফাত রয়েছে। ম্যাগ্‌মা রূপে তরল শিলা ভূপৃষ্ঠের নিচে চাপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে থাকে। তাই তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস দিব্যি জায়গা করে নেয়। ম্যাগ্‌মা হল গ্যাসযুক্ত তরল শিলা। এই ম্যাগ্‌মা যখন ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়, চাপমুক্ত হয়ে তার গ্যাসগুলো সব উড়ে পালায়। এই গ্যাসবিহীন তরল শিলাই হল লাভা।

নিচে থেকে চাপের ঠেলায় ম্যাগ্‌মা যখন ভূপৃষ্ঠের দিকে উঠে আসতে থাকে, তার প্রচণ্ড তাপে আশেপাশের যত শিলা আর খনিজ, সবাই গলে গিয়ে তার কলেবর বৃদ্ধি করে চলে। পথিমধ্যে কোন জলের সঞ্চয়ের সঙ্গে দেখা হলে ম্যাগ্‌মা তাকে বাষ্পে রূপ দিয়ে সঙ্গী করে নিতে ভোলে না। এভাবে পথ চলার মধ্য দিয়ে ম্যাগ্‌মা এক সময়ে ভূপৃষ্ঠের কয়েক মাইল নিচে এসে

জমা হতে শুরু করল। ম্যাগ্‌মার এই যে বিরাট বিরাট চৌবাচ্চা তৈরি হল, এরাই আগ্নেয়গিরির খোরাক জুগিয়ে থাকে।

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে যে বিরাট সুড়ঙ্গটা পাতালপুরীর দিকে নেমে গেছে, ম্যাগ্‌মা সব সময়ে সে পথ ধরে বেরিয়ে আসতে থাকবে, এমন কোন কথা নেই। সঙ্গী গ্যাসের চাপই হল ম্যাগ্‌মার চালক শক্তি। তার অভাবে ম্যাগ্‌মার নিজে থেকে নড়ে-চড়ে বেড়াবার কোন ক্ষমতাই থাকে না।

গ্যাসের চাপে ফুঁসতে থাকা ম্যাগ্‌মা যত উপরের দিকে ঠেলে উঠতে শুরু করে, তার প্রচণ্ড তাপটা একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ফলে ম্যাগ্‌মার তরল চেহারাটা খানিকটা জমাট বাঁধে, একই সঙ্গে তার দৌড়টাও যায় কমে। এদিকে বাধা পেয়ে নলচেটার নিচের দিকে গ্যাসের চাপ জমতে শুরু করেছে। সেই চাপটা যখন প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করে, তখন তার ধাক্কায় বিরাট একটা বিস্ফোরণের মত সমস্ত আগ্নেয়গিরিটা গর্জে ওঠে। একেই আমরা বলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

লাভা

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জ্বালামুখ থেকে অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসে জ্বলন্ত লাভা। লাভা সাধারণত দু-জাতের হতে দেখা যায়। ব্যাসল্ট শিলা থেকে যে লাভার জন্ম, তা খুবই তরল হয়। ফলে জ্বালামুখ থেকে মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুতবেগে এই লাভার প্রবাহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর গতিবেগ ঘণ্টায় ২০ থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। অনেক সময় এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে এই-জাতীয় লাভার প্রবাহকে ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করতে হয়। এক সর্বনাশা পরিণতির হাত থেকে কিছু জনপদ এভাবে রক্ষাও পেয়ে যায়।

আগ্নেয়গিরিজাত ব্যাসল্ট শিলার লাভাস্রোতে কোন এক

সময়ে ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চল প্লাবিত হবার কথা আগেই বলেছি।

গ্রানাইট-জাতীয় শিলা থেকে যে লাভার জন্ম, তারা খানিকটা গাঢ় হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভিস্‌কসিটি বা গাঢ়তা ব্যাসল্ট শিলাজাত লাভার তুলনায় অনেক বেশি হয়। এদের গতিবেগও হয় প্রায় শম্বুকের মত, ঘণ্টায় বড়জোর এক মাইল। এই জাতীয় লাভা বেশি দূরে যেতে পারে না এবং তারা জ্বালামুখের কাছটাতেই জমা হতে থাকে। এর ফলে কালক্রমে একটি আগ্নেয়গিরির চেহারাও কোন্ না শঙ্কুর মত হয়ে দাঁড়ায়। দু-পাশের দেয়ালগুলোও হয় একেবারে খাড়া। এ-জাতীয় একটি চমৎকার নমুনা হল ইটালির মাউণ্ট ভিসুভিয়াস।

লাভা যত জমাট বাঁধতে থাকে, তত তার মধ্যকার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ একঠাঁই হয়ে নানা জাতের খনিজ গড়ে তোলে। প্রত্যেকটি খনিজই আবার তার নিজস্ব ক্রিস্ট্যাল বা কেলাসরূপে সংগঠিত হতে থাকে।

আগ্নেয় গ্যাস

অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির মাথার উপরে এক বিরাট গ্যাসীয় মেঘ জমতে থাকে। সেই মেঘের বেশির ভাগটাই হল জমাট-বাঁধা জলীয় বাষ্প। এ-ছাড়া ওই মেঘের উপাদানের মধ্যে থাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস এবং হাইড্রোফ্লোরিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড।

এইসব গ্যাসের গুরুত্ব আমাদের জীবনে কিছুমাত্র কম নয়। অতীত কালে যদি পৃথিবীতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত না হত, তাহলে বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসটিকে আর আমরা পেতাম না। ঐ গ্যাসটির অভাবে উদ্ভিদ-জগতের

সৃষ্টিই হত না। উদ্ভিদ ছাড়া বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন তৈরি করত কে? কাজেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীকুলও এই পৃথিবীতে কোন-দিনই জন্মাতে পারত না। তাহলে স্রেফ আগ্নেয়গিরির দৌলতেই এই মনুষ্য-জন্মটা সম্ভব হয়েছে, কী বল?

আগ্নেয়গিরি থেকে একই সঙ্গে আর যাদের উৎপত্তি হয়, তারা হল আগ্নেয় ছাই আর ধুলো, পিউমিস্ বা ঝামাজাতীয় বস্তু এবং খুব সূক্ষ্ম চেহারা থেকে শুরু করে কয়েকশো টন পর্যন্ত ওজনের বিরাট আকারের সব শিলা।

ক্র্যাকাটোয়া

ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ হল ক্র্যাকাটোয়া। ১৮৮৩ সালে সেই দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটি পৃথিবীর বৃহত্তম অগ্ন্যুৎপাতের নায়ক হয়ে দাঁড়ায়। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় গ্যাস, পিউমিস ও ছাই ২০ থেকে ৩০ মাইল উর্ধ্বে এসে হাজির হয়েছিল। সমস্ত দ্বীপটির এক বিরাট অংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে যে ভূমিকম্প ঘটল, তা জন্ম দিয়ে বসল একটি ৎসুনামির। সমুদ্রের পর্বতপ্রমাণ ঢেউতে জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের ৩০,০০০ লোক ডুবে মারা পড়ল। আগ্নেয়গিরি থেকে এক বিপুল পরিমাণ ধুলো বায়ুমণ্ডলে এসে জমা হল। বায়ুস্রোতে ঐ ধুলো পৃথিবীর চারদিকে গেল ছড়িয়ে। তার ফলে বহুদিন ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙ অস্বাভাবিক রকমের লাল দেখিয়েছিল।

পারিকুতিন

দৈত্যের মত চেহারার এক একটি আগ্নেয়গিরি গড়ে উঠতে দশ লক্ষ বছর কি তারও বেশি সময় নিয়ে বসতে পারে। পৃথিবীর নবতম আগ্নেয়গিরি পারিকুতিনের জন্ম সেদিক থেকে খুবই বিস্ময়জনক একটি ব্যাপার।

মেক্সিকো শহর থেকে ছুশো মাইল দূরে একটি পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে ১৯৪৩ সালে পারিকুতিনের জন্ম। ঐ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ওই অঞ্চলে অনেকগুলো ভূমিকম্প ঘটতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারি দিনের বেলা এক কৃষক দেখতে পেল, তার চাষের জমির এক জায়গা থেকে ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। ঘটনাটা দেখে গ্রামবাসীরা সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা ক্রমেই বড় হতে থাকে। পরের দিন দেখা গেল, ঐ কুণ্ডলী মস্ত বড় একটা মেঘে পরিণত হয়েছে। আর সবচেয়ে যে আশ্চর্য ব্যাপারটি সকলের চোখে পড়ল তা হল এই যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ফাঁকা মাঠটার মধ্যে প্রায় ১২০ ফুট উঁচু কোণের মত চেহারার একটি আধপোড়া শিলাস্তূপ ঠেলে উঠেছে। গ্যাসের মেঘটা ঐ স্তূপটার মাথার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে। ঐ মাথাটাই আবার মাঝে মাঝে ঝাঁকে-ঝাঁকে শিলা আর ধুলো ছুঁড়ে মারছে। ছোটখাট একটা আগ্নেয়গিরি এভাবে জন্ম নিয়ে বসল।

পৃথিবীর জঠর থেকে একটা আগ্নেয়গিরি ভূমিষ্ঠ হবার মত আশ্চর্য ঘটনাকে কখনো প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হাতে পেয়ে যাবেন, বিজ্ঞানীরা এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তাঁরা দলে-দলে ক্যামেরা, সিস্‌মোগ্রাফ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁদের চোখের সামনে আগ্নেয়গিরির কোন্‌টার চারপাশের জমিটা একসময় ফেটে গেল এবং সেইসব ফাটল দিয়ে লাভাস্রোত বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

ছু-সপ্তাহের মধ্যেই আগ্নেয়গিরির কোন্‌টা ৫০০ ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়ায়। এক বছরে সেই উচ্চতা পৌঁছয় ১৪০০ ফুটে। ১৯৪৫ সালের একটি দিনে আগ্নেয়গিরিটা থেকে প্রায় ১৬,০০০ টন বাষ্প এবং এক লক্ষ টন লাভা বেরিয়ে আসে।

পারিকুতিনের চারপাশে যত মাঠ আর বন ছিল, জ্বলন্ত

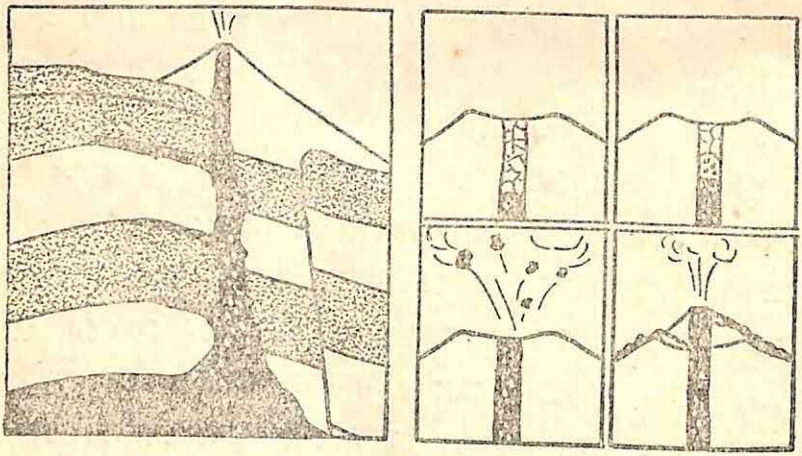
লাভাস্রোতে সব ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েকটা গ্রাম এবং পারিকুতিন শহরটা লাভার তলায় সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে। ঐ-সব অঞ্চলের অধিবাসীরা অবশ্য বিপদ বুঝতে পেরে আগে থেকেই ঐ জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

ন-বছর জীবন্ত থাকার পর একদিন পারিকুতিন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বর্তমানে তার সুপ্ত অবস্থা।

সুপ্ত দানব

আগ্নেয়গিরির কোন্‌টা যত লম্বাটে হতে শুরু করে, ম্যাগ্‌মাকেও নালি বেয়ে জ্বালামুখ পর্যন্ত পৌঁছতে তত বেশি পথ পাড়ি জমাতে হয়। পথটা যখন খুব বেশি দীর্ঘ হয়ে দাঁড়ায়, ম্যাগ্‌মা আর অতটা পথ ঠেলে উঠতে পারে না। আগ্নেয়গিরির নালিটার মধ্যে

১ ২ ৩



৪ ৫

(১) আগ্নেয়গিরির স্বাভাবিক, জীবন্ত চেহারা। (২) ও (৩) অগ্ন্যুৎদগারের পর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ভেঙে ভিতরে বসে গিয়ে নালীটা বন্ধ হয়ে বসে আছে। আগ্নেয়গিরির এখন সুপ্ত অবস্থা। (৪) ও (৫) সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আবার গর্জে উঠল।

ম্যাগ্‌মা জড়ো হতে থাকে এবং কালক্রমে জমে গিয়ে নালিটা এক-সময় ছিপি-আঁটা বোতলের মতই রুদ্ধ হয়ে আসে। সেই ছিপিটা

হঠাৎ একদিন বিস্ফোরণের ধাক্কায় টুকরো হয়ে গিয়ে সুপ্ত আগ্নেয়-গিরিটা আবার হয়ত গর্জে উঠল। এ যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের মত একটা ব্যাপার। ভিসুভিয়াসের ক্ষেত্রে এ-জাতীয় ঘটনা কয়েক-বারই ঘটেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একবার অগ্ন্যুৎপাতের পর আগ্নেয়গিরির যে ঘুম শুরু হয়, তা আর ভাঙে না। পৃথিবীর বহু আগ্নেয়গিরি আজ তাদের অতীতের ভয়াবহ ইতিহাসের শুধু নিশ্চল সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাল্‌ডেরা

অনেক সময় দেখা যায় অগ্ন্যুৎপাতের পর একটা আগ্নেয়গিরির ছুঁচোলো মাথাটা ভেঙে গিয়ে নিজের নালিটার মধ্যেই ঢুকে বসে আছে। মাথায় বেঁটে হয়ে গিয়ে জ্বালামুখের ব্যাসটাও বড় হয়ে ওঠে। এই জাতীয় একটি গঠনকে বলে ক্যাল্‌ডেরা। এই ক্যাল্‌ডেরার মধ্যে জল জমে গিয়ে একটা বিরাট হ্রদও তৈরি হয়ে বসতে পারে। আমেরিকার মাজামা পর্বতের জ্বালামুখটা প্রায় বারো হাজার বছর আগে ভেঙে গিয়ে একটা ক্যাল্‌ডেরার জন্ম দিয়েছিল। ঐ ক্যাল্‌ডেরার মধ্যে দু-হাজার ফুট গভীর একটি হ্রদ দিব্যি তৈরি হয়ে বসে আছে। পেটের জ্বলন্ত কারখানাটার খোরাক জোগাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরিকে নিজের মাথাটাই খোয়াতে হয়। এ যেন আগ্নেয়গিরির আত্মহত্যা আর-কি!

উষ্ণ প্রস্রবণ

ভূত্বকে ফাটলের মধ্য-দিয়ে অনেক সময় বৃষ্টি ও নদী-নালার জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে। সেখানে কোন তপ্ত শিলাস্তরের উপরে এসে হাজির হলেই ঐ জল তাপ সঞ্চয় করতে থাকে। জলের তাপে বহু খনিজ গলে গিয়ে জলের প্রবাহের সঙ্গে মিশে যায়। ঐ প্রবাহ কোথাও বেরিয়ে আসার পথ পেলেই উষ্ণ প্রস্রবণের আকারে ভূপৃষ্ঠে

এসে হাজির হয়। নানা ধরনের খনিজ থাকার জন্যে উষ্ণ প্রস্রবণের জল কিছু-কিছু রোগে ওষুধের মত কাজ করে থাকে। পেটরোগা বাঙালী তাই অনেক সময়ে বিহারের রাজগীর, মধুপুর, দেওঘর, গিরিডির উষ্ণ কুণ্ডের জল খাবার জন্যে দৌড়ে থাকে।

ফিউম্যারোল

ভূপৃষ্ঠের যে-সব ফাটলের মধ্য দিয়ে তলা থেকে ম্যাগ্‌মার দেহজাত গ্যাস উঠে আসে, তাদের ফিউম্যারোল বলা হয়। জমির তলায় এইসব গ্যাসের তাপ এত বেশি থাকে যে তারা স্বচ্ছন্দে লোহা, তামা ও সীসের মত ধাতুকেও গলিয়ে বসে। ভূপৃষ্ঠের যেখানে ম্যাগ্‌মার গ্যাসেরা বেরিয়ে আসে, সেখানে বিভিন্ন খনিজকে পাতলা পাতের মত জমা পড়তে দেখা যায়। ফিউম্যারোল তাহলে মূল্যবান আকরিক ধাতু (মেটালিক ওর) সরবরাহের এক মস্ত এজেন্ট, কী বল!

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে একটি উপত্যকার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডেথ ভ্যালি'। ঐ উপত্যকা জুড়ে অনেক ফিউম্যারোল রয়েছে। তারা যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাইরে ছেড়ে দিচ্ছে, বাতাসের চেয়ে ভারি বলে ঐ গ্যাস জমির কাছাকাছি জমে থাকে। ঐ গ্যাসের কোন ঘাঁটির মধ্যে গিয়ে পড়লে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু অবধারিত। তাই ঐ মৃত্যু-উপত্যকার মধ্য দিয়ে সবাইকেই খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।

গাইসার

পৃথিবীর জমির উপরে যেন কতগুলো পিচকিরি বসানো রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে জল আর বাষ্প ফোয়ারার আকারে ঠেলে বেরোয়। এরাই হল গাইসার।

প্রত্যেকটি গাইসারের নিচে একটি লম্বা সুড়ঙ্গ রয়েছে। ঘুরে

ঘুরে সেই পথ নেমে গিয়ে হয়ত কোন তপ্ত শিলাস্তরের গায়ে গিয়ে ঠেকল। ভূগর্ভে কোন জলের ধারা এই সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকে পড়লেই শিলার তাপে তপ্ত হয়ে বাষ্পে রূপ নেবে। বাষ্প জমা হয়ে তলা থেকে উপরের জলের গায়ে ধাক্কা মারতে শুরু করে। সেই ধাক্কায় জল এবং বাষ্প তুইই ফোয়ারার আকারে উপরে উঠে আসতে থাকে। সুড়ঙ্গপথটা কিছু সময়ের জন্যে খালি হয়ে যায়। আবার সেটা জল ও বাষ্প দিয়ে ভর্তি হতে থাকে। ফোয়ারার খেলা আর-একবার নতুন করে শুরু হয়ে যায়।



আমেরিকার ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কে 'ওল্ড ফেইথফুল' নামে একটি গাইসার আছে। প্রতি ৬৫ মিনিট পরে-পরে ঐ গাইসারটি তার মুখ থেকে প্রায় ১৫,০০০ গ্যালন বাষ্প ও ফুটন্ত জল ১৫০ ফুট উপরে ছুঁড়ে মারে। বছরের পর বছর বিরামবিহীনভাবে ঘটনাটি ঘটে চলেছে। তাই হয়ত ওখানকার লোকেরা ঠাট্টা করে গাইসারটির নাম রেখেছে, 'বিশ্বস্ত বুড়ো'।

এ পর্যন্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে মহাদেশের গঠন-প্রকৃতির কিছুটা পরিচয় আমরা গ্রহণ করলাম। এবারে পৃথিবীর প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে যে বিরাট মহাসাগরের এলাকা, তাই নিয়ে আমাদের কথা শুরু হবে।

৭

মহাসাগর

মহাসাগরের বিরাট বিস্তৃতি এবং সৌন্দর্য আমাদের সবাইকেই মুগ্ধ করে। কী যেন এক রহস্য সাগরের বিপুল জলরাশির মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই রহস্যের বৈজ্ঞানিক ছবির কতটুকু অংশই বা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে মহাসাগরের এলাকা। বাকি শতকরা ২৯ ভাগ জায়গা হল তার স্থলভাগ। চাঁদের জমির যে পিঠটাকে আমরা দেখতে পাই, তার প্রায় সবটাই পৃথিবী থেকে জরিপ করা হয়েছে। কিন্তু মহাসাগরের তলদেশের শতকরা মাত্র দু-ভাগ জায়গা এ পর্যন্ত ভূবিদরা জরিপ করতে পেরেছেন। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশই এখনো আমাদের জানা হয় নি।

মহাসাগরের সঙ্গে মহাদেশের সংগ্রামের যেন শেষ নেই। এ সংগ্রামে কখনো মহাসাগর জয়ী হয়, কখনো মহাদেশের জয় ঘটে। কিছুদিন আগে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ধনুষ্কোটি নামে জায়গাটির অনেকখানি অংশ সাগর দখল করে নিয়েছিল, তোমরা সবাই সে খবরটা নিশ্চয়ই জান। অতবড় বিরাট সাম্রাজ্যটা হাতে পেয়েও মহাসাগরের জমির ক্ষুধাটা যেন আর মিটতে চায় না।

সাগরের অভিযান

পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে আমরা দেখতে পাব, মহাসমুদ্র বহুবার মহাদেশের জমির উপর অভিযান চালিয়েছে। ৪০ কোটি বছর আগে মেসোজোয়িক যুগের অর্ডোভিসিয়ান পর্বে আজকের আমেরিকা মহাদেশের অর্ধেকটাই ছিল মহাসমুদ্রের জলের তলায়। ২০ কোটি বছর আগে ক্রিটেসিয়াস পর্বে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মহাসাগরের এক বিপুল বন্যা দেখা দিয়েছিল। ফলে সমগ্র ইংল্যাণ্ড

ও উত্তর ইয়োরোপ, রাশিয়ার মধ্যভাগ থেকে এশিয়ার দক্ষিণভাগ এবং আমাদের ভারতবর্ষের বেশির ভাগ অঞ্চলটাই সাগরগর্ভে তলিয়ে যায়। সমগ্র জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং সাহারা মরুভূমি-সমেত আফ্রিকার অনেকখানি অংশের উপর তখন মহাসমুদ্রের রাজত্ব চলতে থাকে।

সাগরের জলে 'রেডিও কার্বন ডেটিং' বা তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী একটি আশ্চর্য তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। আজ থেকে ছ-হাজার বছর আগে সাগরের জল নাকি সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৫০ ফুট উঁচু হয়ে উঠেছিল। তার ফলে মানব সভ্যতার প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রই সাগরের বন্যায় ভেসে যায়। বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থে যে বিরাট বন্যার কথা লেখা হয়েছে সম্ভবত তা একই ঘটনাকে নির্দেশ করছে। হিমালয় পর্বতের ২০,০০০ ফুট উপরেও সামুদ্রিক ঝিনুকের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তার মানে অবশ্য এই দাঁড়ায় না যে হিমালয়ের ঐ উচ্চতায় একদিন সাগর-জলের খেলা চলেছিল। এর মানে, এক প্রাচীন সমুদ্রের তলার দেহ গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হবার পরেই হিমালয় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

প্লাইস্‌টোসিন যুগ থেকে সমুদ্রের আয়তন বেড়েই চলেছে। আজকের হাডসন উপসাগর, চীন সাগর, বাল্টিক সাগর, এরা বয়সের বিচারে সবাই নবীন। উত্তর সাগরের মাঝামাঝি জায়গার তলদেশ থেকে জীবজন্তুর হাড় ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া গেছে। এ থেকেও পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আজকের মাছ ধরার ঐ বড় জায়গাটিতে (যার নাম ডগার ব্যাঙ্ক) একদিন মানুষের পূর্ব-পুরুষদের বসতি ছিল।

পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই মহাদেশের উপর মহাসাগরের অভিযান এগিয়ে চলেছে। কোথাও মহাসাগরের মাত্রা বেড়ে উঠছে, কোথাও জমি নিচে বসে গিয়ে মহাসাগরের জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে।

তবে একটা সান্ত্বনা এই, যে জমি আজ মহাসাগরের গর্ভে গিয়ে হাজির হল তা চিরকালের জন্যে খোয়া যায় না। কোন একদিন হয়ত মহাসমুদ্র পেছিয়ে গিয়ে তাকে বন্দীদশা থেকে আবার মুক্তি দেবে। মহাসাগর আর মহাদেশের মধ্যে এই লুকোচুরির খেলা চিরকাল ধরেই চলছে এবং চলতে থাকবে।

মহাসাগরের আয়তন

পৃথিবীর মহাসাগরগুলো প্রায় ১৪৩ লক্ষ বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে। ওদের মোট জলের আয়তন ৩২৩,৭২২,১৫০ ঘন-মাইল। পৃথিবীর মোট আয়তনের এ হল $\frac{১}{৪৫০০}$ ভাগ। মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় ২$\frac{১}{২}$ মাইল বা ১৩,০০০ ফুট। মহাদেশের জমির গড় উচ্চতা হল প্রায় $\frac{১}{২}$ মাইল বা ২৫০০ ফুট। কাজেই মহাসাগরের গড় গভীরতার তুলনায় মহাদেশের জমির গড় উচ্চতা হল ৩ মাইল।

মহাদেশের সমগ্র জমিকে গুঁড়িয়ে ফেলে যদি সেই বস্তুকে সমানভাবে মহাসাগরের তলদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যেত, তাহলে পৃথিবীর সমগ্র জমির উপর জলের গভীরতা দাঁড়াত প্রায় ৯,০০০ ফুট।

পৃথিবীর মানচিত্রের মধ্যে আমরা পাঁচটি মহাসাগরের সন্ধান পেয়ে থাকি। সেগুলো হল—আটলান্টিক, প্রশান্ত, ভারত, আর্কটিক বা উত্তর ও অ্যান্টার্কটিক বা দক্ষিণ মহাসাগর। এক-একটি মহাসাগরের এলাকাকে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেও, এরা সবাই মিলে একটি বিরাট মহাসাগরেরই অংশ। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন এবং গভীরতা অন্য সকলের চেয়ে বেশি। এর গড় গভীরতা প্রায় ২$\frac{৩}{৪}$ মাইল।

পৃথিবীর মহাসাগরের কিছু-কিছু অংশ আবার অনেকটাই স্থল-বেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। এদের আমরা বলি সমুদ্র। (বাংলায়

আমরা মহাসাগর, সাগর বা সমুদ্র, এই কথাগুলোকে প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি)। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমুদ্রটি হল ভূমধ্যসাগর। ঈজিয়ান, অ্যাড্রিয়াটিক, টিরেনিয়ান ও কৃষ্ণসাগর—সবই ঐ ভূমধ্যসাগরেরই অংশবিশেষ।

পৃথিবীর মহাসাগরের আরো কিছু-কিছু অংশ আংশিকভাবে স্থলবেষ্টিত হয়ে উপসাগর রূপে তৈরি হয়েছে, যেমন পারস্য উপসাগর, কাম্বে উপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর প্রভৃতি।

মহাসাগরের সৃষ্টি হল

সারা পৃথিবী জুড়ে এই যে বিরাট মহাসাগর, তার সৃষ্টি কিভাবে হল, সে-কথা তোমাদের সকলেরই নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করে।

এ-বিষয়ে গোটাকয়েক মত চালু আছে। একটি মত হল এই। বিবর্তনের একটা অবস্থায় পৃথিবী যখন খুবই তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন সেই তাপে পৃথিবী থেকে বিপুল পরিমাণে বাষ্প উপরে উঠে গিয়ে এক বিরাট মেঘ তৈরি করে। সেই মেঘে সমগ্র পৃথিবীর আকাশ ঢাকা পড়ে যায়। সূর্যের আলোও আর পৌঁছত না পৃথিবীতে।

তারপর একদিন ভূপৃষ্ঠের ঠাণ্ডা হবার পালা শুরু হল। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ কিন্তু একসঙ্গে ঠাণ্ডা হয় নি। যে-সব জায়গা আগে ঠাণ্ডা হল সেসব উপরের বস্তুর চাপে নিচের দিকে বসে গেল। এরা ছিল ভারি শিলা দিয়ে তৈরি। পৃথিবীর ভাবী মহাসাগরের খাত হয়ে এরা জলের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগল। যাদের মাথা খানিকটা উপরে জেগে থাকল, তারা ছিল হালকা শিলা দিয়ে তৈরি। এরাই আবার হয়ে উঠল মহাদেশের ভূমি।

তপ্ত ভূপৃষ্ঠ যখন অনেকটাই শীতল হল, তখন সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল যে মেঘটা তা থেকে শুরু হল অঝোর ধারে বৃষ্টি। দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর, বছর থেকে শতাব্দী গেল

পেরিয়ে। বর্ষণের যেন নেই কোন শ্রান্তি, কোন ক্লান্তি। জলে জলে ভরে উঠল মহাসাগরের শূন্য আধারগুলো।

এই মতটির সপক্ষেই বেশির ভাগ ভূবিদের সমর্থন পাওয়া যায়। সমুদ্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে আর একটি আধুনিক মত অন্য এক ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এর গোড়ার কথাটা শুরু হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে। এই ধারণা অনুযায়ী পৃথিবী গড়ে উঠেছিল মহাকাশে ছড়ানো ছোট বড় নানা ধুলোকণা ও বস্তুপিণ্ডের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর আকার যত বাড়ছিল, তার অভিকর্ষও (গ্র্যাভিটি) সেই অনুপাতে বেড়ে চলেছিল। অভিকর্ষের জন্যে যখন পৃথিবীর দেহে সঙ্কোচন ঘটতে শুরু করল তখন চাপের প্রভাবে ভিতর থেকে জলীয় বাষ্প ও বিভিন্ন গ্যাস বেরিয়ে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে গড়ে তুলল। বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় বাষ্প জমা হবার পর শুরু হল প্রেসিপিটেশন বা অধঃক্ষেপণ। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে পৃথিবীর সমস্ত সাগরের বিরাট বিপুল জলরাশি তৈরি হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর মহাসাগরের সৃষ্টি যে-কোন কারণেই হয়ে থাক না কেন, ঘটনাটা ঘটেছিল কয়েকশো কোটি বছর আগে। পৃথিবী সৃষ্টি হবার প্রায় একই সঙ্গে তার মহাসাগরও গড়ে ওঠে, এইটেই ভূবিদদের অনুমান।

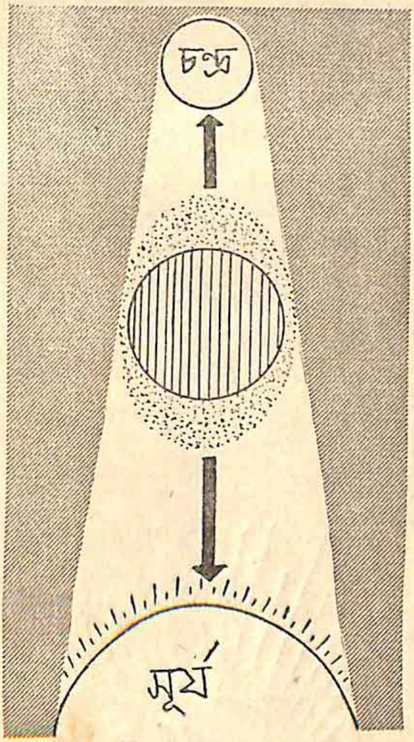
জোয়ার ভাটা

পৃথিবীর সমস্ত উপকূল জুড়ে প্রতিদিন দু-বার করে সাগরের জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। বন্দর, খাড়ি, নদীনালা সর্বত্র এ সময় জলের মাত্রা বেড়ে যায়। একে আমরা বলি জোয়ার। প্রতিদিন দু-বার করে জোয়ারের জল আবার সাগরের পানে ফিরে আসে। জলের মাত্রা তখন নেমে আসে সব জায়গায়। তাকে আমরা বলি ভাটা।

আমরা জানি, সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণেই সাগরের জলে জোয়ার

ভাটার সৃষ্টি হয়। চাঁদ যেহেতু সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর অনেক কাছে রয়েছে, সাগরের জলের উপর চাঁদের আকর্ষণের জোরটা তাই সূর্যের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি জোরালো হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য চাঁদের এই আকর্ষণের জোরটা তার ঠিক সামনাসামনি পৃথিবীর জলভাগের উপরেই সীমাবদ্ধ থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উপর সেই আকর্ষণের প্রভাব সূর্যের তুলনায় অনেক কম অনুভূত হয়।

চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর এক পিঠের সাগরের জল চাঁদের দিকে ফুলে ফেঁপে উঠে জোয়ারের সৃষ্টি হল। পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে

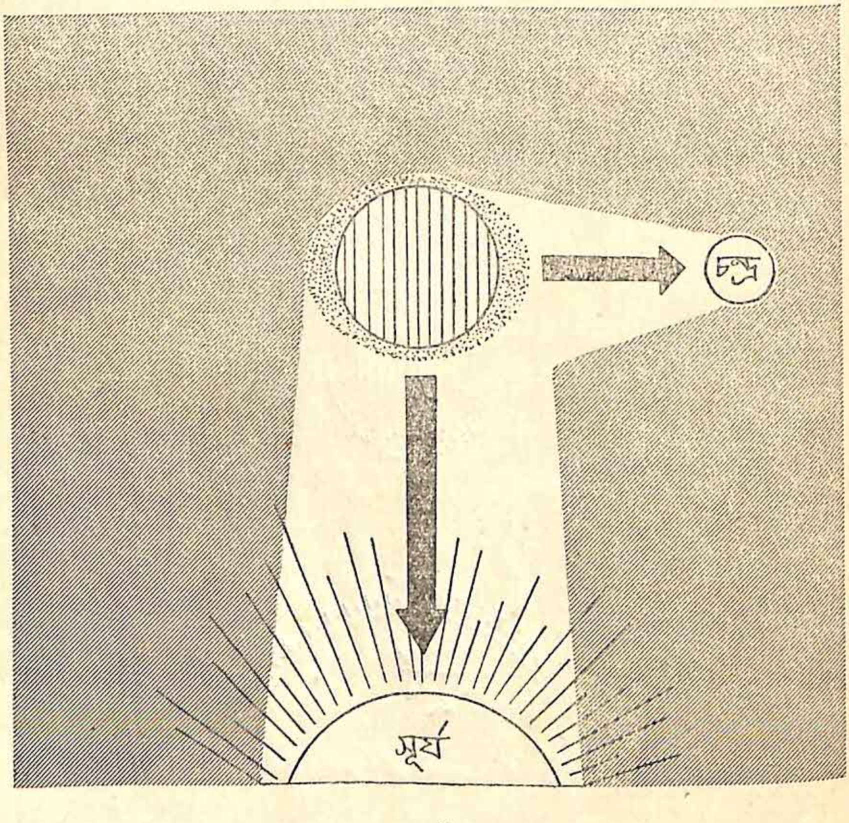


তেজ কটাল

চাঁদের এই আকর্ষণের জোরটা কম অনুভূত হবে। তাই সে-পিঠের সাগরের জল চাঁদের উলটো দিকে ঠেলে উঠে আর একটি জোয়ারের

সৃষ্টি করে। ফলে চাঁদের পৃথিবী পরিক্রমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকের অঞ্চলে দুটি জোয়ারের স্ফীতি একই সঙ্গে ঘটতে থাকে।

চাঁদ এবং সূর্য যখন পৃথিবীর সঙ্গে একই সরলরেখায় অবস্থান করে, তখন পৃথিবীর উপর তাদের আকর্ষণের জোরটা খুবই জোরালো হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে সাগরের জলে যে জোয়ারের স্ফীতি ঘটে, তার মাপ অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে উঠতে দেখা যায়। একে বলে স্প্রিং টাইড বা তেজ কটাল। প্রতি মাসে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় দু-বার করে এই জোয়ারটি ঘটে থাকে।



মরা কটাল

পৃথিবীর কোন সাগরের জলে যখন জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তখন

তার ঠিক সমকোণে যে জায়গার অবস্থান সেখানকার জলরাশিতে ভাটার সৃষ্টি হবে। তেজ কটালের ছবিতে দেখানো হয়েছে, পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকে যখন জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছে, তখন তাদের সমকোণে অবস্থিত দুই প্রান্তে কিভাবে ভাটার সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

চাঁদ, পৃথিবী এবং সূর্য আবার যখন একে অপরের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে, পৃথিবীর উপর সে সময় চাঁদ ও সূর্যের পারস্পরিক আকর্ষণের জোরটা অনেকটা কম অনুভূত হয়। সাগরের জলে জোয়ারের স্ফীতির পরিমাণটাও তাই কমে আসে। একে বলা হয় নিপ্ টাইড বা মরা কটাল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সাগরের জলে জোয়ারের যে বেগ তা যেন পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর গতিকে অর্থাৎ আহ্নিক গতিকে (ঘণ্টায় ১০৩৭ মাইল) কমাতে চাইছে। এই গতি ঠিক রাখার জন্যে পৃথিবীকে যেন সব সময়ে শক্তি জোগাতে হচ্ছে। এ থেকে যে সিদ্ধান্তটা দাঁড়ায় তা হল এই যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি খুব ধীরে ধীরে কমে আসছে। পৃথিবীর দিনের পরিমাণও সেই অনুপাতে বেড়েই চলেছে। সেই বৃদ্ধির হারটা বর্তমানে হয়ত এতই সামান্য যে আমরা তা সহজে বুঝে উঠতে পারি না।

সাগরজলের উপাদান

সাগরের জল যে খুবই লবণাক্ত, সে তোমরা সবাই জান। পৃথিবীতে মহাসাগরের জন্ম যখন হল, তখন তার জল কিন্তু এত লবণাক্ত ছিল না। যুগ যুগ ধরে বৃষ্টি এবং বরফ-গলা জল মহাদেশের জমির নানা লবণ-জাতীয় পদার্থকে এনে জড় করে নদীতে। নদী সেইসব বস্তু এনে ঢেলে দেয় সাগরে। এভাবেই সাগরের জল আজ এত লবণাক্ত হয়ে উঠেছে এবং যত দিন যাবে তত এই লবণের মাত্রা আরো বেড়ে উঠবে।

সাগরের জলে যত খনিজ পদার্থ রয়েছে, তার $\frac{3}{4}$ ভাগ হল

সোডিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ যে লবণ আমরা ব্যবহার করে থাকি সেই লবণ। প্রতি ১০০০ ভাগ সাগরের জলে এই খনিজটির পরিমাণ হল ৩৫ ভাগ, বা শতকরা হিসেবে ৩½ ভাগ। পৃথিবীর সবচেয়ে লবণাক্ত জলভাগ হল আমেরিকার উটা প্রদেশের 'গ্রেট সল্ট লেক'। এই স্থলবেষ্টিত হ্রদটির লবণের পরিমাণ শতকরা ২৮ ভাগ। পৃথিবীর সব সমুদ্রের জলে যত লবণ রয়েছে, তাকে সমানভাবে সমগ্র পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দিলে ৫০০ ফুট পুরু একটি স্তর তৈরি হতে পারে।

সাগরের জলে অন্য যে-সব খনিজ রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ব্রোমিন, আয়োডিন, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, জিঙ্ক, সীসে, সোনা ও রুপো।

সাগরের জলে যে-সব গ্যাস রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হল নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে, সাগরের জলে ঐ গ্যাসটির পরিমাণ সে তুলনায় ১৮ থেকে ২৭ গুণ বেশি। উষ্ণ জলের তুলনায় আবার ঠাণ্ডা জলে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে। এই ব্যাপারটি অতীত পৃথিবীর জলবায়ু গঠনে একটি মস্ত বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

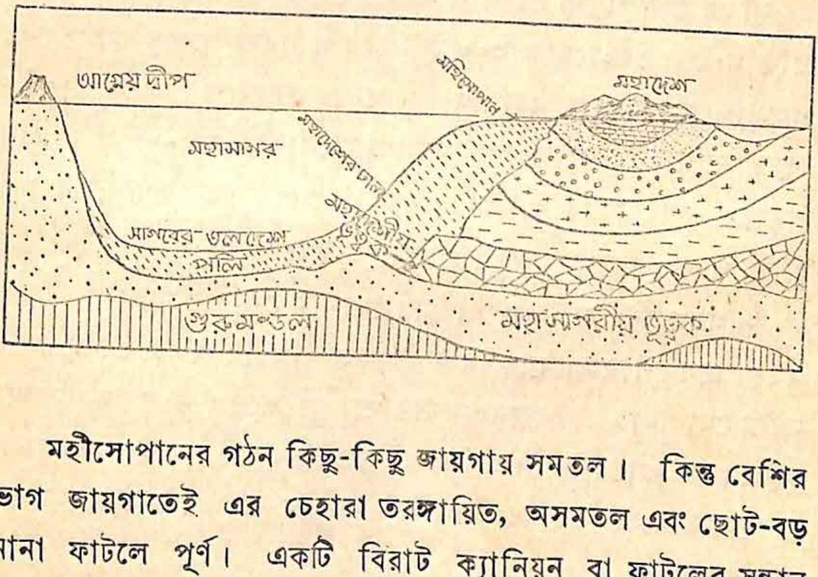
বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড তাপ শোষণ করে। সাগরের জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা যদি যথেষ্ট শীতল হত, তাহলে সাগর বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিত। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে গিয়ে হয়ত আর একটি নতুন তুষার-যুগই এসে হাজির হত।

মহীসোপান (কন্টিনেন্টাল শেল্ভ্স্)

সাগরের উপকূলেই কিন্তু মহাদেশের জমির শেষ নয়। সাগরের জলের ভিতর দিয়ে মহাদেশের জমি যেন সিঁড়ির মত ধাপে-ধাপে

নেমে গেছে মহাসাগরের গভীর প্রদেশের দিকে। সাগরের জলের নিচে মহাদেশের এই অংশকে বলা হয় মহীসোপান। এর বেশির ভাগ অংশেই জলের গভীরতা ৬০০ ফুটেরও কম।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বরাবর দুই আমেরিকা মহাদেশে মহীসোপানের বিস্তৃতি ২০ মাইলের মত। আবার নরওয়ের উত্তর উপকূলে ব্যারেন্টস সাগরের উপর এর বিস্তৃতি প্রায় ৭৫০ মাইল। ইয়োরোপের প্রায় সর্বত্র মহীসোপানের বিস্তৃতি ২০ থেকে ২৫ মাইলের মত।



মহীসোপানের গঠন কিছু-কিছু জায়গায় সমতল। কিন্তু বেশির ভাগ জায়গাতেই এর চেহারা তরঙ্গায়িত, অসমতল এবং ছোট-বড় নানা ফাটলে পূর্ণ। একটি বিরাট ক্যানিয়ন বা ফাটলের সন্ধান পাওয়া গেছে আমেরিকার হাডসন নদীর মোহানায়। এই ফাটলটি আমেরিকার মহীসোপান ছাড়িয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়ে দুশো মাইল বিস্তৃত হয়ে আছে। ঐ বিরাট ফাটলটি সুদূর অতীতে নদীর প্রবাহের দ্বারাই তৈরি হয়েছিল। সমগ্র অঞ্চলটিও যে একদিন সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরেই ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর মহাদেশের সব নদী তাদের পলির বোঝা প্রথমে এই মহীসোপানের উপর এনেই ঢেলে দেয়। এইসব পলির মধ্যে যে

অজৈব পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান রয়েছে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কালক্রমে চুনাপাথর-জাতীয় শিলা তৈরি করে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মহীসোপানের শিলাস্তরে ভূবিদরা পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পেয়েছেন এবং নতুন তেলের অনুসন্ধানও চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

মহাদেশের ঢাল (কণ্টিনেণ্টাল স্লোপ্‌স্)

মহীসোপানের গভীরতা প্রতি মাইলে ২০ ফুট করে বেড়ে চলে। এই বৃদ্ধির হার আরো বেশি পরিমাণে বেড়ে ওঠে মহাদেশের ঢালে। প্রতি মাইলে ১৫০ থেকে ৩০০ ফুট করে গভীরতা বেড়ে মহাদেশের ঢাল গিয়ে পৌঁছয় মহাসাগরের গভীর তলদেশে। এই অংশটির উচ্চতা সাগরের তলদেশ থেকে কোথাও কোথাও ৩০,০০০ ফুটে এসে দাঁড়ায়। এখানকার পলির প্রধান উপাদান হল কাদা; এছাড়া বালি, পাথর, ঝিনুকও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

সাগরগর্ভের ফাটলগুলো মহীসোপান পেরিয়ে মহাদেশের ঢাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। হাডসন নদীর মত পৃথিবীর আরো কোন-কোন নদীর মোহানায় কেনিয়নের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারত মহাসাগরে গবেষণারত আমেরিকান জাহাজ পায়োনিয়ার বঙ্গোপসাগরে গঙ্গানদীর মোহানার কাছে বহু মাইল দীর্ঘ এরকম একটি ফাটলের সন্ধান পেয়েছে।

সাগর-পৃষ্ঠের হাজার-খানেক ফুট নিচে সূর্যের আলো ও তেজ আর পৌঁছয় না। কাজেই কোন উদ্ভিদ মহাদেশের ঢাল অংশে জন্মায় না। এ এক অসীম অন্ধকারের রাজত্ব। ক্ষুব্ধ সাগরের কোন কল্লোল এখানে পৌঁছবার আগেই মাঝপথে হারিয়ে যায়।

সাগরের তলদেশ

মহাদেশের ঢাল নেমে এসে সাগরের তলদেশে পৌঁছয়। পৃথিবীর সাগরের তলদেশের গড়পড়তা গভীরতা প্রায় ২½ মাইল। এ এক বিচিত্র জগৎ। এতটুকু আলোর চিহ্ন কোথাও নেই এর।

বহুদিন পর্যন্ত সমুদ্রবিদরা মনে করতেন, সাগরের তলদেশ এক সমতল ক্ষেত্র। কিন্তু সাগরের গভীরতা মাপার যন্ত্রের সাহায্যে সাগরগর্ভের ভূপ্রকৃতির এক নতুন চেহারা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। আজ আমরা জানি, মহাদেশের মতই সাগরগর্ভেও রয়েছে বিরাট বিরাট পর্বতশ্রেণী। তাদের মধ্যে কয়েকটির উচ্চতা এভারেস্টকেও হার মানায়।

সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কারটি হল যে, পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রের তলা দিয়েই ৪০,০০০ মাইল দীর্ঘ একটানা এক পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত রয়েছে। এর মধ্যে আটলান্টিকের মধ্যবর্তী অংশটিই সবচেয়ে বিরাট। আইসল্যাণ্ড থেকে কুমেরু মহাদেশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০,০০০ মাইল, চওড়ায় ৫০০ মাইল এবং উচ্চতায় ৬০০০ থেকে ১০০০০ ফুট। কোথাও-কোথাও এই পর্বত সাগরের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছোট-বড় নানা দ্বীপ গড়ে তুলেছে, যেমন ক্যানেরিস, অ্যাজোরস্ ইত্যাদি। প্রশান্ত মহাসাগরে এই পর্বতটি আবার সাগরের উপর হাওয়াই, কুরাইল, জাপান, ফিলিপাইন্স্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

মহাদেশের পর্বতগুলো যেমন বাতাস ও বৃষ্টির জলে প্রতিনিয়ত ক্ষয় পেয়ে চলেছে, সাগরের পর্বত কিন্তু সে ঝামেলা থেকে মুক্ত। এইসব পর্বতের আশেপাশে বিরাট গভীর ফাটল এবং ট্রেঞ্চ বা গর্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সাগরের সবচেয়ে গভীর অংশের সন্ধান পাওয়া গেছে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের ছ-মাইল পূর্বে ম্যারিয়ানাস্ ট্রেঞ্চ নামে একটি স্থানে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই গর্তটির গভীরতা ৩৭,৮০০ ফুট বা ৭ মাইল। এভারেস্ট পাহাড়টাকে

ঐ জায়গায় বসিয়ে দিলেও মাথার উপর আরো প্রায় ৯,০০০ ফুট গভীর জল থেকে যাবে।

মহাসাগরের এইসব পর্বত এবং গর্তের আশেপাশের জায়গায় ভূগর্ভের অস্থির, অশান্ত রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। পৃথিবীতে যত মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটে তারা এ সব জায়গা থেকেই তৈরি হয়। সমুদ্রগর্ভের হঠাৎ-আন্দোলনের ফলে যেসব ৎসুনামির সৃষ্টি, তাদের তৈরির কারখানাটিও এখানেই। এই সব ট্রেঞ্চ এবং ফাটলের কাছাকাছি বহু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতও বর্তমান যুগেই ঘটছে। তাদের বেশির ভাগই অবশ্য আমাদের অগোচরে থেকে যায়।

যুগ-যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন নদী যে পলির বোঝা এনে মুক্ত করে দেয় সাগরের মহীসোপানে, তার অনেকটাই সাগরের তলদেশে গিয়ে জমা হতে থাকে। এই পলির একটি প্রধান উপাদান হল অজস্র সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাসাগরের তলদেশে এই পলি ১,০০০ ফুট থেকে ১০,০০০ ফুট পর্যন্ত পুরু হতে দেখা যায়। সাগরগর্ভের এই পলির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে পৃথিবী ও তার প্রাণীজগতের সমগ্র বিবর্তনের ইতিহাস। মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির আড়ালে প্রকৃতি অতি সঙ্গোপনে সেই ইতিহাসের অধ্যায়গুলো রক্ষা করে চলেছে।

মোহোল

মোহোল পরিকল্পনার কথা তোমাদের আগেই বলেছি। ভূত্বকের মাপ মহাদেশের তুলনায় মহাসাগরের নিচে যে অনেক কম, সে কথাও আমরা জানি। তাই গুরুমণ্ডলের নমুনা সংগ্রহ করার প্রাথমিক পরীক্ষাটা সাগরের বুকেই করা হয়েছিল। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জানা যাবে যে, গুরুমণ্ডলও ভূত্বকের মত একই বস্তুর সমবায়ে গড়ে উঠেছে, কি না। ঐ মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে তাপমাত্রার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, ভূগর্ভে কন্‌ভেকশনাল বা পরিচলনশীল বিদ্যুৎ-

প্রবাহের অস্তিত্ব থাকলে তা ধরা পড়ে যাবে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, পর্বত গড়ে ওঠা, মহাদেশগুলোর চলে-ফিরে বেড়ানো এবং তাদের সৃষ্টির আদত ব্যাপার, সবকিছুই এই জাতীয় বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হবার কথা।

একই সঙ্গে মহাসাগরীয় ভূত্বকের নমুনার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা সন্ধান-কাজ চালিয়ে ভূত্বকের বয়সও ধরে ফেলা যাবে।

সাগরগর্ভে স্তরে-স্তরে সঞ্চিত পলির নমুনাও মোহোল পরীক্ষায় সংগ্রহ করে আনার পরিকল্পনা ছিল। আদি যুগ থেকে এই পলি প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। কাজেই তাদের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভূবিদরা বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর সমুদ্রস্রোত এবং জলবায়ুর চেহারা কিভাবে বদলেছে, তা জানতে পারবেন। একই সঙ্গে পৃথিবী ও তার প্রাণীজগতের বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবিও ঐ পলি তাদের হাতে তুলে দেবে।

সাগরের স্রোত

মহাসাগরের জলরাশি কখনো স্থির থাকে না। বাতাসের ছোঁয়ায় তার দেহ জুড়ে সব সময়েই ঢেউ তৈরি হয়ে চলেছে। এই ঢেউ সাধারণত ২৫ ফুটের চেয়ে বেশি উঁচু হয় না। ঝোড়ো দামাল হাওয়ার মাতনে ঢেউয়ের মাথা যখন ১০০ থেকে ২০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ওঠে, তখন তার পেছনে ছুটে আসে ধ্বংস আর মৃত্যু।

জোয়ারের সময় সাগরের জল ফুলে ফেঁপে ওঠে। তখন এক ধরনের সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তারা ক্ষণস্থায়ী। বরাবরের জন্যে যেসব স্রোত মহাসাগরের বুকে তাদের সংসার গুছিয়ে বসেছে, তাদের নিয়েই আমাদের কথা। মহাসাগরের বুকে এই স্রোতগুলোর বিরাট চেহারার মধ্যে যে বিপুল জলরাশি ছুটতে থাকে, তার পাশে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদীগুলোকে

দেখাবে স্রেফ নালার মত। গাল্‌ফ্‌ স্ট্রীম বা উপসাগরীয় স্রোতটির মধ্যে মিসিসিপি নদীর তুলনায় প্রায় ১,০০০ গুণ বেশি জল বয়ে চলেছে।

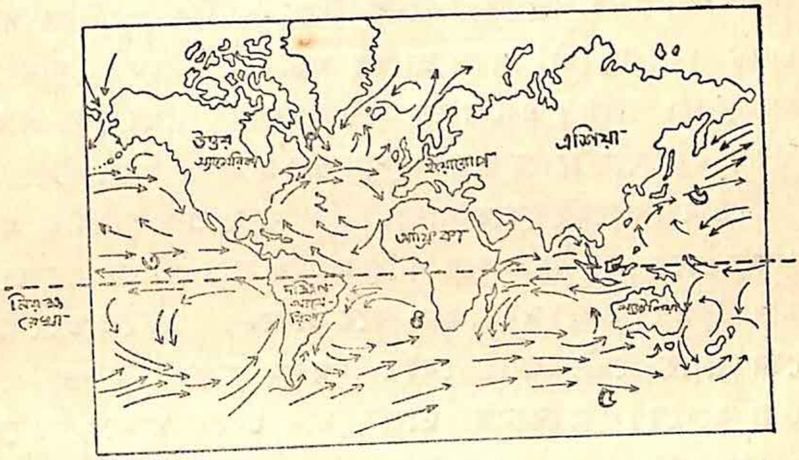
কিছু-কিছু সমুদ্রস্রোতের চেহারা লম্বায় হাজার হাজার মাইল এবং চওড়ায় ৪০ থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। সাগরের জলরাশির সঙ্গে এইসব স্রোতের কোথাও মিশ্রণ ঘটে না। পৃথিবীর সাগরগুলোর জলের গড়পড়তা তাপমাত্রা হল ৩৯ ডিগ্রি ফারেনহিট। কিন্তু সমুদ্রস্রোতের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা তাপমাত্রা রয়েছে। এদের জলের মধ্যে লবণের পরিমাণটাও আশেপাশের জলের তুলনায় একেবারেই আলাদা।

এখন প্রশ্নটা হল, সমুদ্র-স্রোত তৈরি হয় কেন? গোটাকয়েক কারণ এর মূলে রয়েছে। একটি হল পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুস্রোত, যাকে আমরা বলি বাণিজ্য-বায়ু বা ট্রেড-উইণ্ডস। দ্বিতীয়টি হল, পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর ঘুরপাক খাওয়া। মহাদেশগুলোর অবস্থিতি হল আর একটি কারণ, সাগরের স্রোতের ছোটবার দিকটাই যারা পালটে দেয়। গ্রীষ্মমণ্ডলে সূর্যের তাপে তপ্ত জলরাশির প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়াও সমুদ্রস্রোত তৈরি হবার মূলে রয়েছে।

সূর্যের তাপে পৃথিবীর সব জায়গা সমানভাবে তপ্ত হয় না। গ্রীষ্মমণ্ডলে সাগরের জলের তাপ প্রায় ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় থাকে। মেরু অঞ্চলের শীতলতায় এই তাপ এসে দাঁড়ায় ৩২ ডিগ্রি ফারেনহিটে। তপ্ত জল স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়ে হালকা হয়ে যায়। ঠাণ্ডা জল আরো ঘন হয়ে ভারি হয়ে ওঠে। মেরু অঞ্চলের ভারি ঠাণ্ডা জল ডুবে গিয়ে সাগরের তলদেশের উপর দিয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলে। আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের তপ্ত জল সাগরের উপরতলা দিয়ে মেরুসাগরের খালি-হওয়া জায়গাটা ভরাট করবার জন্যে ছুটে চলে। জলের এই

স্বাভাবিক প্রবাহের গতি খুবই মন্থর হয়ে দাঁড়াত, কিন্তু বায়ুস্রোত ঘাড়ে চেপে এদের দৌড়টাকে দেয় বহুগুণ বাড়িয়ে।

পৃথিবী পশ্চিম থেকে পুবদিকে ঘোরার ফলে নিরক্ষরেখার দু-পাশে একধরনের বায়ুস্রোতের সৃষ্টি হয়। এদের নাম দেওয়া



পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত। (১) ল্যাব্রেডর স্রোত (২) উপসাগরীয় স্রোত (৩) উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত (৪) বেঙ্গুয়েলা স্রোত (৫) দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (৬) কুরোশিও স্রোত

হয়েছে 'প্রিভেইলিং উইণ্ডস' এবং এদের গতিপথটা সবসময়ে পশ্চিমদিকে হয়। নিরক্ষরেখার উত্তরে তপ্ত জলের প্রবাহ নিয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ঐ বায়ুস্রোতের ঘাড়ে চেপে পশ্চিমের যাত্রী হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে প্রতিহত হয়ে ঐ সমুদ্রস্রোতের একটি অংশ উপসাগরীয় স্রোত সৃষ্টি করে। উপসাগরীয় স্রোত আটলান্টিকের উপর দিয়ে ইয়োরোপে পাড়ি জমাচ্ছে বলেই কতগুলো দেশ ঠাণ্ডায় জমে মরার হাত থেকে বেঁচেছে। উত্তর আমেরিকার বেশ কিছুটা অঞ্চল প্রায় বারোমাসই বরফাচ্ছন্ন থাকে। অথচ একই অক্ষরেখায় অবস্থিত হয়েও স্রেফ উপসাগরীয় স্রোতের কল্যাণে ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেনের জলবায়ু কিছুটা মৃদুভাবাপন্ন হতে পেরেছে।

মহাসাগরের আরো দুটি প্রধান উষ্ণ জলপ্রবাহ হল দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত এবং কুরোশিয়ো স্রোত। ল্যাব্রেডর স্রোত ও বেঙ্গুয়েলা স্রোত হল মহাসাগরের দুটি প্রধান শীতল জলধারা।

সম্প্রতিকালে সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা উপসাগরীয় স্রোত ও আরো তিনটি সামুদ্রিক স্রোতের অনেক নিচে ও ঠিক একই জায়গায় চারটি বিপরীতমুখী সমুদ্রস্রোতের সন্ধান পেয়েছেন। পৃথিবীর আবহাওয়া, জলবায়ু এবং সমুদ্রে প্রাণীজগতের বিকাশের মূলে এদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

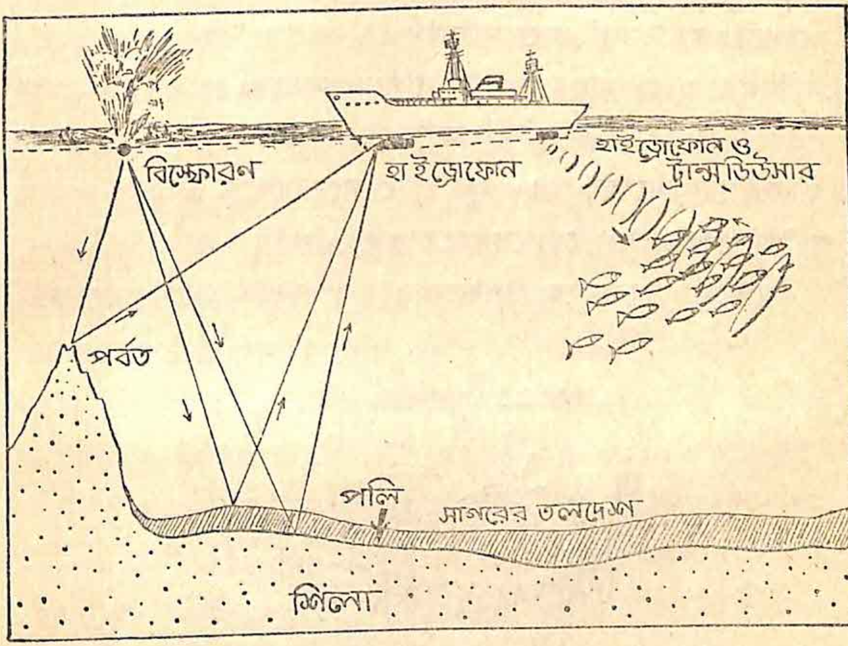
তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ, বিভিন্ন সমুদ্রস্রোত পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে আর-এক অঞ্চলে পাড়ি জমিয়ে সারা পৃথিবীর জলবায়ুর মধ্যে কিভাবে একটা সমতা রক্ষা করে চলেছে। এই স্রোতগুলোর যেন ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। যুগ-যুগ ধরে একই পথ ধরে এরা চলেছে। চিরকালই তারা এমনি চলতে থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখছেন যে, আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগর প্রতি ১৬৫ বছরে তার সমগ্র জলরাশিকে পালটে নেয়। এ-যেন আমাদের লালদিঘি বা গোলদিঘির জল পালটানোর মত একটা ব্যাপার। পৃথিবীর আর সব ক-টি মহাসাগর ও সাগর ঠিক একই ধারায় তাদের ভোল পালটে ফেলে।

সাগরের গভীরে

আগেকার দিনে সাগরের গভীরতা মাপার জন্যে দড়ি বা তারের প্রান্তে একটা ওজন ঝুলিয়ে সেটা জলে নামিয়ে দেওয়া হত। ওজনটি যখন সাগর-গর্ভে গিয়ে ঠেকত, তখন তার বা দড়ির দৈর্ঘ্য মেপে জলের গভীরতা মোটামুটি আন্দাজ করা সম্ভব হত। এ-সব সেকেলে পদ্ধতির সাহায্যে সাগরগর্ভের গঠনপ্রকৃতির কোন বৈচিত্র্য স্বভাবতই ধরা পড়ত না।

আজকাল ট্রান্সডিউসার-জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলে শব্দতরঙ্গের মত চাপযুক্ত তরঙ্গ তৈরি করে সাগরের জলের মধ্য দিয়ে নিচের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লবণাক্ত জলের মধ্যে শব্দতরঙ্গের গতিবেগ জানা আছে। কাজেই তরঙ্গের নিচে নামা



এবং কোন জায়গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার সময়টুকু ফ্যাদোমিটার যন্ত্রে হিসেবের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সাগরের গভীরতার মাপ চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। পর্বত, ফাটল বা ট্রেঞ্চ, এর কোন্ ধরনের গঠনপ্রকৃতি রয়েছে সাগরের তলদেশে সে তথ্যটুকুও একই সঙ্গে জানা হয়ে যায়। একই উপায়ে শব্দতরঙ্গের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে সাগর-গর্ভে মাছের ঝাঁকের অস্তিত্বও ধরা পড়ে।

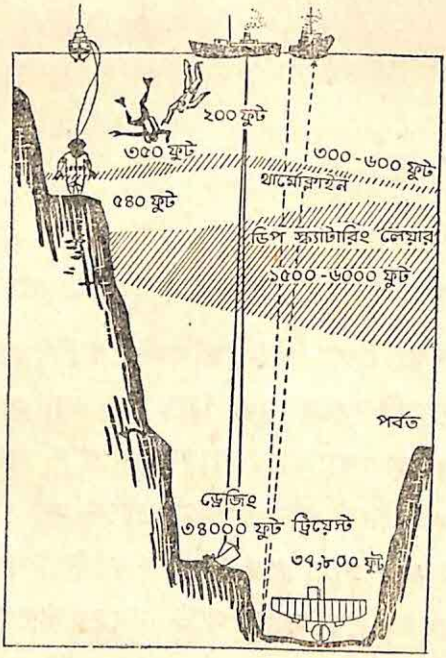
সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর বিস্ফোরণ ঘটালে কম্পনশীল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সাগর-গর্ভের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সেই তরঙ্গের প্রতিফলনের

(ইকো) মধ্য দিয়ে জানা যায় সাগরের তলদেশে পলির গভীরতা কতখানি, কী ধরনের শিলাস্তর সেখানে রয়েছে এবং তা কতখানি পুরু।

সাগরগর্ভে অভিযান

সারগর্ভের রহস্য আবিষ্কারে মানুষের কৌতূহলের যেন শেষ নেই। অক্সিজেন ছাড়া মানুষ এ পর্যন্ত সাগরের সবচেয়ে যে গভীরে নামতে পেরেছে, তা হল ২০০ ফুট। অক্সিজেনের মুখোস সঙ্গে নিয়ে মানুষ এককভাবে নেমেছে ৩৫০ ফুট। হেলমেট পরে জাহাজ থেকে লাইফ-লাইনের সাহায্যে সে নেমেছে ৫৪০ ফুট।

সাগরের একেবারে উপরতলার জল সূর্যের তাপে তপ্ত হয়।



কিন্তু সাগরের গভীরে ৩০০ থেকে ৬০০ ফুট এলাকার মধ্যে তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গিয়ে থার্মোক্লাইন নামে ঠাণ্ডা জলের একটি বেশ চওড়া

স্তর তৈরি করে। জলের এই স্তরটি সাগরের উপরের অংশকে তার বাদবাকি নিচের অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে রেখেছে।

বিভিন্ন সাগরের গভীরে ১৫০০ থেকে ৬০০০ ফুট অঞ্চলের মধ্যে 'ডিপ্ স্ক্যাটারিং লেয়ার' নামে একটি জলের স্তরের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এই জলস্তরটি হাই-ফ্রিকোয়েন্সি বা উচ্চ-কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে, অর্থাৎ কোন সাবমেরিন এই স্তরের তলায় গেলে তার অস্তিত্ব টের পাওয়া কঠিন।

জাহাজ থেকে মানুষ প্রায় ৩৪,০০০ ফুট গভীরে পর্বতের শিলাদেহ খুঁড়ে (ড্রেজিং) সেই উপাদান উপরে তুলে আনতে পেরেছে। ১৯৬০ সালের ২৩শে জানুয়ারি ট্রিয়েস্ট নামে একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রে চড়ে পিকার্ড ও ওয়ালেস নামে দু-জন বিজ্ঞানী সাগরের সবচেয়ে গভীর অংশ মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে (৩৭,৮০০ ফুট গভীর) নেমে এক আশ্চর্য রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এই ট্রেঞ্চটি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। গবেষণা-কক্ষের স্বচ্ছ দেয়ালের মধ্য দিয়ে সাগরের বিচিত্র প্রাণীজগতের এক অপরূপ ছবি ঐ দুটি মানুষের কাছে ধরা পড়েছিল। সাগরে একেবারে গভীরতম প্রদেশেও তাঁরা প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন।

প্রাণের বিচিত্র রূপ

পৃথিবীর প্রথম প্রাণ স্পন্দিত হয়েছিল সাগরের জলে, সে কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। তারা ছিল এককোষী উদ্ভিদ, তাদের দেহের মাপ ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। এ থেকেই জন্মালো প্রথম এককোষী আনুবীক্ষণিক প্রাণী। এককোষী প্রাণী থেকে সৃষ্টি হল বহুকোষী জটিল প্রাণীর। তারপর বিবর্তনের (ইভলিউশন) সিঁড়ি ধরে শুরু হল প্রাণের এক বিচিত্র শোভাযাত্রা।

সাগরে এক বিপুল প্রাণের সম্ভার রয়েছে। পরীক্ষার জন্যে খানিকটা সাগরের জল সংগ্রহ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে

তাকালেই দেখবে, লক্ষ-লক্ষ অতি ক্ষুদ্র জীবকোষ তার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

মহাকাশের মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে পৃথিবীতে মানুষের বংশগতির ধারা বা মিউটেশন প্রভাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু সাগরের গভীরতম প্রদেশে এই রশ্মিটির প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই সেখানকার প্রাণীজগতের চেহারা বহু যুগ ধরে প্রায় একই অবস্থায় রয়ে গেছে।

প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সাগরের জলে কোয়েলাকান্থ জাতীয় প্রাণীরা জন্ম নিয়েছিল। ছ-কোটি বছর আগেই এরা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অথচ কয়েক বছর আগে আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তের সাগরে এ-রকম কয়েকটি প্রাণী ধরা পড়েছে। বিজ্ঞানীরা এ-জাতীয় আরো কিছু আবিষ্কারের আশা রাখেন।

যেই রাত্রি ঘনিয়ে আসে, অমনি নানা বিচিত্র প্রাণীদেহের ফসফরাসের ঝিকিমিকিতে সাগর এক রূপকথার মায়াপুরী হয়ে ওঠে। সাগরের রূপের বৈচিত্র্যের যেন আর শেষ নেই।

মহাসাগরের রহস্য উদ্ধারে নেমেছেন বিজ্ঞানীরা। সাগরগর্ভে রয়েছে পরম মূল্যবান খনিজ সম্পদ। ভবিষ্যতে মানুষের খাদ্যবস্তু উৎপাদনের কাজেও হয়ত বিজ্ঞানীরা সাগরকে কাজে লাগিয়ে বসবেন। প্রকৃতির এই অনাবিষ্কৃত বিরাট অঞ্চলটি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অধিকারে আসবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সাগরের কথা শেষ হল। এবারে আমরা আসব পৃথিবীর বরফের কথায়।

৮

পৃথিবীর বরফের কথা

গত দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীর দুই মেরু-অঞ্চল থেকে বরফের স্তূপ বার বার মহাদেশের জমির উপর অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানের ফলে উত্তর আমেরিকা, ইয়োরোপ ও এশিয়ার সমগ্র উত্তরাঞ্চল প্রতিবার বরফে ঢাকা পড়ে যায়। প্রত্যেকটি তুষার-যুগের শেষে বরফ আবার সরে গিয়ে মহাদেশের জমিকে তার বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে। পৃথিবীর সর্বশেষ তুষার-যুগটি শেষ হয়েছে আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে।

পৃথিবীর সমগ্র জলরাশির $\frac{1}{10}$ ভাগ অংশ বরফরূপে সুমেরু (আর্কটিক) এবং কুমেরু (অ্যান্টার্কটিক) মহাদেশে জমা হয়ে আছে। বরফে ঢাকা পৃথিবীর এই দুটি রহস্যময় মহাদেশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মনে অনেক প্রশ্ন। এদের বরফের পরিমাণ কি বাড়ছে? এই বিপুল পরিমাণ বরফ কোনদিন কি গলতে পারে? কুমেরু পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে কি? একটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের অন্ত নেই। কুমেরু একদিন গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন অঞ্চলের মতই সবুজ শ্যামল ছিল, কিন্তু তা হঠাৎ বরফাচ্ছন্ন হয়ে বসল কেন?

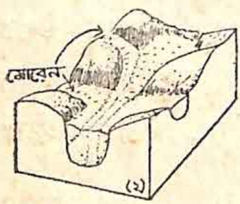
হিমবাহ (গ্লেসিয়ার)

পৃথিবীর তুষার-যুগের সাক্ষীরূপে যারা আজও টিকে রয়েছে, তারা হল হিমবাহ। একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর সব কটি মহাদেশে এদের দেখা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিরাট পর্বতগুলোর শীতল উত্তুঙ্গ প্রদেশ হল এদের বাসভূমি। বরফের নদীরূপে পাহাড়ের গা বেয়ে এরা নামতে শুরু করে। চলবার গতি প্রায় শম্বুকের মত, সারা দিনে বড়জোর একফুট। বড় মাপের কিছু হিমবাহ অবশ্য এক দিনে একশো ফুটও পাড়ি জমিয়ে বসতে পারে।

পাহাড়ের গা বেয়ে নামবার সময় শিলার সঙ্ঘাতে হিমবাহের বরফের দেহে গভীর গর্ত (ক্রিভাস) সৃষ্টি হয়। হিমবাহের বরফের নদী আবার তার পথের দু-পাশে পাহাড়ের দেহ গভীরভাবে কাটতে থাকে। ফলে শিলা ও অন্যান্য বস্তু চলমান হিমবাহের চারপাশে জড়ো হয় এবং একই সঙ্গে এগিয়ে চলে। হিমবাহ তার পথের প্রান্তে পৌঁছে নিচেকার তাপে যখন গলতে শুরু করে, তখন ছোট-বড় শিলার টুকরোগুলো স্তূপাকারে জমা পড়তে থাকে। এদেরই বলা হয় মোরেন।

হিমবাহ শিলা কাটার ব্যাপারে যে কতখানি নিপুণ, ছবিগুলোর দিকে তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারব। এক নম্বর ছবিতে আমরা একটি পাহাড়ের উপত্যকা দেখতে পাচ্ছি, যার চেহারাটা অনেকটা ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মত। নদীর প্রবাহ পাহাড়ের মধ্যে সাধারণত এই ধরনের উপত্যকা তৈরি করে। দু-নম্বর ছবিতে দেখছি, উপত্যকাভূমিতে হিমবাহের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তার শিলাক্ষয়ের কাজ শুরু হয়ে গেছে। হিমবাহের প্রান্তে মোরেনের দল জমা পড়ে চলেছে। তিন নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে, চলার পথের দু-পাশে ও নিচের দিকে শিলা কেটে হিমবাহ উপত্যকার 'ভি'-র মত চেহারাকে 'ইউ'-এর মত করে তুলেছে। হিমবাহ সরে গিয়ে একদিকে যেমন মোরেন জমা হ্রদ ও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি পাহাড়ের মসৃণ চেহারা হয়ে উঠেছে এবড়ো-খেবড়ো।







পার্বত্য ভূমিতে হিমবাহ-গলা জল থেকেই পৃথিবীর বহু নদীর সৃষ্টি। গ্রীনল্যাণ্ডে ও আমেরিকার উত্তরে আলাস্কা প্রদেশ, কুমেরু

ও সুমেরু মহাদেশে সাগরের জলেই বহু হিমবাহের বাসভূমি। এই সব হিমবাহের দেহ ভেঙে গিয়ে জন্ম হয় হিমশৈলের (আইসবার্গ)। বরফের এক-একটি বিরাট দৈত্য যেন এরা! সাগরের বুকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি জমানোর সময় ধীরে ধীরে গলে গিয়ে অবশেষে একদিন এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একটি বিরাট হিমশৈলের সঙ্গে সঙ্ঘাতে ১৯১২ সালের ১৫ই এপ্রিল সমুদ্রগামী বিরাট জাহাজ টাইটানিকের সলিল-সমাধি ঘটে, সে কথা বোধহয় তোমরা অনেকেই জান।

পৃথিবীর সব মহাদেশের হিমবাহেরা গলছে। তোমরা ভাবতে পার, পৃথিবীর মোট বরফের পরিমাণ তাহলে ধীরে-ধীরে কমে আসছে। আসলে ব্যাপারটা যে কী, তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি।

বরফের রাজত্ব

গত দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীতে মোট চারটি তুষার-যুগ এসেছিল। সর্বশেষ তুষার-যুগটি আজ থেকে প্রায় ১৮০০০ বছর আগে পৃথিবীর উপর জাঁকিয়ে বসে। সেই তুষার-যুগটির সর্বশেষ অধ্যায় এখনো চলেছে। যে বিপুল পরিমাণ বরফের তলায় তখন পৃথিবীর প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ ঢাকা পড়ে যায়, তার প্রায় অর্ধেকটাই এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গলে বসে আছে। এই বরফ-গলা জলে পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর জলের মাত্রাও আগের চেয়ে বেশ কিছু ফুট উপরে উঠে এসেছে।

সমগ্র পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা প্রায় দশ ভাগ জুড়ে বরফের রাজত্ব। এই বরফের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগই আবার রয়েছে কুমেরু বা অ্যান্টার্কটিক মহাদেশে। পৃথিবীর শতকরা ১০ ভাগের মত বরফ রয়েছে সুমেরু বা আর্কটিক মহাদেশে। বাকিটা রয়েছে পর্বতের হিমবাহগুলোয়। পৃথিবীর সমস্ত বরফ যদি আজ গলে যায়, তাহলে পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর জলের মাত্রা

২০০ থেকে ৩০০ ফুট পর্যন্ত উপরে উঠে আসবে। সাগরের জল মহাদেশের জমির উপর কয়েকশো মাইল এগিয়ে এসে এক বিরাট পরিমাণ জায়গাকে গ্রাস করে বসবে। আমাদের কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, টোকিও, ও পৃথিবীর বেশির ভাগ বড় শহরগুলোর মাথার উপরে তখন সাগরের জলের খেলা শুরু হয়ে যাবে। এইজাতীয় একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা সত্যিই কি কোনদিন ঘটতে পারে ? বিজ্ঞানীরা তার অনুসন্ধান করছেন।

পৃথিবীতে তুষার-যুগ কেন আসে, আবার কেনই বা তারা চলে যায় এ সম্বন্ধে প্রায় দু-ডজন বৈজ্ঞানিক মত রয়েছে। একটি মত হল, পৃথিবীতে গত বেশ কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যে যে পর্বতেরা সৃষ্টি হয়েছে, তারা বিভিন্ন বায়ুস্রোতের স্বাভাবিক চলার পথ বন্ধ করে তাদের প্রকৃতিই দিয়েছে পালটে। এই বায়ুস্রোতেরা একদিন অবাধে চলাফেরা করে পৃথিবীকে তপ্ত রাখতে সাহায্য করত। আর একটি মত হল, বিভিন্ন সময়ে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎদ্গারের ফলে পাতলা ধুলোর দল আকাশে উঠে সূর্যের অনেকখানি আলো আড়াল করে দিয়ে পৃথিবীর বরফের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করেছে। আবার অনেকের মতে, মেঘেরাই হঠাৎ একসময়ে পরিমাণে বেড়ে উঠে সূর্যের আলোকে আড়াল করে তুষার-যুগ ঘটিয়ে বসেছে। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জায়গার উপরে মেঘেরা ভেসে থাকে। এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৬৭ ভাগে এসে দাঁড়ালেই নতুন আর-একটি তুষার-যুগ নাকি ঘনিয়ে আসবে।

তুষার যুগ তৈরির সবগুলো ধারণার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলো ও তেজটাই হল আসল ব্যাপার। ওদের পৃথিবীতে পৌঁছনোর রাস্তা খোলা থাকা বা বন্ধ হওয়ার পরিমাণের উপরেই তুষার-যুগ তৈরির কলকাঠির নড়াচড়া নির্ভর করছে।

সুমেরু

পৃথিবীর দুই বরফাবৃত মহাদেশ সুমেরু ও কুমেরুর অবস্থান পৃথিবীর দুই বিপরীত প্রান্তে। মাঝখানে জমাট-বাঁধা সমুদ্র, চারপাশে স্থলভাগ, এই হল সুমেরু। সুমেরুর বেশির ভাগ অংশ হল গ্রীনল্যাণ্ড—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপ। সুমেরুর মোট এলাকার পরিমাণ ৩০ লক্ষ বর্গ-মাইল। এখানে সাগরের জলে বরফের পরিমাণ খুব পুরু নয়, সাধারণত ১০ থেকে ১৫ ফুটের মত হয়ে থাকে। উত্তর-মেরুর কাছে মহাদেশের কোন জমি নেই, সে অঞ্চলটা আর্কটিক বা উত্তর মহাসাগরের মধ্যে। এই মহাসাগরের বেশির ভাগ অংশটাই রয়েছে জমাট বাঁধা অবস্থায়। গ্রীনল্যাণ্ডের হিমমুকুটের (আইসক্যাপ) মধ্যে সুমেরু অঞ্চলের সবচেয়ে শীতল প্রদেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানকার তাপমাত্রা ছিল—৮৬'৮ ডিগ্রি ফারেনহিট।

কুমেরু

পৃথিবীর সর্বশেষ আবিষ্কৃত মহাদেশটি হল কুমেরু বা অ্যাণ্টার্কটিক। কুমেরু আকারে আমাদের ভারতবর্ষের প্রায় ৪½ গুণ বড় হবে। এর মোট এলাকার পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ বর্গমাইল। এর শতকরা ৯৯ ভাগ অংশই বরফে ঢাকা। বরফের গড় গভীরতা প্রায় ১½ মাইল। এই বরফকে নিয়ে পৃথিবীর সব মহাদেশের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিলে তার গভীরতা দাঁড়াবে প্রায় ৪০০ ফুট। এই প্রায়-অনাবিষ্কৃত মহাদেশটির কেন্দ্রস্থলে হল পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু। মেরু-অঞ্চলে তুষার ও বরফের গভীরতা প্রায় ৮৩০০ ফুট। এই বরফ আবার যে শিলাস্তরের উপর দাঁড়িয়ে আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা প্রায় ৯০০০ ফুট। আটলাণ্টিক, ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগর কুমেরুকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে।

কুমেরু পৃথিবীর সর্বোচ্চ মহাদেশ। এর গড় উচ্চতা প্রায়

৬৫০০ ফুট। এই কারণের জন্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল জায়গার সন্ধানও এখানেই পাওয়া যায়। এই মেরুতে তাপমাত্রার পরিমাণ -১০০ ডিগ্রি থেকে -১০২ ডিগ্রি ফারেনহিটের মত। ১৯৫৮ সালের ২৫শে অগস্ট কুমেরুর একটি অঞ্চলে পৃথিবীর সবচেয়ে যে শীতল তাপমাত্রার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার পরিমাণ হল -১২৫·৩ ডিগ্রি ফারেনহিট।

কুমেরু পৃথিবীর একমাত্র মহাদেশ যেখানে কোন নদী, হ্রদ বা এককোঁটা জলের সন্ধান কোথাও মিলবে না। সারা বছর জুড়ে শুধু বরফের মেলা। মহাদেশের বেশির ভাগ জায়গাতেই এক কণা ঘাসও জন্মায় না। বরফের মধ্যে থেকে কোথাও-কোথাও ছোটখাট পাহাড় শুধু মাথাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেইসব শিলার বুকে খুব সরল জাতের চারাগাছ মাত্র জন্মায়। এককোঁটা বৃষ্টি হয় না কোথাও। কিছু পোকামাকড়, সীল, পেঙ্গুইন পাখি—এরাই হল জীবজগতের সদস্য। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যে কোন কিছুই এখানে নষ্ট হয় না। ৪০ বা ৫০ বছর আগে মেরু-অভিযাত্রীর দল এখানে রুটি, মাংস ও অন্য যে-সব খাদ্যবস্তু ফেলে রেখে গেছে, আজও তারা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। এইসব খাবার এখনো স্বচ্ছন্দে খাওয়া চলতে পারে।

কুমেরুর বরফের পরিমাণ এত বেশি যে এ নিজেই এর জলবায়ু তৈরি করে বসে। কুমেরু পৃথিবীর জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে কি না সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। বছরের ছ-মাস এখানে দিন, ছ-মাস রাত্রি। ঠাণ্ডা বাতাস বিশাল বরফের প্রান্তরের উপর দিয়ে কখনো-কখনো ঘণ্টায় ১৩৪ মাইল বেগে ছুটতে থাকে।

চিরতুষারাবৃত হিমশীতল এই কুমেরুই যে একদিন পৃথিবীর অন্য যে-কোন অঞ্চলের মত সবুজ শ্যামল একটি জায়গা ছিল, কথাটা তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে চাইবে না। বর্তমানে নানা ধরনের গাছ-পালা ও কয়লার জীবাশ্ম এই মহাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে

পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে জেনেছেন, কুমেরু মহাদেশের কিছু-কিছু অঞ্চল আজ থেকে ১,৭০,০০০ বছর আগেও বরফমুক্ত ছিল।

এই-জাতীয় বিভিন্ন অনুসন্ধান থেকে একজন বিজ্ঞানী একটি মত প্রকাশ করেছেন। এই মত অনুসারে কুমেরু, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা আজ থেকে বহুযুগ পূর্বে একই স্থলভাগের অংশ ছিল। ভারতবর্ষের গণ্ডোয়ানা অঞ্চলের নাম অনুসারে এককালীন ওই মহাদেশীয় স্থলভাগের নামকরণ করা হয়েছে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। ২০ কোটি বছর আগে, মেসোজোয়িক যুগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়ে টুকরোগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বের কথাও একই। এ সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

পৃথিবীর বরফ কি কমছে

পৃথিবীর মোট বরফের পরিমাণ যে ধীরে ধীরে কমে চলেছে, কিছু-কিছু লক্ষণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুমেরুর বরফের আস্তরণ গত কয়েকশো বছরে প্রায় হাজার ফুট কমে বসে আছে। গত ৫০ বছরে পৃথিবীর বেশির ভাগ ছোট হিমবাহ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ধান করেছে। পৃথিবীর বড় হিমবাহেরা গত একশো বছরে তাদের মোট আয়তনের শতকরা দশভাগ খুইয়েছে। ১৮৯৬ সালে উত্তর মেরুর কাছে বরফ প্রায় ১৪৩ ইঞ্চি পুরু ছিল। ১৯৪০ সালে সেই মাপ দাঁড়িয়েছে ৮৬ ইঞ্চি।

উত্তর মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় গত ৫০ বছরে তাপমাত্রার পরিমাণ বেশ কয়েক ডিগ্রি বেড়ে উঠেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জাতিক গবেষণার মাধ্যমে জানা গেল, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রতি একশো বছরে নাকি এক ডিগ্রি ফারেনহিট করে বেড়ে চলেছে। এই বৃদ্ধির মূলে একটি প্রধান কারণ হল বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত

পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের জমায়েত হওয়া। এই গ্যাসটির উৎস যেমন বিভিন্ন কলকারখানা ও যানবাহন তেমনি আর একটি উৎস হল মানুষ। এদের সকলের সমবেত চেষ্টায় পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যদি বর্তমানের তুলনায় ১৪ ডিগ্রি ফারেনহিট বেড়ে ওঠে, তাহলেই সর্বনাশ। পৃথিবীর বেশির ভাগ বরফ গলে গিয়ে নোয়ার যুগের মত এক বিরাট জলপ্লাবনই ঘটিয়ে বসবে। পৃথিবীর বেশির ভাগ বড় শহরগুলোর অবস্থা ফলে কী দাঁড়াবে, সে কথা তো আগেই বলেছি।

সম্প্রতিকালে আর একটি অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, পৃথিবীর মোট বরফের পরিমাণ আগের হিসেবের চেয়ে নাকি শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বেশি। সারা পৃথিবী জুড়ে বরফের পরিমাণ আদৌ বাড়ছে না কমছে, এই খবরটুকু বিশেষভাবে জানা দরকার। যে-কোন দিকে হিসেবের গরমিল হলে হয় জলপ্লাবন, নাহলে একটি নতুন তুষার যুগের আবির্ভাব ঠেকানো যাবে না। আমাদের সভ্যতার অস্তিত্বের ব্যাপারটাও এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়ানো।

পৃথিবীর বরফের কথা শেষ করে এবারে আমরা তার বায়ুমণ্ডলের কথায় আসব।

৯

বায়ুমণ্ডল

তোমরা অনেকেই ভাবতে পার আমাদের বায়ুমণ্ডলের চেহারাটা বোধহয় বরাবর আজকের মতনই ছিল। আসল ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এই বায়ুমণ্ডলকে তার ভোল অনেকবারই পাল্টাতে হয়েছে।

প্রতিদিন আমরা প্রত্যেকে প্রায় ৩৫ পাউণ্ডের মত বাতাস গ্রহণ করি। পৃথিবীর জমির উপর এই বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিমাণ হল—নাইট্রোজেন ৭৮ ভাগ, অক্সিজেন ২১ ভাগ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ·০৩৩ ভাগ এবং এছাড়া বাদ-বাকি অংশ হল জলীয় বাষ্প, আর্গন, নিয়ন, ক্রিপটন ও জেনন-জাতীয় গ্যাস। বায়ু-মণ্ডলে এছাড়াও কিছু বিষাক্ত গ্যাস রয়েছে—যেমন নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ও কার্বন মনোক্সাইড; তবে, তাদের পরিমাণ যৎসামান্য। বায়ুর মোট ওজন হল ৫×১০^{১৫} টন অর্থাৎ ৫এর পর ১৫টা শূন্য বসিয়ে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত টন।

বায়ুমণ্ডলের জন্যেই পৃথিবীতে তাপের সমতা রক্ষা পায়। তা না হলে দিনে তাপ দাঁড়াত ২৩০° ফারেনহিট, রাতে সেই তাপ নামত —৩০০ ডিগ্রি ফারেনহিটে। দিনের বেলা সাগর, হ্রদ ও নদীগুলোর জল ফুটতে ফুটতে বাষ্প হয়ে যেত, আবার রাত্রিবেলা সেই জল জমে বরফ হয়ে বসত।

বায়ুমণ্ডল মহাকাশের বিভিন্ন মারাত্মক রশ্মি, বেগনিপারের আলো, রঞ্জনরশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি ও উল্কার বিরুদ্ধে এক বিরাট রক্ষীদুর্গের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধেরও কারণ হল এই বায়ুমণ্ডল। বাতাস না থাকলে মেঘেরা হালকা ডানায় ভর দিয়ে ভেসে বেড়াত না, আগুন জ্বলত না, বেলুন ও এরোপ্লেনের আকাশে ওঠাও আর হত না।

বায়ুর সৃষ্টি

এই বায়ুমণ্ডল এল কোথা থেকে? বিজ্ঞানীদের কাছে এ প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব নেই, তবে তাঁরা মোটামুটি একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন।

পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচশো কোটি বছর আগে। জন্মের প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল খুবই শীতল। তারপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে তপ্ত হয়ে উঠল। শিলার মধ্যে লুকোনো ছিল যে গ্যাসেরা তারা উপরে এসে হাজির হল। ওই গ্যাসেদের মধ্যে ছিল ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, সালফার ও অ্যামোনিয়া। এরাই গড়ে তুলল পৃথিবীর প্রথম বায়ুমণ্ডলকে।

ওই প্রথম বায়ুমণ্ডল বেশিদিন টিকে থাকল না। কারণ ওর গ্যাসেদের তাপ ছিল খুবই বেশি, প্রায় ১৪৫০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। ওই তাপে গ্যাসেরা এমন প্রচণ্ডভাবে দাপাদাপি করছিল যে তারা উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক সময়ে আকাশে মিলিয়েই গেল।

পৃথিবীর জমির তাপ ক্রমে কমে আসে এবং তার ঘনীভূত হবার কাজ শুরু হয়। পৃথিবীর তরল গলিত পদার্থের সঙ্গে মিশে ছিল যে সব গ্যাস, এবারে তারা বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে ছিল জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন। এই গ্যাসেরা মিলে তৈরি করল পৃথিবীর দ্বিতীয় বায়ুমণ্ডল।

পৃথিবীর বয়স যখন এসে দাঁড়াল দুশো কোটি বছরে, তখন সে অনেক ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তার বায়ুমণ্ডলের তাপ তখন দাঁড়িয়েছে ৭০৫ ডিগ্রি ফারেনহিটে। পৃথিবীর দ্বিতীয় বায়ুমণ্ডলের উপাদান-গুলো কিন্তু পালিয়ে যেতে পারল না। এরা ছিল ঠাণ্ডা ও ভারি। পৃথিবীর অভিকর্ষ এদের মাটির উপর বেঁধে রেখে দিল। একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্যাস তখনো কিন্তু মুক্ত অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে

জায়গা করে নিতে পারে নি। সেই গ্যাসটি হল অক্সিজেন, যাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে কোন প্রাণীর পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যখন জলের স্ফুটনাঙ্ক বা বয়লিং পয়েন্ট ২১২ ডিগ্রি ফারেনহিটের নিচে এসে দাঁড়াল তখন জলীয় বাষ্পদের আর ঘনীভূত হতে কোন অসুবিধে রইল না। সমুদ্রের সৃষ্টিও এইসময়েই হয়েছিল। এই সময়কার বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৪ ভাগ, ১৫ ভাগ ও ১০ ভাগ।

এরপর থেকে বায়ুমণ্ডলের গঠনের পরিবর্তন খুব ধীরগতি হয়ে ওঠে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎদগারের ফলেও বিভিন্ন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে এসে জমা পড়ছিল।

অক্সিজেন জমা পড়ল

বহুযুগ কেটে যায়। পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হয়ে তার গড়পড়তা তাপ এসে দাঁড়ায় ১৬০ ডিগ্রি ফারেনহিটে। প্রাণের জয়যাত্রা এবারে শুরু হয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পৃথিবীর প্রথম প্রাণ ছিল গন্ধকজাতীয় জীবাণু যার বাঁচার জন্যে অক্সিজেনের কোন প্রয়োজন ছিল না। বরং এরা বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নিয়ে অক্সিজেনের ছোট ছোট বুদ্বুদ ছড়িয়ে দিত। সালফার-জাতীয় বীজাণুরাই হয়ত কালক্রমে পৃথিবীর প্রথম এককোষী উদ্ভিদের সৃষ্টি ঘটিয়েছিল। উদ্ভিদ জগতে বিবর্তন যত এগিয়ে চলে, বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের পরিমাণও সেই অনুপাতে বেড়ে চলে। উদ্ভিদ সূর্যের আলোর প্রভাবে বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলের সাহায্যে তার খাদ্য কার্বোহাইড্রেটকে তৈরি করে এবং একই সঙ্গে অক্সিজেনকে মুক্ত অবস্থায় ছড়িয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হল সালোক-সংশ্লেষ বা ফোটোসিন্থেসিস। উদ্ভিদ

জগত ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে এভাবে কাজে লাগিয়ে বসে।

বায়ুমণ্ডলে বর্তমানে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস যে অনুপাতে মিশ্রিত রয়েছে, সেই অবস্থায় পৌঁছতে প্রায় দুশো কোটি বছর সময় লেগেছিল।

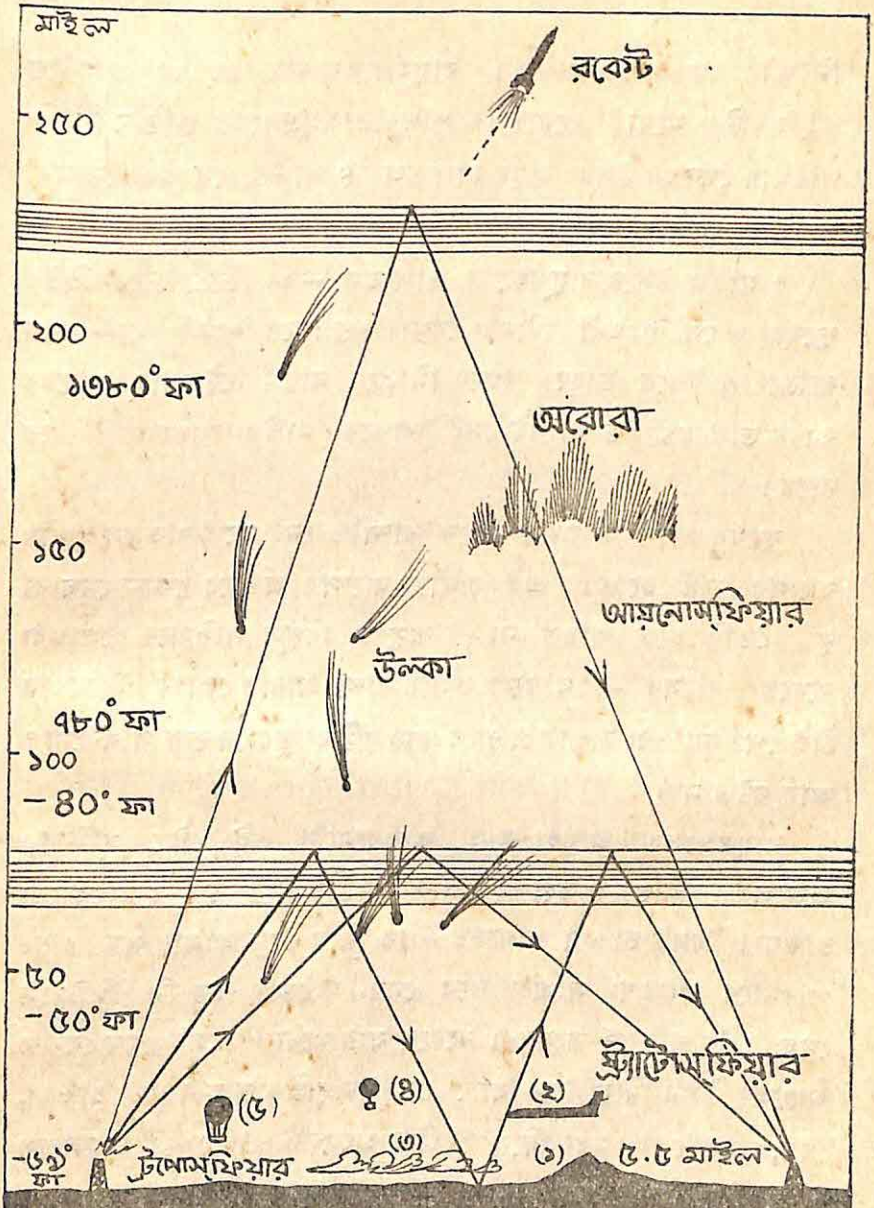
বায়ুমণ্ডলের চারতলা বাড়িটা

বায়ুর ছিটেফোঁটা যদিও ৬০০ মাইল ও তারও বেশি দূর পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়, তার শতকরা ৯৯ ভাগ বস্তু রয়েছে প্রথম ২৫ মাইলের মধ্যেই। বায়ুমণ্ডলকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। স্তরগুলোর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, তারা একে অপরের মধ্যে মিলেমিশে রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলকে জয়ের অভিযানে মানুষ নেমেছে বহুদিন। বেলুনে চড়ে সে জমির ৯০০০০ ফুট উপরে পাড়ি জমিয়েছে। এরোপ্লেনে চড়ে সে ২০ মাইল দূর পর্যন্ত উঠেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ৫০ মাইল থেকে বিভিন্ন দূরত্বে এসে আছড়ে পড়ে উল্কা। মহাকাশের সৌখীন ভ্রমণকারী এরা। বায়ুর সঙ্গে সজ্মাতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এদের সর্বাঙ্গ। বিরাট আকারের যারা হয়, তাদের দু-একটি কদাচিৎ পৃথিবীর জমি পর্যন্ত এসে পৌঁছয়। বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে মহাকাশের বায়ুশূন্য প্রদেশে পাড়ি জমাচ্ছে রকেট।

ট্রোপোস্‌ফিয়ার

বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তরটির নাম ট্রোপোস্‌ফিয়ার। এই অঞ্চলের বাতাস কখনই স্থির থাকে না। সূর্যের তাপে তপ্ত হয়ে বাতাস এখানে সব সময়েই পাক খাচ্ছে, চরকিবাজির মত উপরে নিচে ছোটাছুটি করছে। পৃথিবীর যত জোরালো বায়ুস্রোত, তাদের আস্তানাও এখানেই। পৃথিবীর জমির উপর এই স্তরটির উচ্চতা মেরু অঞ্চলে ৫ মাইল,



বায়ুমণ্ডল

(১) এভারেস্ট চূড়া (২) এরোপ্লেন (৩) হালকা মেঘ

(৪) গবেষণার যন্ত্রে সজ্জিত বেলুন (৫) মানুষবাহিত বেলুন

নিরক্ষীয় অঞ্চলে ১১ মাইল। বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৭৫ ভাগ বস্তু এই স্তরটির মধ্যেই রয়েছে। পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ-ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষেত্রের উপর বায়ুর চাপ হল ১৪ পাউণ্ড, সে কথা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই জান।

৫ মাইল উপরে বায়ুমণ্ডলের তাপ হল –৩০ ডিগ্রি ফারেনহিট। সূর্যের তাপে পৃথিবী দিনের বেলা তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই তাপ রাত্রিবেলা উপরে ছড়িয়ে গিয়ে মিলিয়ে যায়। ট্রোপোস্‌ফিয়ারের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসই সেই তাপকে মাটির কাছাকাছি ধরে রাখে।

সূর্যের তাপে জলাশয় থেকে বাষ্পীভবনের ফলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে। এই জলীয় বাষ্পের অভাবে কোন মেঘ বা বৃষ্টি তৈরি হতে পারত না। বায়ুতে বিপুল পরিমাণে ধুলোকণা রয়েছে। এসব না থাকলে জলীয় বাষ্প আবার কোথাও দাঁড়াবার ঠাঁই পেত না এবং ঠাণ্ডার প্রভাবে তার বৃষ্টি বা তুষারে রূপ পাল্টানোও আর ঘটত না।

বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়ার কারখানাটা এই ট্রোপোস্‌ফিয়ার অঞ্চলেই। ঠাণ্ডা ও তপ্ত বায়ুস্রোত একঠাঁই হয়ে সৃষ্টি হয় ঝোড়ো হাওয়া। সেই হাওয়া সাগরের উপর দিয়ে উড়ে আসার সময় প্রচুর পরিমাণে জলকণা সংগ্রহ করে নেয়। তৈরি হয় কিউমিউলাস মেঘ, বৃষ্টির পরিপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যার মধ্যে। সেই মেঘ যে-সব অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে যায়, সেখানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। হাওয়া, মেঘ, জলঝড়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ু এভাবে তৈরি হতে থাকে।

স্ট্র্যাটোস্‌ফিয়ার

বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় স্তর স্ট্র্যাটোস্‌ফিয়ার। এ স্তরটি পৃথিবীর জমির উপর ১০ থেকে শুরু করে ৩৫ মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ১২ মাইল

উপরে বায়ুর তাপ হল -৭০ ডিগ্রি ফারেনহিট। এই অঞ্চলে কিছু-কিছু জোরালো বায়ুস্রোতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব স্রোত ঘণ্টায় ১০০ থেকে ২০০ মাইল বেগে দৌড়ে চলে। এখানে ধুলো ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম।

সূর্যদেহজাত বেগনিপারের (আলট্রা-ভায়োলেট) আলো বায়ুর ২০ থেকে ২৫ মাইল দূরের এলাকার সঙ্গে সজ্ঘাতের ফলে সেখানকার অক্সিজেনের অণু ও পরমাণুকে ওজোন গ্যাসে বদলে দেয়। ফলে তার প্রাথমিক তেজটা যায় হারিয়ে, যার প্রভাব আমাদের জীবদেহের উপর খুবই মারাত্মক হয়ে দেখা দিত। ৩৫ মাইল উপরে বায়ুর তাপ হল —৫০ ডিগ্রি ফারেনহিট।

আয়নোস্‌ফিয়ার ও এক্সস্‌ফিয়ার

বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তরটি হল আয়নোস্‌ফিয়ার, পৃথিবীর জমির ৫০ থেকে ৩০০ মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সূর্যদেহজাত বেগনিপারের আলো, রঞ্জনরশ্মি ও সৌরকণিকাস্রোতের সঙ্গে সজ্ঘাতে এখানকার বায়ুর কণিকাদের পরমাণুগুলো ভেঙে গিয়ে আয়ন তৈরি হয়। আয়নেরা বিদ্যুৎপরিবাহী। এই স্তরটির বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের ক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে পৃথিবীর এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশ পর্যন্ত বেতার-বার্তার আদান-প্রদান ব্যবস্থা সম্ভব হতে পেরেছে।

আয়ন মণ্ডলে বায়ু অত্যন্ত পাতলা হওয়া সত্ত্বেও এখানকার তাপমাত্রা খুবই বেশি। ১১০ মাইল উপরে এই তাপমাত্রার পরিমাণ হল ৭৮০ ডিগ্রি ফারেনহিট। ১৯০ মাইল উপরে এই তাপমাত্রা ১৩৮০ ডিগ্রি ফারেনহিটের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি হলেও তাপের পরিমাণ কিন্তু খুবই কম। বায়ুর কণিকাদের গতিশক্তি ও পারস্পরিক সজ্ঘাতের উপর বায়ুর তাপ নির্ভর করে। কিন্তু আয়ন মণ্ডলের উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব এত কম যে বায়ুর

কণিকাদের মধ্যে সজ্ঘাত খুব অল্পই ঘটে থাকে। পৃথিবীর জমি উপর প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটার ক্ষেত্রে বায়ুর অণুর সংখ্যা যেখানে ৫০০ কোটি, আয়ন মণ্ডলে একই পরিমাণ ক্ষেত্রে সে সংখ্যা মাত্র একটি।

৩০০ মাইল উপর থেকে শুরু হল বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তর এক্সস্ফিয়ার। বায়ু এখানে গরম এবং খুবই পাতলা অবস্থায় রয়েছে। এখানকার তাপমাত্রা হল ৫০০০ ডিগ্রি ফারেনহিট। এক্সস্ফিয়ার অঞ্চল থেকে বায়ু ক্রমে মিলিয়ে যেতে যেতে অসীম মহাকাশের (স্পেস) বায়ুশূন্য প্রদেশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন বায়ুস্রোতের গতি যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তবে বায়ু হয়ে উঠবে নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত। গ্রীষ্মমণ্ডলের (ট্রপিক্স্) অঞ্চলগুলো প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠবে। ফলে কোন মানুষই আর সেখানে বাস করতে পারবে না। মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডার পরিমাণও বেড়ে উঠে সেখানকার সব প্রাণীর মৃত্যু ঘটাবে।

পৃথিবীর সমুদ্রস্রোতের মতই তার বায়ুস্রোতগুলো বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে চলেছে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আলোচনা শেষ করে এবারে আমরা তার চুম্বকত্বের কথা শুরু করব।

১০

পৃথিবীর চুম্বকত্ব

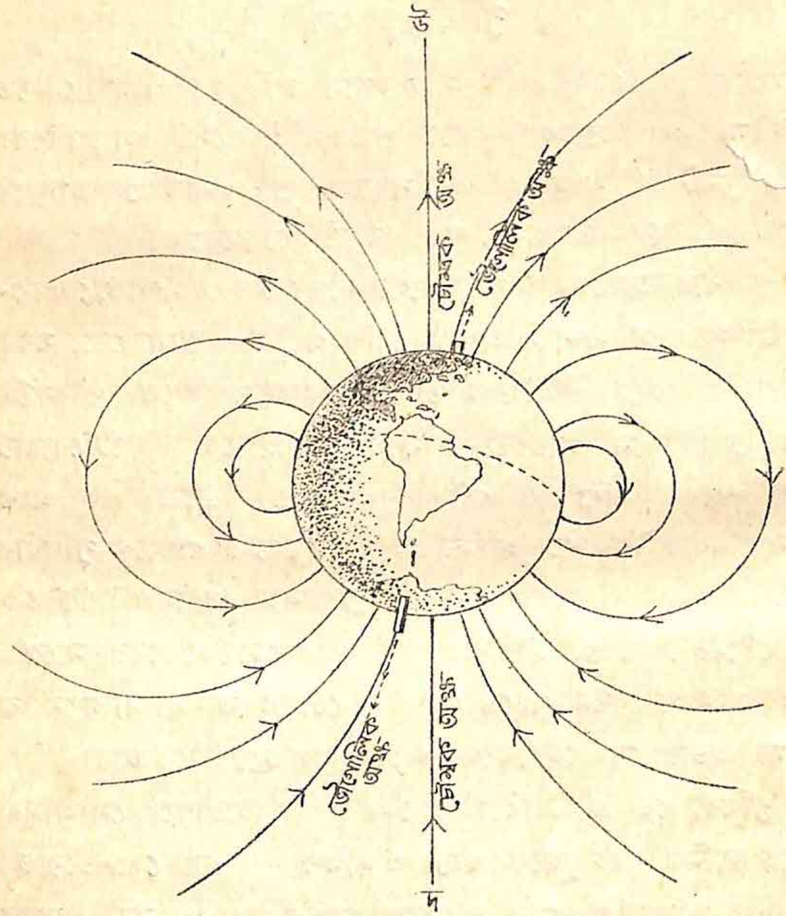
আমরা সবাই এমন একটি সমুদ্রে বাস করি, যা আমরা দেখতে পাই না এবং অনুভবও করতে পারি না। সেটি হল চুম্বকত্বের (ম্যাগ্‌নেটিজম) সমুদ্র। এই সমুদ্রের প্রভাব বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশের বহুদূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সূর্যের যে সম্পর্ক, চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে সে সম্পর্ক অনেক বেশি গভীর। সূর্যের দেহে যখন সৌরকলঙ্ক জেগে ওঠে তখন তার চৌম্বকক্ষেত্রের মাঝেও পরিবর্তন দেখা দেয়। সেই পরিবর্তনের ফলে সূর্যদেহ থেকে ছুটে বেরোয় নানা ধরনের রশ্মি ও সৌরকণিকাস্রোত। এদের কিছু অংশ যখন পৃথিবীর উপর এসে হাজির হয়, তখন তাদের প্রভাবে পৃথিবীর জল, মাটি ও আকাশের এলাকা জুড়ে নানা ধরনের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের খেলা শুরু হয়ে যায়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মাঝেও একই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চৌম্বক ঝড় বা ম্যাগ্‌নেটিক স্টর্মের প্রভাবে সেই চৌম্বকক্ষেত্রও বেসামাল হয়ে উঠতে চায়।

পৃথিবী যে একটি বিরাট চুম্বকের মত ব্যবহার করে, সে আমরা সবাই জানি। এই চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুটি মেরু রয়েছে। পৃথিবীর ভৌগোলিক মেরু ও চৌম্বক মেরু কিন্তু এক নয়। দুয়ের অবস্থানের মধ্যে খানিকটা তফাত রয়েছে।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা নাকি কখনই স্থির অবস্থায় থাকে না; সেটি ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে ঘুরে চলেছে। প্রতি বছরে ঘোরার বেগ হল ১১ থেকে ১৫ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রটা ১৬০০ বছরে একপাক ঘুরে আসবে। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের এই যে টলমল করে ঘুরে চলা, তার ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থানও একই সঙ্গে বদলাতে থাকে। সে হবে এক ভয়ানক এবং

বিপদজনক ব্যাপার। মেরু অঞ্চলে চলাফেরার সময় চৌম্বক কম্পাসের উপর তাই জাহাজ বা এরোপ্লেনকে নির্ভর করলে চলবে



পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র

না। দিক নির্ণয়ের জন্যে তখন অন্য ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি

পৃথিবীর চৌম্বক-সমুদ্রের ঘোরাফেরার ঘটনা থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর একেবারে গভীরে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরির একটি কারখানা চালু

রয়েছে। পৃথিবীর ভিতরের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক আগেই আমরা বলেছি যে, কেন্দ্রমণ্ডলের একটি অংশে লোহা ও নিকেল তপ্ত ও তরল অবস্থায় রয়েছে। এই তরল কেন্দ্রমণ্ডলটিও ঘুরে চলেছে। তবে কেন্দ্রমণ্ডলের চারপাশের বস্তুর ঘোরার বেগের সঙ্গে এর তফাত রয়েছে। তরল লোহা ও নিকেল দিয়ে তৈরি কেন্দ্রমণ্ডলের ঘূর্ণন যেন একটি ডায়নামো বা জেনারেটরের মত কাজ করছে। ডায়নামো যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কোথাও আবার বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হলেই তার চারপাশে একটি চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র তৈরির ব্যাপারটা তাহলে মোটামুটি বোঝা গেল।

একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলে প্রচণ্ড তাপের রাজত্ব। বেশি তাপে চৌম্বকধর্ম নষ্ট হয়ে যায় বলেই আমরা জানি। কাজেই বিপুল তাপের পরিবেশে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র তৈরির ঘটনা বেশ কিছুটা রহস্যজনক, সন্দেহ নেই।

একটি চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্রের চেহারাটা কি রকম, সেটা জানার জন্যে যে চুম্বক ও লোহাচুরের পরীক্ষাটা করা হয়ে থাকে, তার কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। চৌম্বক বলরেখা বা লাইন্‌স্ অব্ ফোর্স চুম্বকের উত্তর মেরু থেকে রওনা হয়ে দক্ষিণ মেরুতে এসে পৌঁছয়। লোহাচুরগুলো সেইসব বলরেখার পথে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে তাদের চেহারাটা আমাদের সামনে তুলে ধরে। পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখারা অবশ্য অনেক বেশি জোরালো এবং এরা তাদের বেড়াজাল মহাকাশে প্রায় ৫০,০০০ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছে। শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মিকণা চারদিক থেকেই পৃথিবীর উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এদের যাত্রাপথে পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখার বেড়াজাল এক বিরাট রক্ষীদুর্গের মত দাঁড়িয়ে আছে।

মেরুজ্যোতি বা অরোরা

সূর্যদেহজাত সৌরকণিকাস্রোত যখন প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে, তখন তারা পৃথিবীর চুম্বক বলরেখার বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে। চৌম্বক বলরেখার রাস্তা ধরে তারা গিয়ে হাজির হয় পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলে। সেখানকার বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় পরমাণুদের সঙ্গে তাদের বিপুল সঙ্ঘাতের ফলে গ্যাসীয় পরমাণুরা আয়নিত হয়ে গিয়ে একটি ফ্লোরেসেন্ট বাল্বের গ্যাসের মতই জ্বলতে থাকে। বাতাসের ঐ জ্বলুনি লাল, নারঙ্গি, হলদে, আসমানি, নানা ধরনের রঙ ছড়াতে থাকে। একেই আমরা মেরুজ্যোতি বা অরোরা বলি। দুই মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর চুম্বকত্বের জোরটা সবচেয়ে বেশি। তাই মেরু-জ্যোতির ছটা ওখানেই সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়। মেরুজ্যোতি সাধারণত পৃথিবীর জমির উপরে ৬০ মাইল থেকে ৬০০ মাইল দূর পর্যন্ত ঘটতে দেখা যায়।

মেরুজ্যোতির গবেষণার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ও গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য লাভ করছেন। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের চেহারার রহস্যও একই সঙ্গে তাঁদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে।

এবারে আমরা পৃথিবীর বয়সের কথায় আসব।

১১

পৃথিবীর বয়স কত

যে পৃথিবীকে নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তার জন্ম ঠিক কতদিন আগে হয়েছিল, সে নিয়ে বিজ্ঞানীদের তর্কের শেষ আজও হয় নি। মোটামুটিভাবে অনুমান করা হয়েছে, পৃথিবীর বয়স ৪৫০ থেকে ৫০০ কোটি বছর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়সের বিচারে পৃথিবীকে অবশ্য খুব বুড়ো বলা চলে না।

কথা হল, পৃথিবীর বয়স জানা যাচ্ছে কী ভাবে? একটা উপায় হল, স্তরে স্তরে সাজানো পৃথিবীর স্তরীভূত শিলার বয়স নিরূপণ করা। সবচেয়ে তলাকার স্তরটা স্বভাবতই বয়সে সবচেয়ে প্রাচীন হবে, আর উপরের দিকের স্তরগুলোর বয়স সেই অনুপাতে কমতে থাকবে।

সবচেয়ে উন্নত যে উপায়টিকে পৃথিবীর বয়স জানার কাজে লাগানো হচ্ছে, সে হল তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ। পৃথিবীতে কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, যেমন—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি। এইসব বস্তু অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের দেহের ভরকে বিভিন্ন রশ্মির আকারে শক্তিতে রূপান্তরিত করে চলে। তারা কেন যে নিজেদের কলেবরকে ক্ষীণ করার এই ব্রতটি গ্রহণ করল সে অবশ্য অন্য আলোচনার বিষয়বস্তু।

তেজস্ক্রিয় বস্তুদের ক্ষয়ে যাওয়ার একটা মাপ আছে। একে বলা হয় অর্ধ-জীবনকাল বা হাফ-লাইফ। একটা উদাহরণ দিলেই তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। এক কিলো ইউরেনিয়ামকে নিয়ে যদি কোথাও রেখে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ বস্তু আধ কিলো হতে সময় নেবে ৪৫০ কোটি বছর। ঐ আধ কিলো আবার নিজের অর্ধেক অর্থাৎ সিকি কিলো হতে সময় নেমে আরো ৪৫০ কোটি বছর। প্রতিবারই ইউরেনিয়ামের যে কোন পরিমাণ ঠিক তার অর্ধেক হতে

একই সময় লাগবে। থোরিয়ামের ক্ষেত্রে এই অর্ধ-জীবনকাল হল ১৪০০ কোটি বছর। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় বস্তু ক্ষয় পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত সীসেতে এসে পৌঁছয়। সীসে একটি স্থায়ী ধাতু, যা তেজস্ক্রিয় নয়।

কাজেই কোন শিলাস্তরের মধ্যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় বস্তু ও সীসের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে জানা যাবে, ঐ শিলাস্তর ঠিক কতদিন আগে গড়ে উঠেছিল। তেজস্ক্রিয়তা নিরূপণের পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বয়সের যে হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তা হল ৪৫০ থেকে ৫০০ কোটি বছর।

পৃথিবীর যুগ

পৃথিবীর সমগ্র ভূতাত্ত্বিক কালকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। এই যুগের সংখ্যা হল ছ-টি—অ্যাসোজোয়িক, আর্কিওজোয়িক, প্রোটিরোজোয়িক, প্যালিওজোয়িক, মেসোজোয়িক ও কেনো-জোয়িক।

প্রথম যুগ অ্যাসোজোয়িকের শুরু ৪৫০ থেকে ৫০০কোটি বছর আগে অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি হবার সময় থেকে। ২০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভূত্বক যখন কঠিন রূপ নিল, এই যুগটি তখন শেষ হবার মুখে। এই যুগে পৃথিবীতে কোন প্রাণের সৃষ্টি হয় নি।

আর্কিওজোয়িক যুগটি প্রায় ১০০ কোটি বছর স্থায়ী হয়। প্রথম এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি এই যুগেই হয়েছিল। পৃথিবীর বহু পর্বতশ্রেণী এই যুগে গড়ে ওঠে এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎদগারও এ সময়ে যথেষ্টই ঘটেছিল।

তৃতীয় যুগ অর্থাৎ প্রোটিরোজোয়িক ৫০ কোটি বছর স্থায়ী হয়। বিভিন্ন পোকামাকড় ও স্পঞ্জের জন্ম এই সময়ে ঘটে।

চতুর্থ যুগ প্যালিওজোয়িকের কাল শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৬০ কোটি বছর আগে। এই যুগটিকে আবার সাতটি পর্বে ভাগ

করা হয়েছে। তারা হল—ক্যাম্ব্রিয়ান, অর্ডোভিসিয়ান, সিলুরিয়ান, ডেভোনিয়ান, মিসিসিপিয়ান, পেনসিলভ্যানিয়ান ও পার্মিয়ান। এই যুগটির বিভিন্ন পর্বে পর্বত গড়ার কাজ আরো জোরদার হয়ে ওঠে। কয়লা, তেল ও গ্যাস এই যুগেই সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর প্রথম মাছ ও উভচর প্রাণী দেখা দিয়েছিল ৩৩ কোটি ও ২৭ কোটি বছর আগে। মহাদেশের জমির উপর প্রথম উদ্ভিদের জন্মও এ যুগেই ঘটে।

পরবর্তী যুগ মেসোজোয়িক শুরু হয়েছিল ২০ কোটি বছর আগে। একে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে—ট্রায়াসিক, জুরাসিক ও ক্রিটেসিয়াস। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের যুগও একে বলা হয়ে থাকে। সরীসৃপ জাতের এই প্রাণীরা পৃথিবীতে প্রথম এসেছিল আজ থেকে ১৮ কোটি বছর আগে।

সর্বশেষ পর্ব কেনোজোয়িক শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগে। এই যুগটিকে আবার দুটি পর্বে ভাগ করা হয়—টার্সিয়ারি ও কোয়াটার্নারি। টার্সিয়ারি পর্বকে আবার পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তারা হল প্যালিওসিন, ইওসিন, অলিগোসিন, মায়োসিন ও প্লায়োসিন। কোয়াটার্নারিরও আবার দুটি ভাগ—প্লাইস্টোসিন ও হলোসিন বা আধুনিক।

পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী জন্মেছিল আজ থেকে ৬ কোটি বছর আগে, টার্সিয়ারি পর্বে। কোয়াটার্নারির প্লাইস্টোসিন অধ্যায়ে পৃথিবীর তুষার যুগের সূত্রপাত হয়, যার চিহ্নগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আজও আমাদের চোখে পড়ে।

বর্তমানে যে সব উদ্ভিদ আমরা পৃথিবীতে দেখি তাদের সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে এক কোটি বছর আগে। পৃথিবীর ভূভাগের বর্তমান চেহারা গড়ে উঠেছে নানারকম ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। এই ক্ষয়কাজের নায়ক হল নদী, সাগরের ঢেউ, বাতাস ও বরফ।

প্রাইমেট নামে একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে মানুষ, বানর ও নররূপী বানরকুলের সৃষ্টি। মানুষের প্রথম পূর্বপুরুষ পৃথিবীতে এসেছিল আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে। আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগে। হলোসিন বা আধুনিক কালেই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমরাও এই হলোসিন বা আধুনিক পর্বেই বাস করে চলেছি।

আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষ

নিজের পৃথিবীকে জানার আগ্রহ যেন মানুষের আর শেষ হতে চায় না। কিন্তু পৃথিবীকে জানার বিষয়বস্তু এত বড় যে একটি দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানীর চেষ্টায় সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন সারা পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসাগর ও বরফের এলাকা জুড়ে অগণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা। আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ছাড়া এত বড় কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না।

পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে জানার উদ্দেশ্য নিয়েই পৃথিবীর ৬৭টি দেশের দশ হাজারের বেশি বৈজ্ঞানিক একত্র হয়ে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে নেমেছিলেন। এই পরিকল্পনার নাম ছিল আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষ (ইন্টারন্যাশনাল জিওফিজিক্যাল ইয়ার), সংক্ষেপে বলা যায় আ-ভূ-বর্ষ। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়ে পুরো দেড় বছর জুড়ে আ-ভূ-বর্ষের কাজ চলেছিল।

সমগ্র পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেবার জন্যে তেরোটি গবেষণা-ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল। তা হল: (১) হিমবাহ ও বরফ বিজ্ঞান, (২) সমুদ্রবিজ্ঞান, (৩) আবহবিজ্ঞান, (৪) সৌরদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, (৫) মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি, (৬) মহা-জাগতিক রশ্মি, (৭) আয়নমণ্ডলীয় পদার্থবিজ্ঞান, (৮) ভূ-চৌম্বকতত্ত্ব (৯) ভূকম্পনতত্ত্ব, (১০) তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত গবেষণা, (১১) অভিকর্ষ (১২) অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও পৃথিবীর বিভিন্ন পরিমাপসংক্রান্ত গবেষণা, (১৩) রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উর্ধ্বাকাশ সম্বন্ধে গবেষণা।

বিরাট এক পটভূমি জুড়ে এত বড় তথ্যসংগ্রহ পর্ব পৃথিবীর

ইতিহাসে এর আগে আর কখনো ঘটে নি। সমগ্র ঘটনাচক্রের নায়ক ছিলেন সূর্য। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গেই সূর্যের বিভিন্ন ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে।

এই বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য আজ আমাদের হাতে এসেছে তার সাহায্যে পৃথিবী সম্বন্ধে অজানা প্রশ্নগুলোর সমাধানের আশা রাখেন বিজ্ঞানীরা। পুরোনো জ্ঞান ও তথ্যের সংস্কারের কাজটাও একই সঙ্গে চলতে থাকবে।

আ-ভূ-বর্ষের সাফল্য সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মাতা পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত সব রহস্যের চাবিকাঠি একদিন আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানসাধকের অতন্দ্র সাধনা, তাঁদের
সত্যসন্ধিৎসা যেমন অনবচ্ছিন্ন, মহাবিশ্বের
দিকে দিকে তাঁদের নিত্য নতুন
অভিযান তেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি
চমকপ্রদ। কুঞ্জবিহারী পাল-সম্পাদিত
এই-গ্রন্থে বিজ্ঞানের
সেই সব অভিযানের বিস্ময়াবহ
কাহিনী, আবিষ্কারের কৌতূহলে-ভরা
কথা তুলে ধরা হয়েছে
অতি সহজ সরলভাবে। বিষয়ের
বর্ণনায়, ভাষার সুকুমার
উপস্থাপনে এবং কান্তিশীল
রস-রীতির পরিচয়ে এ-গ্রন্থ এক
উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকার্য। কিশোর পাঠকদের
কাছে এ এক আদরণীয় সম্পদ।

পড়া—*v.* (fig.) to fret with pain or malice or jealousy ; to be over-sensitive. গায়ে মাংস (বা মাস) লাগা—*v.* to grow fat, to gain flesh, to put on flesh or weight. গায়ে মাখা—*v.* (fig.) to pay heed to, to care for. গায়ে হাত তোলা—*v.* to beat, to lay hands on. গায়ের জোরে—by brute force, by physical force. গায়ের জ্বালা —burning sensation of the body ; (fig.) malice, spite, jealousy, hatred, anger, displeasure. গায়ের ঝাল ঝাড়া বা মেটান—*v.* to feed fat one's grudge (against another), to vent one's spleen. গা-গতর—*n.* the whole body. গা-গরম—*n.* state of having or running a temperature ; feverishness. গা-ঘেঁষা —*a.* grazing one's body ; adjoining, adjacent ; very close to. গা-জুড়ান—*a.* soothing, gratifying, pleasant (গা-জুড়ান কথা) ; refreshing (গা-জুড়ান বাতাস). গা-জোরি, গা-জুরি —*n.* application of undue force. গা-জোরি করা—*v.* to apply undue force. গা-জোরি কথা বলা—*v.* to assert an untenable proposition by sheer weight of one's personality. গা-জ্বালা—same as গায়ের জ্বালা. গা-সওয়া, গা-সহা —*a.* accustomed (to an evil) by repeated suffering (from it). গায়ে-গায়ে—*adv.* clinging together ; side by side. গায়ে-পড়া—*a.* officious ; forward. গায়ে-হলুদ—*n.* the Hindu ceremony of besmearing the bridegroom and the bride with a paste of turmeric and then bathing them on the eve of their wedding.

গাই, গাইগোরু—*n.* the cow.

গাইয়ে—(1) *a.* one who is versed in singing ; one who sings. (2) *n.* a singer.

গাওন—*n.* act of singing. গাওনা—*n.* the singing or a call for singing of a professional singer ; a demonstration of singing by a professional singer. গাওনা দেওয়া—*v.* to arrange for a demonstration of a professional singer's singing.

গাওয়া$_1$—*n.* a witness.

গাওয়া$_2$—*a.* made of cowmilk (গাওয়া ঘি).

গাওয়া$_3$, গাওয়ান—pop. corruptions of গাহা and গাহান respectively.

গাং—alt. spell. of গাঙ.

গাঁ—*n.* a village ; a hamlet. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—a self-styled leader.

গাঁই—*n.* a classification of brahmins according to their original village home.

গাঁইগুঁই—*int.* expressing : imaginary sound of indirect unwillingness. গাঁইগুঁই করা—*v.* to express unwillingness.

গাঁইট—var. of গাঁট.

গাঁইতি—*n.* a pick-axe.

গাঁক-গাঁক, গাঁ-গাঁ—*int.* expressing : the bellowing sound as of an angry bull. গাঁক-গাঁক করা, গাঁ-গাঁ করা—*v.* to bellow.

গাঁজ, গাঁজলা—*n.* froth, scum ; yeast, leaven. গাঁজন—*n.* fermentation ; putrefaction.

গাঁজা$_1$—*v.* to be fermented ; to come up in froth, to be frothy ; to be putrefied.

গাঁজা$_2$—*n.* the female flowering tops of Indian hemp, ganja ; (loos.) hemp ; (fig.) a cock-and-bull story. গাঁজা খাওয়া—*v.* to smoke ganja.

গাঁজাখুরি—*a.* cock-and-bull (গাঁজাখুরি গল্প).

গাঁজাখোর—(1) *a.* given to smoking ganja. (2) *n.* a ganja-smoker, a ganja addict.

গাঁজান—(1) *v.* to ferment, to leaven ; to putrefy. (2) *a.* fermented, leavened, putrefied.

গাঁট—*n.* a knot ; a joint (esp. of bones) ; a knuckle ; a knob ; a node ; a large bundle, a bale ; a rim of the loin-cloth round one's waist where money is kept concealed. গাঁট কাটা—*v.* (fig.) to cut the rim of one's loin-cloth and steal one's money, to pick one's pocket. গাঁট-কাটা—*n.* a cut-purse, a pick-pocket. গাঁটছড়া—*n.* the Hindu custom of tying a corner of the bride's sari (শাড়ি) with a corner of the bridegroom's scarf at wedding. গাঁট-ছড়া বাঁধা—*v.* (lit.) to tie a corner of the birde's sari (শাড়ি) with a corner of the bridegroom's scarf at wedding ; (fig.) to marry ; (fig.) to unite inseparably. গাঁটবন্দী —*a.* baled, packed in a bale, made into a bale. গাঁট বাঁধা—*v.* to tie up in a bale or in a large bundle. গাঁটে বাঁধা—*v.* to keep (esp. money) concealed in the rim of one's loin-cloth. গাঁটের কড়ি—(fig.) one's own money.

গাঁটরি, গাঁটুরি—*n.* a bundle.

গাঁট্টা—var. of গাট্টা.

গাঁতি$_1$—*n.* a small holding of tenanted land.

গাঁতি$_2$—*n.* a pickaxe.

গাঁথন—*n.* act of stringing (as a garland) ; composition (ছন্দে গাঁথন) ; construction ; act of laying (bricks, stones etc. for constructing a building).

গাঁথনি—*n.* manner of laying bricks, stones, etc. in construction of buildings ; brick-work, stonework, mudwork ; construction ; stringing together ('ফুলের গাঁথনি'). (fig.) structure of sentences or verse. কাঁচা গাঁথনি—mudwork. পাকা গাঁথনি—brickwork or stone-work, masonry.

গাঁথা—(1) *v.* to lay (as bricks, stone etc.

in construction of buildings) ; to construct, to build ; to string (as a garland) ; compose, to set (ছন্দে গাঁথা) ; to cling or strick steadfastly (হৃদয়ে গাঁথিয়া থাকা). (2) *a.* laid ; constructed, built ; strung ; composed, set ; clung, stuck.

গাঁথুনি—var. of **গাঁথনি**. **কথার গাঁথুনি**—fine and effective juxtaposition of words or sentences.

গাঁদা—*n.* the Indian marigold.

গাঁধাল, গাঁদাল—*n.* a kind of medicinal creeper.

গাঁধি—var. of **গান্ধী**.

গাগরী, গাগরি—*n.* a pitcher.

গাঙ, গাঙ্গ১—*n.* (coll.) a river ; a stream.

গাঙচিল, গাঙ্গচিল—*n.* a kind of gull often found flying over rivers, a river-gull (cp. the sea-gull). **গাঙ-শালিক, গাঙ্গ-শালিক**—*n.* a riparian bird, the horn-bill.

গাঙ্গ২—*a.* of the Ganges, Gangetic ; born of the Ganges ; riverine.

গাঙ্গচিল, গাঙ্গ-শালিক—see **গাঙ্গ**১.

গাঙ্গেয়—(1) *n.* the son of the Ganges. (2) *a.* of the Ganges ; Gangetic ; born of the Ganges.

গাছ১—var. of **গাছা**.

গাছ২—*n.* a tree, a plant ; a tree-like object (ঘানিগাছ) ; a creeper, a herb (লাউগাছ). **গাছ-কোমর বাঁধা**—*v.* (of girls and women) to tie the loose end of the loin-cloth tightly round the waist, (cp.) to tuck up one's clothes. **গাছড়া**—*n.* a herb ; a medicinal herb. **গাছ-গাছড়া**—*n.* herbs or medicinal herbs collectively. **গাছপাথর**—*n.* account ; a means of reckoning. **গাছপালা**—*n. pl.* trees and plants collectively ; vegetation. **গাছমরিচ**—*n.* red pepper. **গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল** বা **গাছে না উঠতেই এক কাঁদি**—(fig.—ridi.) to count one's chickens before they are hatched. **গাছে চড়ান**—*v.* (fig.—ridi.) to inflate one with overpraise or flattery, to heap hyperbolical or excessive praise upon a person. **গাছে তুলে (দিয়ে) মই কেড়ে নেওয়া**—(fig.—ridi.) to induce a person to run into a hazard by promising help and then abandon him.

গাছা১—*n.* a lampstick (cp. a candlestick), a lampstand.

গাছা২, **গাছি**—*a.* (*art.*) the, a, an.

গাজন—*n.* the festival of worshipping Shiva (শিব) in the month of Chaitra (চৈত্র) ; any of the songs sung on this occasion ; music of these songs. **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—(fig.) too many cooks spoil the broth.

গাজর—*n.* carrot.

গাজী—*n.* a Muslim warrior fighting for the cause of religion (cp. a crusader).

গাটাপার্চা—*n.* gutta-percha.

গাট্টা—*n.* a blow on the head with the knuckles of the fist. **গাট্টা মারা, গাট্টা দেওয়া, গাট্টা লাগান**—*v.* to strike another's head with the knuckles of one's fist.

গাড়ওয়ান—alt. spelling of **গাড়োয়ান**.

গাড়ল, গাড়র—*n.* the ram ; (in mild rebuke or taunts) a stupid man.

গাড়া—*v.* to plant, to drive in (খুঁটি গাড়া) ; to spread firmly, to strike (শিকড় গাড়া) ; to establish, to set up (আস্তানা গাড়া) ; to fold (হাঁটু গাড়া). **শিকড় গাড়া**—*v.* to strike root ; (fig.) to settle down firmly or permanently. **হাঁটু গাড়া**—*v.* to kneel down.

গাড়ি, (rej.) **গাড়ী**—*n.* a vehicle, a cart, a coach, a carriage, a car ; a hackney-carriage, a hackney-coach, a cab, a taxi-cab. **গাড়ি করা**—*v.* to hire or take a hackney-carriage, or a taxi, to purchase coach and horse or a motor car for one's own use. **গাড়ি চাপা পড়া**—to be run over by a car. **গাড়ি ডাকা**—*v.* to call or get a hackney-carriage or a taxi. **গাড়িবারান্দা**—*n.* a covered porch for parking cars and carriages, (cp.) a vestibule. **গাড়ির-ঘোড়া**—a coach-horse. **গাড়িসম্ভার**—*n.* rolling stock.

গাড়ু—*n.* a pitcher or a tankard, with a spout (and often with a handle), a vase.

গাড়োয়ান—*n.* a carter, a coachman, a waggoner, a carman. **গাড়োয়ানি**—*n.* the profession of a carter or a coachman or a waggoner or a carman ; vulgar behaviour and talk, vulgarity.

গাঢ়—*a.* solidified, condensed, thickened, thick (গাঢ় দুধ) ; sound (গাঢ় নিদ্রা) ; cumulated (গাঢ় মেঘ) ; deep, intense (গাঢ় অন্ধকার) ; severe, strong (গাঢ় দুঃখ) ; choked (গাঢ় স্বর) ; concentrated (গাঢ় মনোযোগ) ; close (গাঢ় আলিঙ্গন) ; clenched (গাঢ় মুষ্টি). **গাঢ় করা**—*v.* to solidify, to condense, to thicken ; to make sounder ; to deepen, to intensify ; to make severe ; to choke ; to concentrate ; to make close or closer. **গাঢ়তা, গাঢ়ত্ব**—*n.* solidity, densedness, thickness ; soundness ; cumulation ; deepness, intensity ; severity ; concentration ; closeness.

গাণনিক—*n.* an accountant.

গাণনিকা—*n.* book-keeping.

গাণপত্য—(1) *a.* relating to Ganesha (গণেশ). (2) *n.* a sect worshipping Ganesha.

গাণিতিক—(1) *a.* versed in mathematics ;